ত্রিপুরার উপজাতি সংস্কৃতি

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

উৎসর্গ

স্বর্গত মাতৃদেবী ও পিতৃদেব

রবিতি দেবী ও হরিমোহন দেববর্মার

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে ।

মুখবন্ধ

প্রাক্তন দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরা রাজ্য আকার আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও এরাজ্যের ইতিহাস বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর বিচিত্র সংস্কৃতির সম্পদে সুসমৃদ্ধ। ত্রিপুরা রাজ্য মূলতঃ স্থানীয় আদিবাসী-জন-গোষ্ঠীর আবাস ভূমি বলে চিহ্নিত হলেও একথা ঐতিহাসিক সত্য যে সুদূর প্রাচীনকাল থেকে অর্থাৎ প্রাচীন রাজন্যবর্গের শাসনকাল থেকে কয়েক শতাব্দীর পূর্বেই এরাজ্যে হিন্দু বাঙ্গালী মুসলিম নরনারীর আগমন ও বসবাসের উল্লেখ ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস রাজমালায় বিধৃত আছে। বর্তমান যুগে এ রাজ্যের মিশ্র সংস্কৃতির যে বৈচিত্র্যময় রূপরেখা আমরা দেখি তা একদিনে অর্থাৎ কোন যাদুকরের যাদু স্পর্শে গড়ে ওঠেনি। তার রূপগরিমা শতাব্দীকালের আদিবাসী সংস্কৃতি এবং হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিলন মাধুর্য রূপপরিগ্রহ করেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের সমাজ সংস্কৃতির ইতিহাস আদিবাসী ও হিন্দু বাঙালী সংস্কৃতির দ্বৈত-ধারার শোভন রূপ মূর্তিবিগ্রহ।

আদিবাসী সংস্কৃতি এবং হিন্দু বাঙ্গালী সংস্কৃতির যুগলমূর্তি বিগ্রহ উভয় সম্প্রদায়ের শতাব্দীকালের দেয়ানেয়ার পালাবদলের স্বর্ণফসল। একথা ঐতিহাসিক সত্য। তাই মদীয় এই নাতিদীর্ঘ ভূমিকায় খোলসা করে বলতে চাই এই যে ত্রিপুরার সংস্কৃতির ইতিহাস বলতে বিশেষ কোন জাতি গোষ্ঠীর সংস্কৃতি বোঝায় না। এরাজ্যের সমগ্র জাতি গোষ্ঠীর একত্রিত সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ অবয়ব বা কাঠামোই এ রাজ্যের প্রকৃত সংস্কৃতির রূপরেখা। তাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ত্রিপুরার আদিবাসী ও সেই সঙ্গে সকল অধিবাসীদের জীবন সমাজ ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছি।

বর্তমান গ্রন্থের সংগ্রহ ও গ্রন্থনার আদি-অন্তকালে নিরন্তর উপদেশ দানে আমাকে উৎসাহিত করেছেন অনুজপ্রতিম ত্রিপুরাবিদ অধ্যাপক ডক্টর জগদীশ গণচৌধুরী। তাঁর আন্তরিক সহায়তা ব্যতিরেকে বর্তমান গ্রন্থটির আত্মপ্রকাশ সম্ভব হ'ত না।

এই প্রসঙ্গে যাঁর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি তিনি খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ স্বর্গত নিশীথরঞ্জন রায়। বর্তমান গ্রন্থ পরিকল্পনা তিনিই প্রদান করেছিলেন, ভূমিকা রচনার কথাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় আমার অযোগ্যতার জন্য গ্রন্থটির কাজ সমাপ্ত করতে ব্যর্থ হই।

পরিশেষে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই জ্ঞান বিচিত্রার কর্ণধার আমার অপর অনুজপ্রতিম শ্রীদেবানন্দ দামকে। অনুজ দেবানন্দ এজাতীয় গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার আগ্রহ না দেখালে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরী আমার মত অলস প্রকৃতির পুস্তক প্রণেতার পক্ষে সম্ভব হত না। মদীয় গ্রন্থে ত্রিপুরার আদিবাসীদের সঙ্গে সঙ্গে সকল সম্প্রদায়ের সামাজিক রীতি নীতি সংস্কৃতি সাহিত্য লোক সাহিত্য এবং সংস্কৃতি বিবিধ শাখা-প্রশাখার পরিচিতি বিধৃত হয়েছে। সুধী পাঠক বৃন্দ আমার এই গ্রন্থ পাঠে কিঞ্চিৎ উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

পূর্বতন পূর্ববাঙলার (অধুনা বাংলাদেশ রাষ্ট্র), পূর্ব-সীমান্তশায়ী সবুজ বনানী লালিত ক্ষুদ্র আয়তনবিশিষ্ট ত্রিপুরা বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠীর আদি বাসভূমি। সুদূর প্রাচীনকাল থেকে এরা ত্রিপুরায় বাস করে আসছে — ইতিহাসের কালের বিচারে এই জনপদের প্রাচীনত্ব নির্ণয় করা সম্ভব নয়। ত্রিপুর রাজাদের বৃত্তান্ত বা রাজমালা গ্রন্থে যা আভাসিত তা হচ্ছে ত্রিপুর জাতির রাজবংশাবলী প্রাক্-ঐতিহাসিক কাল থেকে ত্রিপুরায় রাজ্যপাট প্রতিষ্ঠা করে শতাব্দীর পর শতাব্দী রাজত্ব করে গেছেন। ১৯৪৯ সালে স্বাধীন ত্রিপুরা ভারতভুক্তির পর এ রাজ্য ভারতবর্ষের অন্যতম পূর্ণরাজ্য।

ত্রিপুরী সম্প্রদায় এ রাজ্যের মূল আদি বাসিন্দা বলে পরিগণিত হলেও সুদূর প্রাচীন কাল থেকে অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠী সন্নিহিত অঞ্চল বা রাজ্য সমূহ থেকে এ রাজ্যে প্রবেশ করেছে। ইতিহাস-ভাষাতত্ত্ব-নৃবিজ্ঞানবিদ্‌গণ অভিমত প্রকাশ করে থাকেন যে এ রাজ্যের সকল আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠী দ্বি-সহস্রাব্দীর পূর্বে চীন দেশ পরিত্যাগ করে তিব্বত ও ব্রহ্মদেশ (অধুনা মাইনমার) অতিক্রম করে পূর্ববঙ্গ, আসাম প্রদেশে অনুপ্রবেশ করতঃ স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে । কালক্রমে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করে ত্রিপুরার আদিবাসী হিসাবে পরিগণিত হয়। বলা বাহুল্য অতীত ত্রিপুরা মূলতঃ আদিবাসীদের বাসভূমি হলেও বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্য মিশ্র জনগোষ্ঠীর বাসভূমি — দেশ (ভারতবর্ষ) স্বাধীন হবার পর বছরের পর বছর হিন্দু মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক কলহের কারণে প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান (পূর্ববঙ্গ) থেকে কাতারে কাতারে হিন্দু জনগণ ত্রিপুরা রাজ্যে অনুপ্রবেশ করার ফলে ত্রিপুরার আদিবাসিন্দারা সংখ্যাগুরু থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে যায়। তবে সুদূর প্রাচীনকালেও যখন এ রাজ্যে আদিবাসীরা সংখ্যাগুরু ছিলো তখনো তাদের মধ্যে বাংলা ভাষা, বাংলার ধর্ম, বাংলার সংস্কৃতি অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই আদিবাসীদের ধর্মাচরণে ভাষা ব্যবহারে বিভিন্ন ভাষী আদিবাসীদের ভাববিনিময়ে বাংলা ভাষার প্রাধান্য সবিশেষ লক্ষণীয়।

এ রাজ্যের আদিবাসীদের মধ্যে কেউ হিন্দু, কেউ খৃষ্টান, কেউ বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী — এদের রক্তে চীন-তিব্বত এবং ব্রহ্মদেশীয় জনগণের রক্তধারা প্রবহমান বলে নৃবিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে বিশ্বাস করে। মূলতঃ চীন-তিব্বত ও ব্রহ্মদেশীয়দের রক্তের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটলেও বর্তমান কালে এদের জাতিগোষ্ঠীর পরিচয় চীন-তিব্বত-বর্মীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাই এদের জাতিগত (generic) নামে ভিন্নতা চোখে পড়ে

— যেখানে চীন-তিব্বত-বর্মীদের সঙ্গে কোন সংস্রব নেই। শুধুমাত্র বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মগ সম্প্রদায় বর্মীদের সমগোত্র। মগরা আরাকান থেকে চট্টগ্রাম হয়ে এ রাজ্যে প্রবেশ করেছিল প্রায় তিন বা ততোধিক শতবর্ষ আগে। এ রাজ্যের মূল আদি অধিবাসী ত্রিপুরী সম্প্রদায় আসাম প্রদেশের বরাক উপত্যকার (কাছাড়) বৃহত্তর বোড়ো জাতির শাখা — ত্রিপুরীরা তাই নিজেদের 'বরক' বলে অভিহিত করে থাকে — এদের ভাষা এখন ককবরক। ত্রিপুরী ব্যতিরেকে এ রাজ্যে আদিবাসীদের মধ্যে জমাতিয়া, রিয়াং, উচই, কলই, রুপিনী, চাকমা, গারো, কুকি, লুসাই, হালাম, সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও, ভুটিয়া, লেপচা, খাসিয়া প্রভৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করে। এরা সবাই ত্রিপুরার আদিবাসী বলে সংবিধান স্বীকৃত। সাংবিধানিক রক্ষাকবচের আওতায় এনে এদের সর্বাঙ্গীন উন্নতিবিধান কল্পে এদের সবাইকে তপশীলিভুক্ত উপজাতি বলে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ধর্মগতভাবে এরা মূলতঃ সবাই জড় উপাসক হলেও প্রতিবেশীদের প্রভাবে নিজ-আদিধর্মীয় বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়ে উন্নত সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার আচরণে সামিল হয়ে আজকাল কেউ হিন্দু, কেউ খৃষ্টান, কেউ বৌদ্ধ ধর্মে রূপান্তরিত হয়ে একটা মিশ্র ধর্মীয় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ে পরিণতি লাভ করে। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। ত্রিপুরীরা সনাতন হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী — এই সম্প্রদায় কোন্ আদিকাল থেকে হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কেন না ত্রিপুর রাজাদের ইতিবৃত্ত রাজমালায় উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাক্-ঐতিহাসিক কাল থেকে ত্রিপুর রাজবংশীয়গণ শাক্ত, শৈব এবং বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন — কিংবদন্তী রাজা (a king of mythological era) ত্রিলোচন নাকি মহাদেবের বরে জন্মলাভ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রবাদ এই যে রাজা ত্রিলোচনের পিতা ত্রিপুর নাকি অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং প্রজানিপীড়ক রাজা ছিলেন। রাজা ত্রিপুরের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে প্রজাবর্গ দেবাদিদেবের কাছে আকুল প্রার্থনা নিবেদন করায় তিনি অমোঘ অস্ত্র ত্রিশূলের আঘাতে রাজা ত্রিপুরকে নিধন করেন। কাহিনীটি কিংবদন্তীমূলক হলেও ত্রিপুর রাজারা যে হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন এতে প্রমাণিত । ত্রিপুরী প্রজাকুল তাদের রাজাদের পালিত এবং অনুসৃত ধর্মের প্রতি অনুগত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই — তাই সকল ত্রিপুরী সম্প্রদায় সনাতনী হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী। ত্রিপুরী সম্প্রদায় ছাড়াও ত্রিপুরী সম্প্রদায়ভুক্ত (ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক আচার বিচারে যারা ত্রিপুরীদের সমগোত্রীয়) জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, উচই প্রভৃতি জনগোষ্ঠীও হিন্দুধর্মে আস্থাশীল। তাছাড়া রিয়াং, কলই, রুপিনী, মুড়াসিং প্রভৃতি জনগোষ্ঠী ত্রিপুরী সম্প্রদায়ভুক্ত না হয়েও শতাব্দীর পর শতাব্দী ত্রিপুরীদের পাশাপাশি বসবাস করায় (রিয়াং, কলই, রুপিনী মুড়াসিং মূলতঃ হালাম-কুকি- লুসাই সম্প্রদায়ের একটি অংশ বা শাখা) ত্রিপুরী সমাজে অর্ন্তভুক্ত হয়ে যায় — এদের ভাষাও ককবরক — ত্রিপুরীদের মত এরাও হিন্দুধর্মাবলম্বী — এইতো গেল জড়বাদী জনগোষ্ঠীদের বিভিন্ন ধর্মে রূপান্তরের

ইতিবৃত্ত।

তবে আলোচিত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ধর্মের ক্ষেত্রে স্বকীয়ত্বে বিচ্যুতি ঘটলেও ভাষা বা অন্যান্য সামাজিক ও সংস্কৃতির বিষয়ে 'পরদেশী' প্রভাবে তেমন কিছু প্রভাবিত হয়ে উঠেনি। তাই এদের জীবনধারায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এখনো অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। যদিও আর্থ-সামাজিক এবং আর্থ সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণে অর্থাৎ বহিঃসংস্কৃতির প্রভাবে আধুনিকত্বের প্রবাহে তাদের ধর্মসংস্কৃতির আদিরূপ অনেকটা পালাবদলের হাওয়ায় দোলায়িত। তবু যা আছে তার প্রতিবিম্বকে পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরেছি।

ত্রিপুরার পরিচয়

ত্রিপুরা

তদানীন্তন পূর্ব বাংলার (অধুনা বাংলাদেশ রাষ্ট্র) পূর্ব সীমান্তশায়ী সবুজ বনানীঘেরা ছোট্ট পাহাড়ী অঞ্চল ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাক্ পরিচিতি হিন্দু রাজাদের শাসিত 'স্বাধীন ত্রিপুরা'। ব্রিটিশ-ভারত অন্তর্গত বহুসংখ্যক দেশীয় রাজ্যের নাম-তালিকায় ত্রিপুরার অস্তিত্ব নামী-দামী গোছের না হলেও, অর্থাৎ ধন রত্নে গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া রাজা অথবা হায়দারাবাদের নিজামদের মতো কুবের না হলেও, যে কোন দেশীয় রাজ্যের তুলনায় ত্রিপুরা শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বৈভবে সমৃদ্ধিশালী ছিল। তার প্রসঙ্গে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোকপাত করব। ত্রিপুরার শেষ স্বাধীন রাজা বীরবিক্রম মাণিক্য বিবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন দূরদর্শী শাসক রাজা। তাই পরাধীন ভারত ব্রিটিশ রাহুমুক্ত হবার প্রাক্ মুহূর্তে তাঁর সযত্নে লালিত ছোট্ট স্বাধীন রাজ্যকে তিনি স্বাধীন ভারতের অঙ্গীভূত করতে সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজ হাতে ত্রিপুরা রাজ্যকে ভারত সরকারের হাতে অর্পণ করে যেতে পারেননি। ভারতের স্বাধীনতা সূর্যের প্রাক্ ঊষালগ্নে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে। তাঁর অবর্তমানে তাঁর মহিষী রিজেন্ট মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী স্বাধীন ত্রিপুরাকে ভারত সরকারের হাতে তুলে দেন। ১৯৪৯ সনের ১৫ই অক্টোবর ত্রিপুরা ভারত ভুক্ত হয়।

ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি

যে কোন স্থান (place) অথবা দেশের (country) নামকরণের পিছনে ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক কাহিনী বর্তমান রয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের নাম-উৎপত্তির পিছনেও নানা-কাহিনী ও জনশ্রুতি বর্তমান রয়েছে। এইগুলো কোনটি প্রামাণিক কোনটি প্রবাদরঞ্জিত তা নিশ্চয় করে বলা সহজ নয়। এ রাজ্যের ইতিবৃত্ত 'রাজমালায়' উল্লিখিত হয়েছে যে মহাভারতে বর্ণিত যযাতি রাজার পৌত্র মহারাজ ত্রিপুর (চন্দ্রবংশীয় রাজা) ত্রিপুরা রাজ্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বলে তার নামানুসারে ত্রিপুরা আখ্যা প্রাপ্ত হয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন ত্রিপুরা রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ত্রিপুরেশ্বরী বা ত্রিপুরাসুন্দরীর আবাসভূমি বলে এ রাজ্যের নাম ত্রিপুরা নামে খ্যাত হয়েছে। হিন্দু পুরাণ অনুসারে ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরের ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দির (মাতাবাড়ি বলে অধিক প্রচলিত) ভারতের একান্ন পীঠের এক পীঠ। এই পীঠস্থানে সতীর ডান পায়ের গোড়ালি পড়েছিল বলে প্রচলিত বিশ্বাস রয়েছে। তাই ত্রিপুরাসুন্দরী পূর্ব ভারতের অন্যতম পবিত্রতম দেবীতীর্থ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ত্রিপুরার প্রাচীন রাজা গোবিন্দমাণিক্যের (রাজত্বকাল ১৬৬০ ও

১৬৬৭ খৃঃ) কাহিনী অবলম্বনে রচিত কবিগুরুর বহুখ্যাত 'বিসর্জন' নাটকের ভুবনেশ্বরীর মন্দিরও উদয়পুর শহরের পূর্বদিকস্থ গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত। সে যাই হোক, ত্রিপুরা নামের উৎপত্তির পিছনে যে দুটি মতবাদের উল্লেখ করা হল, কোনটিই ঐতিহাসিক সত্যতার অনুকূলে নয়। কেননা প্রাচীন রাজ্য ত্রিপুরের কাহিনী নিছকই পৌরাণিক, ঐতিহাসিক সত্যতা যাচাই করার মতো কোন উৎস নেই — তাই সে মত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ অধিষ্ঠাত্রী দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর নামানুসারে এ রাজ্যের নামের উৎপত্তির সপক্ষেও রায় দেওয়া যাবে না কেননা উদয়পুরে দেবীর প্রতিষ্ঠার পূর্বেই (১৫০১ খৃষ্টাব্দে এই দেবী প্রতিষ্ঠিত হন) এ রাজ্যের নাম ত্রিপুরা নামে কথিত ছিল।

ত্রিপুরা নামের উৎপত্তির বিষয়ে রাজমালার প্রণেতা কৈলাশচন্দ্র সিংহ পূর্ববর্তী প্রচলিত মতবাদের প্রতি সাড়া না দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করে নাম উৎপত্তির ইতিহাস সম্মত সূত্র বাতলে দিয়ে গেছেন। সিংহ মহাশয় মনে করেন, 'তুই' (জল) এবং 'প্রা'(মিলনস্থল) এই ত্রিপুরী শব্দযুগল থেকে এসেছে রূপান্তরের পথ বেয়ে। দুটি নদীর মিলন স্থলকে (নদীর মোহনা) ত্রিপুরী ভাষায় (কক্‌বরক) তুইপ্রা বলা হয় — যেমন দুটি রাস্তার মিলন স্থলকে লামপ্রা (লাম অর্থাৎ রাস্তা প্রা অর্থাৎ মিলন) বলা হয়। অতীতে কোনো এক সময় ত্রিপুরার প্রাচীন রাজা হয়তো মেঘনা বা ব্রহ্মপুত্র বা তার শাখা নদীর মোহনার তীরবর্তী জায়গায় রাজ্যপাট স্থাপন করে থাকবেন। তাই তুইপ্রা নামে রাজ্যের নাম আখ্যাপ্রাপ্ত হয়। এই 'তুইপ্রা' শব্দটি কালক্রমে রূপান্তরের পথ বেয়ে যথাক্রমে তুইপ্রা-তিপ্রা-ত্রিপুরা নামে পরিণত হয়ে যায়। কৈলাশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের এই মতবাদকে আজকের ইতিহাসকারও স্বীকার করে থাকেন।

সীমানা ও আয়তন

ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থান (geographical location) নির্জন দ্বীপের (land locked) মতো। কারণ উত্তর, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম — এ তিনদিকে বাংলাদেশ রাষ্ট্র ঘিরে আছে। মূল দেশের সঙ্গে ত্রিপুরার ভৌগোলিক সংযোগ রক্ষিত হয়েছে উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত আসাম রাজ্যের কাছাড় জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার সীমানার মধ্য দিয়ে। ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিম-দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব — এই দিক জুড়ে রয়েছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যথাক্রমে সিলেট জেলা, কুমিল্লা ও নোয়াখালি জেলা এবং চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সঙ্গে রাজ্যের আন্তর্জাতিক সীমারেখার দৈর্ঘ্য প্রায় ৮৩৯ কিলোমিটার। মিজোরাম ও আসাম রাজ্যের সীমানা যথাক্রমে ১০৯ এবং ৫৩ কি. মি.। ত্রিপুরার বর্তমান আয়তন ১০,৪৭৭ বর্গ কিলোমিটার। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে উত্তর-পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ ১৮৩·৫ কি. মি. এবং ১১২·৭ কি.

মি.। ত্রিপুরা রাজ্য ২২°৫৬' এবং ২৪°৩২' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°১০' এবং ৯২°২১' পূর্ব দ্রাঘিমা রেখায় অবস্থিত।

ভূ-সংস্থান

ত্রিপুরার ভূ-প্রকৃতি উঁচু-নিচু অগভীর এবং অপ্রশস্ত উপত্যকাসংকুল। রাজ্যের পশ্চিম দিকে সমতল পূর্ববাংলার অবস্থানহেতু পশ্চিম দিকটা অপেক্ষাকৃত সমতল। পুর্ব দিক ক্রমোন্নত। পর্বত বলতে বড়মুড়া, আঠারমুড়া, সাকান, লংতরাই এবং জম্পুই প্রধান। কিন্তু উচ্চতার দিক থেকে এই সমস্ত মুড়াগুলোকে পর্বতের মর্যাদা দেওয়া যায় না — কেননা মুড়া বা পাহাড়শ্রেণীর উচ্চতা ১০০০ ফুট থেকে ৩০০০ ফুটের বেশি পরিলক্ষিত হয় না। জম্পুই পাহাড় এ রাজ্যের উচ্চতম পাহাড়শ্রেণী। জম্পুই এর সর্বোচ্চ চূড়ার নাম বেতলিংসিব, উচ্চতা ৩২০০ ফুট। জম্পুই পাহাড়ে চিরবসন্ত বিরাজ করে বলে প্রবাদ আছে। জম্পুই পাহাড়ে সুমিষ্ট জাতের কমলালেবু উৎপন্ন হয়। এখানকার অধিবাসী খ্রীষ্টধর্মী লুসাই সম্প্রদায়ের নরনারী। জম্পুই পাহাড়ের লুসাই জনতা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, আর্থ-সামাজিক বিষয়ে এরা বেশ অগ্রসরমান।

পাহাড়ী অঞ্চল হলেও যথেষ্ট পরিমাণে সমতলভূমি ত্রিপুরায় রয়েছে। নাতি-উচ্চ, নাতিদীর্ঘ ছোট ছোট পাহাড়-শ্রেণীর পাদদেশে নয়নাভিরাম সুবিস্তৃত সবুজ ক্ষেত্রের দৃশ্য সকলের মন কেড়ে নেয়। ত্রিপুরায় মাটি পলি সমৃদ্ধ তাই বার মাস সব রকম ফসল ফলানো যায়।

নদী-নালা

ত্রিপুরা রাজ্যে অগণিত ছোট ছোট পাহাড়ী নদী দেখা যায়। তবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নদীগুলোর মধ্যে গোমতী, হাওড়া (রাজধানী আগরতলার পাশ দিয়ে প্রবাহিত), মুহুরী, ফেনী, দেও, মনু, খোয়াই, জুরি এবং লঙ্গাই-এর নাম করা যায়। এগুলির মধ্যে গোমতী নদীই প্রধান। নানান পৌরাণিক কাহিনী জড়িয়ে আছে এই নদীর সঙ্গে। ত্রিপুরার বিভিন্ন জাতি-উপজাতিদের কাছে গোমতী পবিত্র নদী — এর উৎসস্থল তীর্থমুখ এরাজ্যের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। পৌষ সংক্রান্তি উৎসবে এখানে মেলা বসে এবং অগণিত পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। একদা শুধু উপজাতীয়দের তীর্থক্ষেত্র ছিল — কিন্তু এখন জাতি-উপজাতি নির্বিশেষে তীর্থমুখে পুণ্যস্নান করতে হাজির হয় হাড়-কাঁপুনি পৌষালী শৈত্যপ্রবাহকে উপেক্ষা করে। এই গোমতী নদীর তীরে ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর অবস্থিত। উদয়পুরের সন্নিকটেই কবিগুরুর বহুখ্যাত নাটক 'বিসর্জন'-এ বর্ণিত ভুবনেশ্বরীর মন্দির। অদ্যাবধি সে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

রাজতন্ত্রের অবসানে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

ভারতের স্বাধীনতার সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার রাজতন্ত্রের সূর্য অস্তমিত হয়। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর নূতন দিল্লীতে ত্রিপুরার রিজেন্ট মহারাণী তার নাবালক পুত্র কিরীটবিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের পক্ষে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে ত্রিপুরা রাজ্যকে ভারত সরকারের হাতে অর্পণ করেন। এর পর থেকে ত্রিপুরা ভারত সরকারের 'খ' শ্রেণী রাজ্যের মর্যাদা পায়। মুখ্য প্রশাসক বা চিফ কমিশনার প্রশাসনিক প্রধান পদে বৃত হন। ত্রিপুরার প্রথম চীফ কমিশনার পদে শ্রীরঞ্জিতকুমার রায় ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে নিযুক্ত হন। প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর চীফ কমিশনারের উপদেষ্টা নিযুক্ত হন শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ, শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত এবং শ্রীজিতেন্দ্র দেববর্মা। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্য পুনর্গঠিতহওয়ার ফলে ত্রিপুরা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয় এবং ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে উপদেশক পরিচালন ব্যবস্থার অবসান হয়ে যায়। দেশের দ্বিতীয় নির্বাচনের অব্যবহিত পরে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে আঞ্চলিক পরিষদীয় আইন অনুযায়ী ত্রিপুরার আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয় (Tripura Territorial Council সংক্ষেপে T.T.C.)। মোট ৩২ জন সদস্যবিশিষ্ট আঞ্চলিক পরিষদের দুজন সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। বাকি ৩০ জন সরাসরি জনগণের দ্বার নির্বাচিত হতেন।

১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ভারতের রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে কেন্দ্রের অধীনস্থ আঞ্চলিক আইন কার্যকরী হয় এবং আইন মোতাবেক সংবিধানের ২৩৯ ধারা বলে কেন্দ্রশাসিত রাজ্যসমুহের জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক একজন প্রশাসক নিযুক্তির প্রচলন হয়।

কেন্দ্রের আঞ্চলিক আইন বলবৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরায় আঞ্চলিক পরিষদীয় ব্যবস্থার অবসান হয়ে যায় এবং সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচনের গণতান্ত্রিক প্রথা চালু হয়ে যায়। সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই ত্রিপুরার প্রথম জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা গঠিত হয় শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহের নেতৃত্বে। ৩০ জন সদস্যবিশিষ্ট বিধানসভার ২৭ জনই কংগ্রেস সদস্য ছিলেন। বাকি তিনজন বিরোধী পক্ষ। গণতান্ত্রিক কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যবস্থাও পরিবর্তিত হয়ে যায়। ফলে চীফ কমিশনারের পদ উন্নীত হয়ে উপ-রাজ্যপালে পরিণত হয় এবং একই প্রশাসনিক কাঠামো চলতে থাকে ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

ত্রিপুরার পূর্ণ রাজ্যের (Statehood) মর্যাদালাভ

ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ জনতার গণতান্ত্রিক আশা ও অধিকারকে পূর্ণ মর্যাদা দেবার জন্য ভারত সরকারের পার্লামেন্ট আইন মোতাবেক ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে ২১শে জানুয়ারী ত্রিপুরা রাজ্যকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়। এবং ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে অনষ্ঠিত

সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস বিপুল ভোটে জয়ী হয় এবং শ্রীসুখময় সেনগুপ্তের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। ত্রিপুরা রাজ্য পূর্ণ রাজ্যে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান উপ-রাজ্যপালের মর্যাদাও রাজ্যপালে উন্নীত হয়। পূর্ণ ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম রাজ্যপাল নিযুক্ত হন শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার নেহরু, আই. সি. এস.। এভাবে প্রাচীন রাজন্যশাসিত ত্রিপুরা গণতান্ত্রিক পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়।

আদিবাসী সংস্কৃতির ধারা

সংস্কৃতি শব্দটি অতীব শ্রুতিমধুর ও ব্যঞ্জনাময়। এর সংজ্ঞা ও অর্থ ব্যাপক এবং সুদূর প্রসারী। মানব জীবনের বাইরের এবং অন্তরের পরিপূর্ণ স্বরূপের আত্মপ্রকাশই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি বিচিত্রধর্মী।

অল্পকথায় সংস্কৃতির সংজ্ঞাকে ধরতে পারি এই বলে যে মানব জীবনের সামগ্রিক ধারার (total way of life) ক্রিয়াকলাপ এবং পরিপূর্ণ রূপ-প্রকাশ তা হলো সংস্কৃতি। মানব জীবন হচ্ছে সংস্কৃতির আধেয় আর সংস্কৃতি হচ্ছে গিয়ে মানব জীবনের আধার।

আজকাল সংস্কৃতিকে খণ্ড খণ্ড করে শহুরে সংস্কৃতি, গ্রাম্য সংস্কৃতি, লোক সংস্কৃতি, আদিবাসী সংস্কৃতি বা জুমিয়া সংস্কৃতি প্রভৃতি খণ্ডিত সংজ্ঞার কথা ব্যাপকভাবে শ্রুত হওয়া যায়। তাই অনেকেই সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপের ব্যাপারে অল্পবিস্তর ধন্দে পড়ে যান। তাহলে কি সংস্কৃতির সংজ্ঞা জাতি ও সমাজভেদে ভিন্ন ভিন্ন ? আসলে সংস্কৃতির অর্থই আমাদের অনেকের কাছে পরিস্কার নয়। এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ বা ভাসাভাসা। অথচ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজেকর্মে, মননেচিন্তনে, ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক জীবনে, কর্মকুশলতায়, কর্মপরিকল্পনায়, আলাপচারিতায়, চলনে বলনে সংস্কৃতির আসল রূপটি প্রকাশ পাচ্ছে। প্রতিফলিত হচ্ছে।

অনেকের ধারণা সংস্কৃতি বস্তুটি উচ্চকোটি সমাজের সৃজনশীল নরনারীর চিন্তা ভাবনা ধ্যানধারণার স্বর্ণফসল। নিম্নকোটির সমাজভুক্ত নরনারীর মানসিক জগৎ যেহেতু শিক্ষার আলোকবিহীন সেইহেতু তাদের কোন সংস্কৃতি নেই অর্থাৎ সংস্কৃতি বিবর্জিত বা uncultured।

এসব ধারণা কেবলমাত্র ভ্রান্তিবিলাসই নয় — সংস্কৃতির প্রকৃত সংজ্ঞার ভ্রান্তব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যাও বলা যেতে পারে। আমরা পূর্বেই জেনেছি মানব জীবনের সামগ্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের যোগফল হচ্ছে গিয়ে সংস্কৃতি। প্রত্যেক স্তরের মনুষ্য সমাজে সংস্কৃতি তার আপন মহিমায় বিরাজ করে। জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত সমাজ যেমন সংস্কৃতি তার বিচিত্র শাখা বাহু বিস্তার করে চলেছে — শিক্ষার আলোক বিবর্জিত আদিবাসী সমাজেও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য বিচিত্র বর্ণের বাহারী ফুলের মত শোভা বর্ধন করে রয়েছে। বর্তমান আলোচ্য উপজাতীয় বা আদিবাসী জীবন সংস্কৃতি ধারার অধ্যায়গুলিতে আদিবাসী সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ রূপদান করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সংস্কৃতির প্রকারভেদ

১। **বস্তুগত উপাদান (material/objective elements)**

২। ভাবগত উপাদান (subjective elements)

এই দ্বিবিধ উপাদানের সমন্বয়ে মানব জাতির সংস্কৃতির সৌধ গড়ে ওঠে।

মানব সংস্কৃতি আবার দ্বিবিধ বিভক্ত ঃ

ক) সরল সংস্কৃতি (simple culture)

খ) জটিল সংস্কৃতি (complex culture)

বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন (isolated) আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন ধারা সরল সংস্কৃতির উদাহরণ। অপরপক্ষে উন্নত সমাজভুক্ত মানুষের জীবনধারা বহুমুখী তাই এটি জটিল সংস্কৃতি বা complex culture এখানে বহু ধারা এসে মিশেছে বলে বহুধর্মী (pluralistic)। তাছাড়া সংস্কৃতির গুণগত এবং পরিমাণগত দিকও আছে। সংস্কৃতির এই গুণগত এবং পরিমাণগত রূপান্তর ঘটে উন্নত ভিন্ন সমাজের সংস্পর্শে আসার ফলে। বহিঃসংস্কৃতির প্রভাবে isolation বা একাকিত্ব অবসিত হয়ে যায়। সরল সংস্কৃতির সমাজের নরনারী বহিঃসংস্কৃতির প্রভাবে কর্মকুশলতা সম্পন্ন হয়ে ওঠে — কর্মকুশলতা বৃদ্ধির ফলে জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন আসে — গৃহসামগ্রী, আসবাবপত্র, পোষাক পরিচ্ছদ, গৃহ নির্মাণ প্রভৃতিতে বৈচিত্র্য আসে। সংস্কৃতির আর একটি দিক হচ্ছে আত্মীকরণ (assimilation)। ভিন্ন সমাজের সংস্পর্শে আসার সুবাদে ভিন্ন সমাজ থেকে সাংস্কৃতিক উপাদান গ্রহণ করার প্রবণতা বা ধর্ম তা-ই আত্মীকরণ। এই আত্মীকরণ ব্যতিরেকে সংস্কৃতির গুণগত বা পরিমাণগত রূপান্তর ঘটে না। সংস্কৃতি বহমান নদীর মত তার ধর্মই হচ্ছে বৃহতের সঙ্গে একীভূত হওয়া। — ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ আদিবাসী বা উপজাতীয় সমাজ কালের গতিতে বহিঃসংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে নিজেদের একধর্মী সংস্কৃতির গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসে বহুধর্মী সংস্কৃতির ধারায় মিশে যাচ্ছে। সংস্কৃতির ঐ আত্মীকরণের চালিকা শক্তিই আদিবাসী সমাজের মুক্তিদাতা। সংস্কৃতির এই নিজস্ব শক্তিকে self sustaining বললে বোধ হয় যথাযথ বলা হবে। যে কোন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি নিজের পুষ্টি নিজেই যোগান দিতে সক্ষম। তার স্বভাবজ ধর্ম হচ্ছে অন্য সংস্কৃতির উপাদান আত্মস্থ করে নিজের উপাদানকে বহুতর করে বিচিত্রতর করা — শক্তিশালী করা অর্থাৎ গুণগত এবং পরিমাণগত কলেবর বৃদ্ধিসাধন করা। এই প্রক্রিয়ায় সরল সংস্কৃতি জাতীয় সংস্কৃতিতে পরিণত হয়।

এবারে ত্রিপুরার আদিবাসী বা উপজাতীয় সংস্কৃতির পরম্পরার দিকে চোখ ফেরানো যাক। ত্রিপুরার উপজাতীয় জনগোষ্ঠী মঙ্গোলজাতির বিভিন্ন শাখা। ঐতিহাসিক সিংহাবলোকনে এই জনগোষ্ঠীর যুগপরম্পরা — প্রচরণ (movement) সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। এরা খৃষ্টপূর্ব প্রায় দুই হাজার বছরেরও বেশী পূর্বে চীনভূমি ত্যাগ করে

তিব্বত-বর্মা (বর্তমানে মাইনমার) অতিক্রম করে ক্রমশঃ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করে আসছে। ত্রিপুরার বর্তমান ১৯ টি সম্প্রদায় তিব্বতী বর্মী জাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে নিজেদের আদিভূমি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাই এরা ভারতভূমির অন্যান্য উপজাতীয় সমাজের সঙ্গে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য এ দুয়ের মধ্যে অবস্থান করছে। তার প্রধান হেতু স্থান, পরিবেশ, ভৌগোলিক অবস্থান এবং নিকট প্রতিবেশীর প্রভাব।

নিকট প্রতিবেশী সমাজ-সংস্কৃতির জীবনধারার সংস্পর্শে এসে ত্রিপুরার আদিবাসীদের সংস্কৃতির ধারায় বিজাতির সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে ঠিকই কিন্তু তবুও তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি-ধারা আজো প্রবহমান। তাদের বস্তুগত জীবন ও ভাবগত জীবন এখনো স্বতন্ত্রতার বৈশিষ্ট্যের নিশানা উড়িয়ে চলেছে।

১। উপজাতীয় বস্তুগত উপাদান (material elements)

অর্থনৈতিক জীবন (Economic lilfe)

উপজাতিদের অর্থনৈতিক জীবন বলতে জুমচাষ বা উৎপাদন প্রক্রিয়া (productive activity)। তাদের জীবন-অস্তিত্ব জুমচাষ নির্ভর। এখন অবশ্য সকল উপজাতি জনগণ শুধুমাত্র জুমচাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে না। এ রাজ্যের সকল শ্রেণীর উপজাতীয় নরনারী একই পদ্ধতিতে জুমচাষ করে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে কাটা বনে আগুন লাগিয়ে বৈশাখ মাসে ধান ও অন্যান্য শস্যাদির বীজ রোপণ করা জুমচাষের প্রকৃত পদ্ধতি।

জুমখেতে শুধুমাত্র ধান ও শাক-সব্জির বীজ রোপণ করা হয় না — তিল, কার্পাস, পাট-চাষ ও করা হয়। সাধারনতঃ হেমন্তকালেই জুম ফসল তোলা হয়। কয়েক বছরের জন্য সেই জুমখেত পরিত্যক্ত থাকে। এইভাবে কতিপয় বছর অতিক্রম করার পর খেতটি বনভূমিতে পরিণত হলে পুনরায় সেই বন কেটে জুমচাষ করা হয়। উপজাতিদের জুমভিত্তিক সংস্কৃতি অত্যন্ত রমণীয় এবং উপভোগ্য। বিষয়টি পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

কুটিরশিল্প

ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া, চাকমা প্রভৃতি জনগোষ্ঠী হস্তশিল্প ও বয়নশিল্পে পারদর্শী। হস্তশিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করে দৈনন্দিন গার্হস্থ্য জীবনের চাহিদা মেটাতে তারা সক্ষম। হস্তশিল্পজাত নানাবিধ সামগ্রী ছাড়াও সমতলভূমিতে চাষ করার সরঞ্জাম লাঙ্গল, জোয়াল প্রভৃতি তৈরী করতেও এরা পারদর্শী। বেত ও বাঁশজাত শিল্পদ্রব্যের মধ্যে বিভিন্ন নকশা সম্বলিত সরঞ্জাম, চিরুনি, চুলের কাঁটা প্রভৃতি তাদের সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় বহন

করে। ত্রিপুরীদের দৃষ্টিনন্দন নকশা বিধৃত 'নখাই' (বেতের ঝুড়ি) আধুনিক শিল্প-সৃষ্টির সমতুল। মূল্যবান জিনিসপত্রের আধার হিসাবে ব্যবহৃত নখাই খুত্রুক নামে পরিচিত। ত্রিপুরী, জমাতিয়া, রিয়াং রমণীকুল সুতাকাটা, কাপড়বোনা প্রভৃতি গার্হস্থ্য কাজের মাধ্যমে পুরুষদের উপার্জনের সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়। কোমর তাঁতের পরিধেয় বস্ত্র, বিছানার চাদর, বক্ষ-আবরণী প্রভৃতি অপরিহার্য বস্ত্র তৈরী করে থাকে। ত্রিপুরী রমণীদের বক্ষ-আবরণীর নকশা অতীব শিল্প সম্মত। বক্ষ আবরণীর শিল্পগুণ একদা সারা ভারতে প্রশংসা পেয়েছিল। এমন একদিন ছিল, উপজাতি সমাজে প্রতিটি ঘরে তাঁত রাখা হত। নিজের উৎপন্ন কার্পাস থেকে সূতা তৈরী করে নিজেদের উৎপাদিত রংয়ের গাছের পাতা জলে ভিজিয়ে রং তৈরী করে সূতাকে নানা রঙে রঞ্জিত করে বিচিত্র বর্ণের পরিধেয় বস্ত্র (পাছড়া) এবং বক্ষ-আবরণী (রিয়া) তৈরী করত। আজকাল জুম চাষের প্রচলন সংকুচিত হয়ে যাওয়ায় বাজার থেকে সূতা কিনে কাপড় বুনতে বাধ্য হচ্ছে।

আদিবাসী জনগণ গৃহপালিত পশুপাখীদের প্রতি অতিশয় যত্নবান। মহিষ, গরু, বলদ, ছাগল, ভেড়া, মুরগী, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি তারা সযত্নে পালন করে। অধিক সংখ্যক গরু ও মহিষ পালক সংগতিপন্ন হিসাবে পরিগণিত এবং সম্মানিত। ডিম, মুরগী, মহিষ ও ছাগল তাদের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণের উপচার হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ।

বাসগৃহ- আসবাবপত্র

এ রাজ্যের সকল শ্রেণীর আদিবাসীদের বাসগৃহ একই ধরনের, একই ছাঁচে । জঙ্গলময় পরিবেশে বাস করতে হয় বলে আদিকাল থেকে তাদের বাসগৃহকে মঞ্চাকারে তৈরী করতে হয়েছে। মাটি থেকে প্রায় ছ'ফুট উঁচু করে বাসগৃহ নির্মাণ পদ্ধতি সকল আদিবাসীদের দ্বারা অনুসৃত। বাসগৃহ নির্মাণের স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে তারা সবাই খুঁতখুতে। অপেক্ষাকৃত উঁচু এবং জল সহজলভ্য এমন জায়গা বেছে বাস্তুভিটে তৈরী করতে হয়। পাহাড় চূড়াকে তারা বাসগৃহ নির্মাণের উপযুক্ত স্থান মনে করে। উচ্চমঞ্চ বিশিষ্ট বাসগৃহের ফাঁকা নীচের অংশে গৃহপালিত পশু-পাখি রাখার ও ব্যবস্থা করা হয়। বাসগৃহ নির্মাণের উপকরণ হিসাবে গাছ-বাঁশ-ছন অপরিহার্য। বেশীর ভাগ বাসগৃহ নির্মিত হয় স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ সর্বসুবিধাযুক্তভাবে। ঘরের নকশা সাধারণতঃ আয়তাকার এবং দু'চালাবিশিষ্ট। ছাউনির কাঠামোকে বাঁশ ও বাঁশের তৈরী বেত দিয়ে নিপুণভাবে বাঁধা হয়। তারপর শুকনো ছন দিয়ে ছাওয়া হয়। সাধারণতঃ ঘরের দু'দিকে দুটো দরজা রাখা হয় — জানালা রাখা হয় না সাধারণতঃ। তাদের ঘরে সাধারণত দেয়াল (parition) থাকে না — শুধুমাত্র প্রবেশ পথ বরাবর রান্নার উনুনকে আড়াল করার জন্য একটা বাঁশের বেড়া দেয়া হয়। ঘরে উঠা-নামার জন্য একটুকরো গাছকে খাঁজ কেটে (সিঁড়ির

আকারে) দরজা বরাবর হেলানো অবস্থায় শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়। উপজাতিদের গৃহসামগ্রী ও আসবাবপত্র অত্যন্ত সীমিত। এদের অস্থাবর সম্পত্তি বলতে জুমচাষের সাজ সরঞ্জাম, তাঁত বোনার যন্ত্রপাতি, বাঁশের ঝপড়ি ও মাদুর, হুঁকো, ধান ভানার খল ও ডাঁটি, মাছ ধরার সাজ- সরঞ্জাম, কাপড়চোপড়, রান্নার বাসন কোসন, মাটির তৈরী এবং কিছু লোহা ও অ্যালুমিনিয়ামের থালা বাটি হাঁড়ি কুড়ি।

দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রী

বাঁশ আদিবাসীদের জীবনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বাঁশের ব্যবহার অপরিহার্য। দৈনন্দিন জীবনে, ঘরের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি সবই বাঁশের তৈরী হয়। শহরবাসীদের মতো আলমারী, সুটকেস প্রভৃতি আসবাবপত্রের পরিবর্তে বাঁশ নির্মিত আসবাব তারা ব্যবহার করে। কিন্তু আজকাল সুদূর পাহাড় অঞ্চলের উপজাতি বাসিন্দারাও ধাতু ও কাঠ নির্মিত আসবাব ব্যবহার করছে। পুরাকালে জল টানার জন্য বাঁশের চোঙ ব্যবহৃত হত — আজকাল ধাতু অথবা মাটির কলসী ব্যবহৃত হচ্ছে। নৈশকালে পথ চলার জন্য আগুনের মশালের পরিবর্তে টর্চ ব্যবহৃত হচ্ছে।

পোষাক ও অঙ্গসজ্জা বা অলংকার

আদিবাসী রমণীদের পরিধেয় পোষাক অতি সাদাসিধা বা বাহুল্য বর্জিত। তাদের পোষাক দুভাগে বিভক্ত। এক ভাগ শরীরের উপরিভাগের অপরভাগ শরীরের নিম্নভাগের। সম্প্রদায় ভেদে পোষাকের ভিন্ন ভিন্ন নাম — ত্রিপুরী বা অন্যান্য ককবরক ভাষীরা ১ম ভাগকে রিসা (বক্ষ আবরণী) এবং দ্বিতীয় ভাগকে রিকনাই (পাছরা বা ঘাগরা) বলে। চাকমা ভাষায় পিনন এবং খাদে। ত্রিপুরার সকল শ্রেণীর পরিধেয় পোষাক এক রকম। পুরুষদের পোষাকও খুব অনাড়ম্বর। কালের গতিতে সকল শ্রেণীর উপজাতিদের বিবর্তন এসেছে পুরুষ ও নারীরা আজকাল নিজেদের পোষাক ছাড়াও শাড়ী, ধুতি, পায়জামা, প্যান্ট, শার্ট, ব্লাউজ পরতে শুরু করেছে। তবে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যগত পোষাকও ব্যবহার করছে। নিজেদের সংস্কৃতির ধারাকে আকড়ে রাখার স্বাতন্ত্রবোধকে জিইয়ে রাখাতে শিখেছে। এটা নিঃসন্দেহে শুভ লক্ষণ।

অঙ্গসজ্জা ও অলংকার

আদিবাসী রমণীদের পোষাকে বৈচিত্র্য না থাকলেও তাদের নানাবিধ অলংকার ব্যবহারে অঙ্গসজ্জায় বৈচিত্র্য ধরা পড়ে। পুরাকালে ত্রিপুরী, জমাতিয়া, রিয়াং, চাকমা রমণীরা পিতল ও রূপার অলংকারই ব্যবহার করত। সোনার অলংকার তাদের পক্ষে দুর্লভ ছিল। কিন্তু আজকাল একটু সঙ্গতিপন্ন হলেই সোনার অলংকার ব্যবহার করতে

দেখা যায়। শরীরের নানান অংশে নানা অলংকার ব্যবহৃত হয়। ত্রিপুরী, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া ও রিয়াং রমণীদের অতীব জনপ্রিয় অলংকার 'রাংবতাং' টাকার মালা। সুতোর মধ্যে আংটা লাগানো রূপোর টাকা ফুলের মতো গেঁথে রাংবতাং বা টাকার মালা তৈরী করা হয়। রাংবতাং পরিহিতা রমণীর গলা এবং বক্ষদেশ রূপালী ঝলকে শোভা বর্ধন করে। তাছাড়া রাংবতাং ব্যবহার সঙ্গতি সম্পন্ন এবং আভিজাত্যের প্রতীক। রাংবতাং ছাড়াও কানের দুল, নাকের ফুল, হাতের বালা, পায়ের মল (ত্রিপুরী ভাষায় বেংকি), গলার হার, চুড়ি, আংটি, বাজুবন্দ এবং মাথার অলংকার চুলের কাঁটা ব্যবহার করে থাকে। সর্বোপরি আদিবাসী রমণীদের পুষ্প-অলংকার প্রিয়তা তাদের নান্দনিক রুচিবোধের পরিচয় দেয়।

রন্ধন প্রক্রিয়া — খাদ্য ও পানীয় রীতি ও অভ্যাস

আদিবাসী রমণীদের রন্ধন প্রক্রিয়া অত্যন্ত সাদামাটা। তাদের রান্নায় নুন, হলুদ ও লংকাই প্রধান। তেল, আদা, রসুন, পিয়াজ ও অন্যান্য আধুনিক মানব সমাজের মশলা তারা ব্যবহার করেনা। তেল বর্জিত শাকসব্জি অত্যন্ত ভিটামিনযুক্ত — হাঁড়ি কড়াই ব্যতীত ওদের রান্নার সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহৃত বাঁশের চোঙ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোদক তরকারী বলে শহরবাসীদের কাছে পরিচিত, খাদ্য বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে কাঁচা বাঁশের চোঙেই প্রস্তুত করা হয় — সেটা অনেক শহরবাসীই জানেন না। মাছ, মাংস নানাবিধ আনাজ-পাতি চোঙে রান্না করা যায়। কাঁচা বাঁশে (একনলের বড় আকারে বাঁশের চোঙ হলে ভাল) তরকারি কেটে চোঙের ভিতরে ঠেসে দিয়ে জল সমেত উপর অংশে প্রয়োজনীয় মশলাপাতি দিয়ে চোঙের মাথায় কলাপাতা পুঁটলি দিয়ে বন্ধ করে আগুনের তাপ দিয়ে রান্না করা হয়। তারপর তরকারী সিদ্ধ হলে একটা কাঠি দিয়ে গুঁতো দিতে হয়। কারণ গুঁতো না দিলে মশলার সঙ্গে তরকারির মিশ খায় না। গুঁতো দিয়ে রান্না করা হয় বলে গোদক শব্দটি এসেছে। আজকাল অবশ্য হাঁড়ি কড়াই-এ রান্না মেনুকেও গোদক বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আদিবাসীদের খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডিম নানাবিধ তরকারী শাকসবজি অন্তর্ভুক্ত — শুঁটকী ও সিদল তাদের প্রিয় খাদ্য। শুঁটকি ও সিদল দিয়ে গোদক তরকারী অতিশয় সুস্বাদু। শহরবাসীদের মধ্যে যাঁরা একবার গোদক তরকারীর স্বাদ পেয়েছেন তাঁরা ভুলবেন না কোনকালেই।

এ রাজ্যের সকল অদিবাসী রমণীরাই দেশীয় মদ তৈরী করে। মদ তাদের আমোদ-প্রমোদের জন্য তৈরী হয় না — সমাজিক ও পূজা-পার্বণ, অতিথি আদর আপ্যায়ন প্রভৃতি কাজে মদের প্রয়োজন হয়। আদিবাসী সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ এই মদ। আধুনিক জীবনের সংস্পর্শে মদ তৈরী এবং আচার অনুষ্ঠানাদি এখন লুপ্তপ্রায়। তামাক সেবন আদিবাসীদের জন্মগত অভ্যাস — নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তামাক সেবন করে। শহুরে

হুঁকোর পরিবর্তে দেশজ বাঁশের হুঁ০কোই তারা প্রধানত ব্যবহার করে থাকে। আজকাল বিড়ি সিগারেটের প্রভাবে তামাক সেবন হ্রাস পাচ্ছে। অতিথি সেবায় মদ যেমন প্রয়োজনীয় উপকরণ তামাকও সমতুল্য উপকরণ।

বাসগৃহে বাতির ব্যবহার এবং আগুন তৈরীর আদিম পদ্ধতি

আদিবাসী সমাজে আধুনিককালের লণ্ঠন বা ঐ জাতীয় কোন গৃহ-আলোকিত করার ব্যবহার বেশীদিনের নয়। রাত্রিবেলা একরকম প্রদীপ (টিন বা দস্তা নির্মিত) ব্যবহার করত। আগুন সংরক্ষণের জন্য (অনেকের ঘরে দিয়াশলাই ব্যবহার খুব কম থাকায়) ওদের যে পদ্ধতি তা হচ্ছে উঠোনে বা উনুনে শুকনো বড় কাঠে আগুন ধরিয়ে সেটাকে তুষে চাপা দিয়ে আগুন জিইয়ে রাখা হয়। তুষ-চাপা জ্বলন্ত কাষ্ঠ-খণ্ড দীর্ঘ সময় আগুন ধরে রাখতে সক্ষম। পুরাকালে আদিবাসীরা যে দেশজ পদ্ধতিতে আগুন তৈরী করতো তা অবশ্যই বৈজ্ঞানিক। পদ্ধতিটি অতি সাধারণ — শুধু শ্রমের দরকার হয়। একটি শুকনো বাঁশের ওপর শুকনো বালি রেখে আর একটি শুকনো বাঁশ দিয়ে দু'জন দুই প্রান্তে বসে সজোরে এবং দ্রুতগতিতে ক্রমাগত ঘর্ষণ করার ফলে আগুনের শিখা বেরিয়ে আসে — এভাবে তারা সহজদাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে আগুন ধরিয়ে নেয়। অবশ্য এ পদ্ধতির আজকের দিনে প্রচলন নেই। আজকাল আগুন সংরক্ষণের জন্য আদিম পদ্ধতি অচল, সবাই দিয়াশলাই ব্যবহারে অভ্যস্ত।

আদিবাসীদের ব্যবহৃত অস্ত্র এবং যান্ত্রিক হাতিয়ার

উপজাতীয় সমাজে আগ্নেয়াস্ত্র কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আদিবাসীদের মধ্যে সম্পন্ন পরিবারে যে সচরাচর দেখা যায় তা হচ্ছে গাদা বন্দুক। শিকারপ্রিয় আদিবাসীদের মধ্যে গাদা বন্দুক ব্যবহার করতে দেখা যায়। বন্যজন্তু অর্থাৎ হরিণ, শূকর শিকারের জন্য গাদা বন্দুকই যথেষ্ট। ত্রিপুরার আদিবাসীদের মধ্যে দৈনন্দিন কাজের জন্য অর্থাৎ বনকাটা, জুম চাষের জন্য নানা রকম যান্ত্রিক হাতিয়ার (implement made of iron) ব্যবহৃত হয়। অপরিহার্য হাতিয়ার বললে নানা আকারে দা, কাঁচি, কুঠার, বর্শা, কোদাল প্রভৃতি। গারো উপজাতিরা একরকম তরবারি ব্যবহার করতো — গারো ভাষায় মিলাম। মিলাম লম্বায় তিন চার ফুট — এর ফলা দুই ইঞ্চি প্রশস্ত, অগ্রভাগ তীরের মত তবে ভোঁতা করে রাখা হয়। হাতল খুব পাতলা এবং বাঁকানো। হাতলে এক গুচ্ছ গরুর লেজের লোম এঁটে দেওয়া হত। পুরাকালে তিব্বত থেকে আনীত ইয়াক লেজের লোম শোভা পেত। মিলাম জঙ্গল কাটা, জ্বালানি কাঠ কাটা এবং ফলফলারি কাটার কাজে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া আত্মরক্ষার্থেও মিলাম অপরিহার্য বলে বিবেচিত।

কাপড় বোনা ও সুতো কাটার সরঞ্জাম

ত্রিপুরী, জমাতিয়া, চাকমা প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত রমণীকুল কাপড় বোনা ও সুতো কাটার বিষয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ। জুমে উৎপাদিত কার্পাস থেকে তুলো বের করে সে তুলো থেকে চরকায় সুতো কাটা হয় — প্রথমটির নাম চরকা দ্বিতীয়টি চরকি নামে পরিচিত। এমন একদিন ছিল প্রতিটি আদিবাসী বাড়ীতে চরকা ও চরকি দেখা যেত।

পশু শিকার পদ্ধতি

উপজাতি জনগণের মাছ মাংস প্রিয়তা সুবিদিত। সকল শ্রেণীর উপজাতি সম্প্রদায়ের শিকার পদ্ধতি প্রায় এক রকম। তবে পার্থক্যও আছে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসীরা তীরধনু, বর্শা এবং আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতি শিকারের হাতিয়ার নিয়ে বনে জঙ্গলে প্রবেশ করে বন্য শূকর, হরিণ, বাইসন প্রভৃতি প্রাণীর শিকার করে। ত্রিপুরার আদিবাসীদের মধ্যে তীরধনুর প্রচলন নেই — তবে ত্রিপুরার সাঁওতাল উপজাতিরা তীরধনু ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। ত্রিপুরী, জমাতিয়া, রিয়াং, লুসাই, কুকি জনগোষ্ঠীর শিকার পদ্ধতি একরূপ। গৃহপালিত পশুপাখির মাংসে ঘাটতি দেখা দিলে তারা জঙ্গলে শিকার করতে বেরিয়ে পড়ে। তাদের শিকার করাটা একটা অভিযান বলা যায়। সেখানে বীরত্ব যেমন আছে তেমনি রোমাঞ্চও আছে। গাদা বন্দুক, বল্লম, বর্শা, দা এবং লাঠি প্রভৃতি হাতিয়ার নিয়ে এরা শিকার করে। ত্রিপুরীদের জনপ্রিয় শিকার বলতে হরিণ, শূকর, বাইসন এবং বুনো মোষ। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ পেতে পশু ও পাখী শিকারের পদ্ধতিও বেশ উল্লেখযোগ্য। যদিও এই সমস্ত শিকার পদ্ধতি বর্তমানে বিলুপ্ত প্রায়। ত্রিপুরী সমাজের অন্যতম নৃত্যধারা 'মশক নৃত্য' (হরিণ অর্থে মশক) হরিণ শিকার-প্রাপ্তির আনন্দের নৃত্য থেকে উদ্ভুত। শিকারীরা হরিণ নিয়ে যখন বাড়ী ফেরে তখন মনের আনন্দে নৃত্যের তালে তালে পা ফেলে বাড়ীতে ফেরে। সেখান থেকেই মশক নৃত্যের প্রচলন। পরবর্তীকালে শিকার নৃত্যটি উৎসব এবং বিনোদন নৃত্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

মৎস্য শিকার

ত্রিপুরার অধিকাংশ আদিবাসী জনগোষ্ঠী মাছ খেতে ভালবাসে — সব রকম মাছ তাদের আহার্য। তবে শহরবাসীদের মত দৈনন্দিন খাবার টেবিলে মাছ তরকারি পরিবেশন সম্ভব নয়। মাছ তরকারির পরিবর্ত হিসাবে সিদল — শুঁটকি দৈনন্দিন রান্নার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। নদী নালা, পাহাড়ী নদী, বদ্ধ জলাশয় প্রভৃতিতে তারা মাছ ধরে। নদীতে মাছ ধরার জন্য বাঁশবেতের নানাবিধ সরঞ্জাম তৈরী করা হয় — সমতলভূমির জনগণের মাছ ধরার জাল তাদের সমাজে প্রচলন নেই। কালের গতিতে অতীতের অনেক কিছুই হারিয়ে যায় — আদিবাসীদের পুরনো দিনের পশুশিকার ও মৎস্য শিকারের প্রচলিত পদ্ধতি বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত। শিক্ষিত আদিবাসী সমাজে সব কিছুই অতীতের

স্মৃতি হয়ে আছে। এহেন ফলশ্রুতির জন্য সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়াকে (interaction) দায়ী করা চলে।

বাদ্যযন্ত্র বা যন্ত্রসঙ্গীত

উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর নরনারীর সঙ্গীতপ্রিয়তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সঙ্গীত প্রীতি তাদের স্বভাবজ গুণ বলা যেতে পারে। ত্রিপুরার আদিবাসী সমাজে কম বেশী বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার বা প্রচলন আদিকাল থেকে চলে আসছে। তবে সম্প্রদায় ভেদে কমবেশী বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বাঁশি এবং মাদল সকল সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। ত্রিপুরী ও গারো সমাজে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত আছে। এরা নিজেরাই দেশজ বাদ্যযন্ত্র তৈরী করে থাকে। বাদ্যযন্ত্রের তাল- সঙ্গত ব্যতিরেকে সঙ্গীত পরিবেশন করা যায় না — সঙ্গীতের সুর লহরীকে প্রাণবন্ত — প্রাণচঞ্চল করার জন্য বাদ্যযন্ত্রের অপরিহার্যতা। ত্রিপুরী সমাজে ব্যাপক প্রচলিত এবং জনপ্রিয় যন্ত্রসঙ্গীতের তালিকায় রয়েছে — মাদল, বাঁশের বাঁশি, চংফ্রেং (আধুনিক সেতার বা সরোদের আদিম সংস্করণ) সারিন্দা বা সারেঙ্গী এবং দাংদু। এ সমস্ত যন্ত্রসঙ্গীত বিভিন্ন গানের সঙ্গে বাজানো হয়। উপরোক্ত বাদ্যযন্ত্র ছাড়াও ত্রিপুরীদের আর একটি অদ্ভুত ধরনের বাদ্যযন্ত্র রয়েছে যা এখন প্রায় বিলুপ্ত। বাদ্যযন্ত্রের নাম তক্-তৈ-ত্রেং। নাম যেমন খটোমটো দেখতেও তেমনি ভারতের প্রচলিত কোন বাদ্যযন্ত্রের এর মিল নেই। পরিকল্পনাও অদ্ভুত। দেড় থেকে দু'হাত দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট এক টুকরো (আস্ত) বাঁশকে চিরে নীচের অংশকে একতারার আকারে রেখে উপর অংশে দু'দিকে দুটো একতারা যন্ত্রের মতো (তারযুক্ত) দু'দিকে জুড়ে বেঁধে দেওয়া হয়। জুড়ে দেওয়া যন্ত্রদ্বয়কে দু'দিকে টেনে ছেড়ে দিলে সজোরে আঘাতের ফলে সুন্দর শব্দ উৎপাদিত হয়, জুমের শস্যাদিকে পোকামাকড়, পশু পাখীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এই বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আজকাল এই যন্ত্রের ব্যবহার নেই বললেও চলে।

মাদল (খাম)

মাদল কাষ্ঠ নির্মিত ত্রিপুরা ভাষায় খাম। দু'দিকে গরুর চামড়ায় ঢাকা। বিভিন্ন নাচের সঙ্গে খাম বাজনা একান্ত অপরিহার্য — গড়িয়া নৃত্য খামের ব্যতীত অপরিহার্য। তাছাড়া শবযাত্রা এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানেও খাম বাজানো হয়।

বাঁশি (সুমু)

ত্রিপুরী সমাজে বাঁশির গুরুত্ব অপরিসীম। জনপ্রিয়তার দিক থেকে বাঁশির স্থান সবচেয়ে বেশী। প্রেম সঙ্গীত, বিরহ সঙ্গীত এবং অন্যান্য প্রমোদমূলক অনুষ্ঠান পর্বে

বাঁশি বাজনা অপরিহার্য। নিশিকালে রোমাঞ্চকর বংশীধ্বনি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রতিধ্বনিত হয়ে নিঃশব্দ অরণ্যের কোলে এক মায়াময় সুরের জগৎ সৃষ্টি করে। ত্রিপুরার বাঁশি 'টিপরাই' বাঁশি বলে সুপরিচিত। তার পরিচিতি ত্রিপুরার মাটি ছাড়িয়ে সুদূর শান্তিনিকেতনেও বিদিত। ত্রিপুরার বাঁশ (মুলি) যে বাঁশির জন্য উত্তম স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও জানতেন। তিনি ত্রিপুরার সুবিখ্যাত শিল্পী ঠাকুর ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মনকে ত্রিপুরার মুলি বাঁশ শান্তিনিকেতনে নিয়ে যেতে আদেশ করতেন।

সারিন্দা

ত্রিপুরীদের এই বাদ্যযন্ত্রটি বাংলার সারেঙ্গীর নামান্তর। এটি তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র। সুর অত্যন্ত মধুর। দেখতেও হুবহু সারেঙ্গীর মত। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম সঙ্গীতের সুর সারিন্দায় বাজানো হয়। মজার কথা এই যে কোন রকম শিক্ষা বা তালিম ছাড়াই ত্রিপুরী বাদকরা নিপুণ সহকারে সারিন্দা বাজাতে পারে। আজকাল আকাশবাণীতেও সারিন্দা বাদল সম্প্রচারিত হচ্ছে।

চংপ্রেং

চংপ্রেং বাদ্যযন্ত্রটি তারযুক্ত কাঠের তৈরী। শিল্পীরাই চংপ্রেং তৈরী করে। এটি পুরোপুরি দেশজ এবং ত্রিপুরীদের নিজস্ব যন্ত্রসঙ্গীত। এটাকে ঠিক সেতার বা সরোদের আদিম সংস্করণ বলা যেতে পারে। কারণ চংপ্রেং দেখতে অনেকটা সেতারের মত (Crude form of Sitar)। নাচের সঙ্গে এবং ঐক্যতান বাদনে চংপ্রেং বাজানো হয়।

দাংদু

দাংদু একটি ক্ষুদ্রাকৃতি যন্ত্রসঙ্গীত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে দাংদু বাদ্যযন্ত্রটি প্রচলিত। রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশে এটিকে moorsing অথবা moorchang বলা হয়। ইংরেজরা এটাকে চোয়ালবীণা (Jaw's harp) বলে অভিহিত করে থাকে। দেখতে অনেকটা মহাদেবের ত্রিশূলের অগ্রভাগের মত। নিম্নাংশ বলয়াকার (annular base) ঊর্ধ্বাংশ দ্বিশিখ কাঁটাযুক্ত দৈর্ঘ্যে দেড় ইঞ্চির মত। এই দ্বিশিখ কাঁটার মাঝ বরাবর নিম্নবলয় থেকে উর্ধ্বশিখ পর্যন্ত একটি পাতলা লোহার পাত যুক্ত করা হয় — পাতের অগ্রভাগ অঙ্কুশাকৃতি। যন্ত্রটি ঠোঁটের মাঝ বরাবর এঁটে দিয়ে নিম্ন অংশে বা হাত দিয়ে চেপে রেখে ডান হাত দিয়ে ঐ অঙ্কুশাকৃতি অংশে তর্জনী অঙ্গুলি দিয়ে বাজানো হয়। দাংদুর আওয়াজ বিচিত্র ধরনের অনেকটা সেতারের চেরা আওয়াজের মত। বাজাবার শ্বাস-প্রশ্বাসের উঠা নামার সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজও তরঙ্গায়িত হয়ে উঠে। ত্রিপুরী ঐক্যতান বাদনে দাংদু অন্যতম যন্ত্র সংগীত হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। হিন্দী সাহিত্যে দাংদুকে

সুখচাং বলে অভিহিত করা হয় — সংস্কৃত সাহিত্যেও দাংদুর উল্লেখ রয়েছে। পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে বর্মা, থাইল্যাণ্ড এবং ফিলিপাইন দেশে দাংদু বাদ্যযন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কেশ বিন্যাস বা কেশচর্চা

আদিবাসী রমণীদের সৌন্দর্যবোধ তথাকথিত আধুনিক রমণীকুলের চাইতে কোন অংশে কম নয়। ত্রিপুরার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আবালবৃদ্ধা রমণীদের নান্দনিক আদলে করবী বন্ধনে পারদর্শিতা যে কোন বিউটিশিয়ানের ঈর্ষার বস্তু হতে পারে। ত্রিপুরী রমণীদের গোলাকৃতি করবী বন্ধন অতীব মনোরম এবং দৃষ্টিনন্দন — গোলাকৃতি করবীর সঙ্গে ফুলের গুচ্ছ অথবা বনফুলমালা গুঁজে দিয়ে করবীকে অপূর্ব শিল্প রূপ দিতে তারা অত্যন্ত দক্ষ। করবীর চারদিকে পুঁতির মালাও অনেক সময় এঁটে দেওয়া হয় — তাছাড়া করবীর ওপর একরকম পাত্‌লা ওড়নাও তারা ব্যবহার করে থাকে।

(২) ভাবগত উপাদান (Subjective Elements)

ধর্ম বা দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস, রূপকথা, উপকথা, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস ও সংস্কার, যুদ্ধবিদ্যা ও ঝাঁড়ফুক, মেলা ও উৎসব, কৃষি উৎসব, শস্যদেবতার উৎসব, ধর্মীয় মেলা, মৌখিক সাহিত্য, ঘুম পাড়ানি গান, সঙ্গীত, প্রবাদ, ইতিকথা এবং নৃত্য, লোকশিল্প ধাঁধা প্রভৃতি অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় উপাদানসমূহ মনুষ্য সমাজের অফুরন্ত সাংস্কৃতিক সম্পদ। জাতি-উপজাতি, খণ্ডজাতি প্রভৃতি সকল শ্রেণী সমাজবদ্ধ নরনারী এই সম্পদে গরীয়ান। ত্রিপুরার আদিবাসী সমাজ-মানসে ভাবগত উপাদানসমূহ যুগ যুগ ধরে পরিপুষ্ট হয়ে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে — দৈনন্দিন চলার পথে অজানা প্রতিবেশীর সংস্কৃতির ভাবগত উপাদানে মিশ্রিত হয়ে একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। কোন সংস্কৃতিই চিরকাল isolated হয়ে থাকতে পারে না। কেননা মানুষের যাবতীয় চাহিদা মানুষ একা মিটাতে অক্ষম — তাই তাকে পর আপনের সহায়তা নিতেই হয় — সংস্কৃতি মিলনের ক্ষেত্রেও ঐ একই ধর্ম পালিত হয়।

ধর্ম ও দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস

নৃতাত্ত্বিক বিচারে সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের আদিবাসী বা উপজাতীয় জনগোষ্ঠী চীনের মঙ্গোলজাতির বিভিন্ন শাখা। সহস্র সহস্র বছর পূর্বে ঐতিহাসিক কারণে তিব্বত ও বর্মা দেশ অতিক্রম করে আসাম ও পূর্ববঙ্গের (বর্তমানে বাংলাদেশ) প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করেছিল সুদূর অতীত থেকে — নানা দেশ নানান ভিনদেশীয় সমাজ মানুষের সংস্পর্শে এসে নিজেদের ধর্মকে আঁকড়ে রাখতে সক্ষম হয়নি — তা

কোন দুর্বল মানব গোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব নয়। ত্রিপুরার বসবাসকারী সমগ্র উপজাতীয় জনসমাজের ধর্মের মধ্যে মিশ্রণ ঘটেছে। ত্রিপুরার বসবাসকারী ১৯ টি উপজাতীয় জনগোষ্ঠীদের মধ্যে বর্তমানে কেউ হিন্দু, কেউ খৃষ্টান, কেউ বৌদ্ধ এমনটি হয়েছে ঐ একই কারণে— বিভিন্ন উন্নত মানের ধর্মের প্রভাবের ফলে। কিন্তু নিজেদের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান বলে পরিচয় দিয়ে হিন্দু দেবদেবীর পূজা করলেও তাদের নিজ নিজ যে ধর্মবিশ্বাস অটুট রয়েছে তা হচ্ছে সর্বপ্রাণবাণ বা animism। প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুর মধ্যে অদৃশ্য শক্তি নিহিত আছে বলে তাদের বিশ্বাস — সেই শক্তিতে আস্থাই প্রাণবাদ বা animism। তারা জল, নদী, অগ্নি, পর্বত, চন্দ্র, সূর্য বৃক্ষ, অরণ্য, ধান, কার্পাস প্রভৃতিকে এক একটি দেবদেবী জ্ঞান করে। একথা বিদিত যে উচ্চতর ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকজনও সর্বপ্রাণবাদ থেকে মুক্ত নয়। তাই তারা উপজাতিদের আদি বিশ্বাসকে মূল্য দিয়ে উপজাতিদের হিন্দুধর্মাবলম্বী বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। চতুর্দশদেবতা মন্দিরে ত্রিপুরীদের যেসব দেবদেবী পূজিত হয় সবই হিন্দুদের দেবদেবী। তথাপি বেদোক্ত হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে উপজাতীয় দেবদেবীর নানা পূজা পদ্ধতি, আচার-অনুষ্ঠান এক নয়। হিন্দুধর্মাবলম্বী ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া, উচই, নোয়াতিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত নরনারী হিন্দুদেবদেবী যথা কালীমাতা, লক্ষ্মী, শিব, বিষ্ণু, বিশ্বকর্মা, গঙ্গা প্রভৃতি দেবদেবীর প্রতি ভক্তি ও পূজা দিয়ে থাকে। তবে পূজা পদ্ধতি কিছুটা ভিন্নতর। ত্রিপুরীরা লক্ষ্মী পূজাতে (মাইলুংমা দেবীর পূজা) মুরগী বলি দিয়ে থাকে — হিন্দু বাঙ্গালী রমণীকুল তা দেখলে আঁতকে উঠবেন হয়তোবা। ত্রিপুরীদের প্রধান দেবতা সিব্রাই হিন্দু বাঙ্গালীদের শিব বা মহাদেবের রূপান্তর হতে পারে। উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে অপদেবতার পূজার প্রচলন রয়েছে। অপদেবতারা যে কোন সময় ক্ষতি সাধন করতে পারে বলে তাদের পূজা দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতে হয়। আদিবাসী সমাজে অপদেবতা (evil spirit) এবং উপকারী দেবতা (guardian spirit) দুই বর্তমান। শেকস্‌পীয়ারের নাটকের evil spirit এবং guardian spirit -এর সঙ্গে তুলনা করা চলে। খেত-খামার যাতে শস্যপূর্ণ হয়ে উঠে তার জন্য ধান ও কার্পাস দেবী (মইলুমা-খুলুম)-কে পূজা করতে হয় — সম্প্রাপূজা তাদের অন্যতম পূজা। সমাজের হিতসাধনই এই পূজার মূল উদ্দ্যেশ্য। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ-জীবনের ত্রিবিধ লগ্নে এই লাম্প্রাপূজা দেওয়া হয়। তাছাড়া তাদের বিভিন্ন দেবদেবী যথা মতাই কতর, তুইমা, হাচুকমা, সংগ্রমা, নকুস মতাই (গৃহদেবতা), কালেয়া গড়েয়া, সাক্‌লামতাই, কেরপূজা, খারচি পূজা এবং কাথারক প্রভৃতি।

এতদ্‌ব্যতীত রয়েছে ক্ষতিকারক দেবতা যেমন বুরুইরক, বুরাসা (অপদেবতা), সাকালজুক, হাইচুকমা ইত্যাদি — বলা বাহুল্য উপরোক্ত দেবদেবীসমুহ ত্রিপুরী এবং

অন্যান্য করবরকভাষী জনগোষ্ঠীর মূলতঃ উপাস্য দেবতা। নিজস্ব পূজাপার্বণ ছাড়াও হিন্দু আদিবাসীরা দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা শনিপূজা, লক্ষ্মীপূজা, শিবপূজা, জগন্নাথদেবের পূজা করে থাকে। উল্লেখ্য যে শিক্ষিত এবং আধুনিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত সকল আদিবাসী জনসমাজ আদিম ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে ক্রমশঃ সরে এসে আধুনিক ধর্ম যথা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অধিকতর আস্থাশীল হয়ে উঠেছে।

হিন্দু আদিবাসী ছাড়াও এ রাজ্যে খ্রীষ্টান এবং বৌদ্ধ ধর্মান্তরিত জনগোষ্ঠী রয়েছে। চাকমা এবং মগ জনগোষ্ঠীদ্বয় বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী — কুকি, লুসাই, হালাম প্রভৃতি খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত। মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত কোন আদিবাসী এ রাজ্যে নেই বলা চলে। মগ ও চাকমা জাতি বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী হলেও নিরামিষ-ভোজী নয়। সর্বপ্রাণবাদে এদের বিশ্বাস এখনো অটুট — তাই সংস্কার; কুসংস্কার, অপদেবতা — দেবতার প্রতি এদের বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়নি। চাকমারা বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নয়। এরা হিন্দু ও আদিবাসীদের আচার অনুষ্ঠান পালন করে। এরা শিব, কালী, নদী ও জলদেবীকে বিশ্বাস করে। ভূত প্রেতকে খুশী করার জন্য এরা পূজা দিয়ে থাকে । চাকমাদের মূল দেবতার নাম 'থানমানা' — এটি জাতীয় পূজা , বছরে দু'বার উদ্‌যাপিত হয় — জ্যৈষ্ঠ ও মাঘ মাসে এ পূজা দেওয়া হয় — ১৫ টি দেবদেবীর সমন্বয়ে এ পূজো অনুষ্ঠিত হয়। ১) বিয়াতারা, ২) গঙ্গা, ৩) মায়ানি, ৪) হায়ানি, ৫) সইখিয়া, ৬) আথিরা, ৭) ফুলকুমারী, ৮) বোনাত্‌, ৯) নীলকুমারী, ১০) দুলুকুমারী, ১১) মালকুমারী, ১২) জলকুমারী, ১৩) লাগা চিয়াল, ১৪) বাতকুমারী, ১৫) বরশিলা।

বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী হলেও মগ ও চাকমারা ত্রিপুরীদের বুড়া দেবতা, গাংপূজা করে থাকে। মগ-চাকমারাও ডাইনীবিদ্যাকে বিশ্বাস করে। সকল উপজাতীয় দেবদেবীর পূজা পদ্ধতির উৎস এক ও অভিন্ন।

অপরদিকে খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী কুকি ও লুসাইদের সমগোত্রীয় হালাম সম্প্রদায় এবং রোমান ক্যাথলিক বিশ্বাসী গারো উপজাতিরা ত্রিপুরীদের মত কেরপূজা জুমদেবী, দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা করে থাকে যদিও এই সমস্ত দেবদেবীর নাম ভিন্নতর। হালামদের পূজিত হাচুংমা, তুইমা, সেরিং আর্খা, লাকুমফই, পায়েংফা ত্রিপুরীদের দেবদেবী গঙ্গা, শস্যদেবী, কার্পাসদেবতাদের ভিন্নতর নাম। সুতরাং সকল উপজাতীয় গোষ্ঠীর পূজা পদ্ধতি, দেবকল্পনা সম্পূর্ণ অভিন্ন একথা বলাই বাহুল্য।

বিশ্বাস ও সংস্কার

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অযৌক্তিক ব্যাখ্যা কিংবা প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে পরিপূর্ণ অজ্ঞতার জন্য নানা অবাস্তব লোকবিশ্বাসের উদ্ভব হয়। এহেন অবাস্তব লোকবিশ্বাস

জাতি উপজাতি সমাজে রয়ে গেছে। শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত নরনারীও এর হাত থেকে নিস্তার পায়নি আজো। যাত্রাকালে শূন্য কলসী দর্শন সায়ংকালে গৃহমধ্যে পেঁচার প্রবেশ, যাত্রাকালে দক্ষিণ পাশে সর্প দর্শন বা রমণীর কাঁখে শূন্য কলসী দর্শন প্রভৃতি অমঙ্গলসূচক বলে ধরা হয় — এই প্রচলিত বিশ্বাস সমগ্র জাতি উপজাতিদের মধ্যে বলবৎ আছে। সম্ভবতঃ অতীতের কোন করুণ বা কাকতালীয় অভিজ্ঞতা থেকে এহেন বিশ্বাসের জন্ম হয়েছে। প্রত্যেক সমাজে এই রকম অসংখ্য লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে।

লোকবিশ্বাস

কোথাও যাত্রার সময় হাঁচি অমঙ্গলসূচক। যাত্রার সময় শূন্য কলসী দর্শন, গৃহে পেঁচার প্রবেশ, পথচলতিতে হরিণের ডাক শ্রবণ — কোন শূকর পায়ে ভর করে বসলে, কোন মুরগী খুব ছোট আকারের ডিম দিলে অথবা কোন মুরগী যদি মোরগের মত ডাক ছাড়ে তাহলে ঐ সমস্ত অমঙ্গলসূচক — পক্ষান্তরে ভরাকলসী কাঁখে রমণীর দর্শন, পথপার্শ্বে ফুটন্ত ছত্রাক, পথ চলতিতে শ্বেতহস্তীর দর্শনলাভ, যাত্রার প্রাক্কালে মোরগের ডাক অথবা অলংকৃত যুবতী বা বিবাহিত রমণীর দর্শন এবং বাড়ীর ফটকেপূর্ণ কলসীর অবস্থিতি প্রভৃতি শুভসূচক।

অধিকাংশ উপজাতীয় নরনারীর বিশ্বাস ঘুমন্ত অবস্থায় আত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে পড়ে। এই আত্মা শরীর থেকে নির্গত হওয়ামাত্র ফড়িং-এর রূপ ধারণ করে দূর দূরান্তে পরিক্রমা করে প্রভাত-লগ্নের পূর্বেই আবার শরীরে প্রবেশ করে — এই ধারণার বশবর্তী হয়ে উপজাতি লোকেরা সন্ধ্যার পর কোন ফড়িং হত্যা করে না। সকল উপজাতি নরনারী পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে। এদের বিশ্বাস এজন্মে সুকৃতি করলে পরজন্মে আবার মানুষ হয়ে জন্ম লাভ করে। এরা এটাও বিশ্বাস করে যে রমণীর খুব প্রিয়জন মৃত্যুর পর আবার সেই রমণীর গর্ভে চলে আসে।

বাধানিষেধ

বাধানিষেধ এক শ্রেণীর যুক্তিহীন নেতিবাচক লোকবিশ্বাস। অজ্ঞতা এবং জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে জন্মলাভ করে। উন্নত হিন্দু বাঙ্গালী নারীদের মত এই জাতীয় যুক্তিহীন বিশ্বাস আদিবাসী নারীদের জীবনেও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে -এর হাত থেকে মুক্তি পায়না কোন আদিবাসী রমণী। উপজাতি পুরুষ-মহিলা উভয়েই এই বাধানিষেধের আওতায় পড়ে। কোন আদিবাসী রমণীকে জোড়কলা খাওয়ানো হয় না। জোড়কলা খেলে যমজ সন্তান হবার সম্ভাবনা রয়েছে। উপজাতিদের মধ্যে ত্রিপুরী রমণীরা বাঁশবেতের কোন ঝুড়ি বা খাঁচা তৈরী করে না — পক্ষান্তরে কোন পুরুষ বস্ত্র বয়ন, সুতো কাটা প্রভৃতি মেয়েলী কাজ থেকে বিরত থাকে — ওদের বিশ্বাস কোন পুরুষ কাপড়

বুনলে বাঘের পেটে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। ঋতুমতী ত্রিপুরী রমণীদের রান্না করা কাজ থেকে বিরত থাকতে হয় — এমনকি রান্না করা খাবার পরিবেশন করাও নিষেধ। ত্রিপুরী রমণীদের (বিশেষ করে বিবাহিতা) এলোচুলে থাকা নিষেধ আছে। এ রকম অসংখ্য বাধানিষেধ মেনে চলতে হয় আদিবাসী রমণীদের।

স্বপ্নতত্ত্ব এবং কুসংস্কার

ত্রিপুরী এবং অন্যান্য উপজাতি জনগণের বিশ্বাস স্বপ্নের ফলাফল বাস্তবে পরিণত হয়। ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা স্বপ্নে আভাস পাওয়া যায়। খারাপ স্বপ্ন দেখলে সকলের কাছে প্রকাশ করাতে হয় — ভাল স্বপ্ন গোপন রাখতে হয়।

ভবিষ্যৎ কথন (divination)

ভবিষ্যতে কোন শুভ কাজ করতে প্রয়াস বা উদ্যোগ নিলে স্বপ্নের ফলাফলের বিচার বিশ্লেষণ করার পদ্ধতিই divination বা ভবিষ্যৎ-কথন। উপজাতিদের মধ্যে জুমখেতের জন্য বনকাটার আগে ঐ নির্বাচিত এলাকা থেকে এক ডেলা মাটি এনে বালিশের তলায় রেখে ঘুমোবার রেওয়াজ রয়েছে — মাটি কুড়োবার সময় কোন চিল বা হরিণের ডাক শোনা গেলে ধরে নিতে হয় জুম ক্ষেত্রটি ভাল নয়। অতপর নতুন কাপড় পরে ঘুমোতে হয় — স্বপ্নে মহিষ, গরু, হাতি, মাছ, জল এবং জ্বলন্ত প্রদীপ অথবা বিবাহ অনুষ্ঠান দেখা মিললে ক্ষেত্রটি শুভ এবং ভাল ফসল ফলবে তা সুনিশ্চিত। পক্ষান্তরে নগ্ন রমণী, মৃত পশু, আগুন, লাল কাপড়, আরক্ষা কর্মী, কারোর হাসি এবং জনতার ভীড় স্বপ্নে দেখা দিলে নির্বাচিত জুমখেত অশুভ বলে ধরে নেয়া হয় এবং পরিত্যক্ত হয়।

কুসংস্কার

কুসংস্কার সকল শ্রেণীর মনুষ্য সমাজে প্রচলিত। আধুনিক সমাজও এই কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারেনি। আদিবাসী রমণীদের মধ্যেও নানা রকম কুসংস্কার প্রচলিত আছে। যেমন কোন রমণীর অতিরিক্ত রজঃস্রাব নির্গত হলে তার প্রতিকার হিসাবে কাঁকড়ার গর্তের মুখে মুরগী বলি দেওয়ার প্রথা রয়েছে। কোন ব্যক্তি দুর্ঘটনায় আহত হলে সেই অকুস্থলে মুরগী বলি দেওয়া হয় — এতে রোগের প্রতিকার হয় বলে তাদের কুসংস্কার প্রচলিত আছে। গর্ভবতী মহিলাকে বিশেষ ধরনের মাছ খেতে দেওয়া হয় না — কুচিয়া (বানমাছ সদৃশ) মাছের চোখ খুব ছোট বলে সন্তানসম্ভবা কোন মহিলাকে খেতে দেওয়া হয় না — এদের ধারণা কুচিয়া মাছের মত সন্তানের ক্ষুদ্র চক্ষু হতে পারে।

আবার মেনি মাছের মুখের হাঁ বৃহৎ বলে কোন গর্ভবতী মহিলা মেনি মাছ খাবে না — সন্তানের মুখের হাঁ (মুখব্যাদান) বড় হওয়ার আশঙ্কায় মেনি মাছ খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হয়। কিন্তু এই বিধিনিষেধ ছাড়া গর্ভবতী মহিলাকে নিজের পছন্দ বা ইচ্ছা অনুসারে যথেষ্ট পরিমাণে মাছ খেতে দেওয়া হয়। মায়ের অতৃপ্ত ক্ষুধা না মিটলে গর্ভস্থ সন্তানের মুখ থেকে অকারণে লালা নিঃসৃত হতে পারে এই কুসংস্কারও তাদের মনে গেঁথে আছে।

প্রবাদ-প্রবচন

১। মাছে মাছ খায়।

২। গরীব পরিবারে বড় সন্তান হয়ে জন্ম নিতে নেই।

৩। ফুলের সুবাস বাতাস বয়ে নিয়ে যায়।

৪। বাক্‌পটু পুরুষ গ্রামের সংহতি আনে।

৫। মুখরা রমণী গ্রামের একতা বিনষ্ট করে।

৬। অলস ব্যক্তির অন্ন জোটে না।

৭। কাঁটায় কাঁটা তোলা হয়।

৮। চাঁদের সদৃশ গোলাকার বস্তু নেই।

৯। সূর্যের মত শক্তিশালী কেউ নেই।

১০। মাতৃসম উত্তম বস্তু আর নেই।

১১। সাত সন্তানের জননীর বসার স্থান নেই।

১২। এক সন্তানের মা খেতে পায় না।

ধাঁধা

উপজাতিদের ধাঁধাসমূহ তাদের বুদ্ধিমত্তা, রসবোধ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয়।

ধাঁধা	উত্তর
১। মাথায় জটা পাছায় জটা।	আনারস
২। যে ফুল দিনে ফোটে রাত্রে ফোটে না।	ছত্র/ছাতি
৩। যে নৌকা জল ছাড়া ভাসে।	দোলনা

৪।	মা কাঁদলে বাচ্চা বাড়ে।	চরকা (সুতাকাটা)
৫।	'যে বাগানের ফুল কেউ চয়ন করতে পারে না।	তারাভরা আকাশ
৬।	চোখে দেখা যায় না কিন্তু হাতে ধরা যায়।	নিজের মাথা
৭।	যে রাজার পাগড়ী গুটিয়ে শেষ করা যায় না।	রাজপথ
৮।	অতিক্ষুদ্র বস্তু কিন্তু সারা ঘরকে পূর্ণ করে।	প্রজ্বলিত প্রদীপ

যাদুবিদ্যা তন্ত্রমন্ত্র ঝাড় ফুঁক

যাদুবিদ্যা-তন্ত্রমন্ত্রের প্রয়োগ আদিবাসী সংস্কৃতির অন্যতম ক্ষেত্র। এদের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে যাদুমন্ত্রের ছোঁয়া রয়েছে। শিকার, জুমফসল এবং রোগনিরাময়, শত্রুর দমন, কাঙ্ক্ষিত বস্তুর লাভ (প্রেমিকার মন জয় করা) প্রভৃতি যথাযথ মন্ত্র উচ্চারণও তার প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে। বাসস্থান নির্বাচন এবং গৃহ নির্মাণের দিনক্ষণ নির্ধারিত হয় জ্যোতিষবিদ্যা নির্ভর আচরণবিধির ওপর। জুমকৃষির আদ্যোপান্ত অর্থাৎ ফসলকাটা, জঙ্গল পোড়ানো থেকে আরম্ভ করে নবান্ন উৎসব পালন অবধি মন্ত্র-তন্ত্রের কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানে যাদুকে মায়াবিদ্যা বা ডাকিনী বিদ্যার পর্যায়ে গণ্য করা হয় না। যাদুমন্ত্রের প্রয়োগের ক্ষেত্রে আংশিক বিজ্ঞানসম্মত কলাকৌশল লক্ষণীয়। যাদুমন্ত্র প্রয়োগের উদ্দেশ্যে মাধ্যম হিসাবে কতকগুলি বস্তু ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন মন্ত্রপুত কবচ, চুল, জোড়া নখ, এক টুকরো কাপড়, বিশেষ ধরণের গাছের পাতা ও শিকড়, লাল ও কালো সুতা। এদের বিশ্বাস এই সমস্ত বস্তুগুলিকে মন্ত্রপুত করলে শত্রুকে পরাজয় এবং মিত্রকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। আদিবাসী পুরোহিত বা অচাইকেও রক্ষা করা যায়। আদিবাসী পুরোহিত বা অচাইকেও যাদুমন্ত্রের আশ্রয় নিতে হয়। যাদুকর অচাই মন্ত্রপুত বাণ গাছে মারার পর যে প্রতিক্রিয়া হবে তা হচ্ছে — যার উদ্দেশ্যে এই বাণ নিক্ষেপ করা হবে সেই তীরবিদ্ধ গাছ শুকিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষও রোগে ধীরে ধীরে শুকিয়ে যেতে থাকবে। তাছাড়া শত্রুপক্ষের জোড়া নখ, চুল, কাপড়ের কোণ, থুথু, মলমূত্র, গোপনে সংগ্রহ করে শত্রুদের ক্ষতিসাধন করার প্রয়াসও চালানো হয়ে থাকে ।

আদিবাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস যাদুকর মন্ত্রদ্বারা শত্রুদের পেটে মাংসপিণ্ড, ধারালো বাঁশের কঞ্চি বা যে কোন বস্তু প্রবেশ করিয়ে মৃত্যু ঘটাতে পারে। কোন কুদৃষ্টিসম্পন্ন লোক জুমের লাউ, কুমড়ো বা অন্য কোন জুম ফসলের দিকে তাকালে ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ বিশ্বাস তারা করে থাকে । এ রকম কোন কুদৃষ্টি জুম ফসলে পতিত

হলে প্রতিকার করার জন্য অচাই-এর সাহায্য নিতে হয়।

আদিবাসী সমাজের পুরোহিত বা অচাই-এর গুরুত্ব অত্যধিক — অচাইরা একাধারে চিকিৎসক বা বৈদ্য এবং জ্ঞানী দূরদর্শী এবং ভবিষ্যৎ বক্তা। অচাইরা মন্ত্র এবং নানাবিধ বনজ দ্রব্যাদির সাহায্যে ঝাড়ফুঁক দিয়ে নানান রোগের চিকিৎসা করে থাকে । সরিষা পড়া মন্ত্র দ্বারা এরা শিশুদের চিকিৎসা করে। সূতিকা রোগ, স্তন-বাত, পাগলা কুকুরে দংশন, সর্পদংশন, জ্বর, আমাশয়, বহুমূত্র রোগ, অর্শরোগ, মনোরোগ প্রভৃতি রোগ হলে নানাবিধ উপকরণের সাহায্যে ঝাড়ফুঁক করে চিকিৎসা করে থাকে।

আদিম ভেষজবিদ্যা (Folk or primitive medicine)

শারীরিক পীড়া মনুষ্য সমাজের প্রধান সমস্যা। শারীরিক ব্যাধির নিরাময়ের জন্য কি আদিবাসী কি উন্নত সমাজ বিভিন্ন রকমের চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। উন্নত সমাজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা বিদ্যার প্রয়োগ করা হয় — অনুন্নত বা আদিবাসী সমাজে লতাপাতা গাছ গাছালি এবং যাদু বিদ্যার সাহায্যে চিকিৎসা প্রচলন সুদুর অতীত থেকে । সে ধারা বর্তমান কালেও অব্যাহত । নিত্য নিয়ত রোগ নিরাময়ের জন্য ভেষজ দ্রব্যের ব্যবহার পৃথিবীর সমগ্র মনুষ্য সমাজে প্রচলিত আছে। ভেষজ দ্রব্যাদির সাহায্যে চিকিৎসা পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক কিন্তু আদিবাসীদের অজ্ঞতার কারণে যথাযথ প্রয়োগ করা হয় না — তাই ভেষজ গুণাবলী কার্যকরী হতে পারে না। তাছাড়া ভেষজ দ্রব্যাদির সঙ্গে নানা রকম তন্ত্রমন্ত্র ব্যবহারের জন্য অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত হয় বলে রোগ নিরাময় হয় না প্রায়শই।

ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাসকারী বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় সমূহে একই চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। নানাবিধ রোগের প্রতিকারের জন্য নানা রকম ওষুধ তৈরী করা হয় ভেষজ দ্রব্যাদি থেকে । তবে ভেষজদ্রব্যের সঙ্গে মন্ত্র-তন্ত্রের ব্যবহারের হেতু অনেক সময় ওষুধের গুণ কার্যকরী হয় না — ভেষজ দ্রব্যাদি বৈজ্ঞানিক হলেও মাত্রাগুণ ও প্রয়োগবিদ্যার ত্রুটিবহুল হওয়ায় আদিম চিকিৎসা পদ্ধতি রোগ নিরাময়ের সহায়ক হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু এখানে সবিশেষ উল্লেখ্য যে মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়ফুঁক বাদ দিলে আদিবাসীরা যে সমস্ত ভেষজ দ্রব্যাদি ব্যবহার করে থাকে তা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত ও চিকিৎসাশাস্ত্র সম্মত — কেননা আধুনিক চিকিৎসার সব রকম ওষুধ-পত্র ভেষজ দ্রব্যাদি থেকে তৈরী হয়। আদিবাসী সমাজের অচাইরা যে লতা-পাতা গাছ গাছালির বাকল বা নির্যাস দিয়ে নানা রোগের চিকিৎসা করে থাকে তা পুরোপুরি আধুনিক আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার অনুরূপ। আশার কথা এই যে আজকাল অনেক গবেষক ভেষজ দ্রব্যাদির ঔষধি গুণাবলীর উপর গবেষণা করতে এসেছেন। আদিবাসীদের ব্যবহৃত লতাপাতা গাছ গাছালির ঔষধি গুণাগুণ

আধুনিক চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়াস চালানো হচ্ছে। এটা শুভ লক্ষণ — বন-জঙ্গলে এমন অনেক ঔষধি গাছ লতাপাতা রয়েছে যার বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগে অনেক মারাত্মক রোগও সেরে যেতে পারে। আদিবাসীদের চিকিৎসার পদ্ধতির কিছু নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

১। কারোর সামান্য চক্ষুপ্রদাহ হলে চিকিৎসক একটি পিঁয়াজ মুখে চিবিয়ে রোগীর চোখে মুখ থেকে সজোরে ছিটিয়ে দেন। এই পদ্ধতি ফলপ্রদ বলে প্রমাণিত।

২। কারোর জ্বর হলে 'সাংদারি' নামে লতাগাছের রস বের করে মধু দিয়ে খাওয়ানো হয়।

৩। অগ্নিমান্দ্য রোগীকে খাগড়া জাতীয় গাছের দানা গুঁড়ো করে জলে মিশিয়ে খাওয়ানো হয়। কক্‌বরকভাষীরা এই গাছকে থারাই বলে। থারাই স্যাঁতস্যাঁতে নিম্নভূমিতে জন্মায় — থারাই গাছ অত্যন্ত নরম গাছ। এর চারাগাছ অত্যন্ত সুস্বাদু — আদিবাসীদের প্রিয় রান্নার সব্জি।

৪। আঘাতজনিত রক্তপাত হলে মাসুন্দই, সামব্রেমা এবং দূর্বার পাতা বেটে ক্ষতস্থানে দিলে রক্তপাত বন্ধ হয়। মাসুন্দই বাংলার বনতুলসী ছাড়া আর কিছুই নয়।

৫। শিশুর কানের পেছনে ক্ষত হলে ছত্রাকের ছাই লাগানো হয়।

৬। শিশুর গায়ে ফুসকুড়ি দেখা দিলে তিল তেলের সঙ্গে 'রোও' নামক গাছের শিকড়-রস মিশিয়ে মাখা হয়।

৭। কারোর মুখে ফুসকুড়ি হলে উনুনের পোড়ামাটির কাই (paste) মাখিয়ে দেওয়া হয়। সপ্তপর্ণী গাছের রস বা কস খেতে দেওয়া হয়। সপ্তপর্ণীগাছকে চেথুয়াং বলা হয়।

৮। বমিভাব, বদহজম এবং কোষ্ঠকাঠিন্য হলে সেঁকা নুন খেতে দেওয়া হয়।

৯। পেটফাঁপা রোগীকে 'দুখুই' নামক গাছের পাতা ভাজা করে খেতে দেওয়া হয়।

১০। মাথাধরা জ্বরের রোগীর কপালে কলাগাছের শিকড়সমেত পট্টি বেঁধে দেওয়া হয়।

১১। পেটের যন্ত্রণায় রোগীকে আদা খেতে দেওয়া হয়।

১২। সন্তানবতী মায়ের স্তনে দুধ জমাট বেঁধে গেলে কুমড়ো বা লাউ পাতা গরম জলে ভিজিয়ে স্তনের উপরিভাগে মালিশ করা হয়।

১৩। ফোঁড়া বা বিষ ফোঁড়া হলে কুমড়ো পাতার রস সাবান এবং চুন মিশিয়ে প্রয়োগ করা হয়।

১৪। সন্তানবতী মায়ের পাতলা পায়খানা হলে লজ্জাবতীর শিকড় বেটে খাওয়ানো হয়।

১৫। হাড় ভাঙলে বিবিধ গাছের পাতা বা বাকল বেটে শামুকের মাংস অথবা ডিমের কুসুমের সঙ্গে মাখিয়ে ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করা হয়। ভগ্ন অংশে মিশ্রিত ওষুধ কাপড় দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয় — এতে ভাঙা হাড়ে জোড়া লেগে যায়।

১৬। শরীরের কোন গাঁটে ব্যথা হলে শূকর-তেল দিয়ে মালিশ করা হয়।

১৭। শিশুর সর্দি কাশি হলে বুকে ও পিঠে শূকর তেল মালিশ করা হয়।

১৮। কারো কফ জমলে বাসকপাতা, আদা এবং গোলমরিচ জলে সিদ্ধ করে রোগীকে খাওয়ানো হয়। এতে কফ সেরে যায়। এ পদ্ধতি পুরোপুরি আয়ুর্বেদিক।

সঙ্গীত ও নৃত্যকলা

উপজাতি বা আদিবাসী জীবনের সঙ্গে সঙ্গীত ও নৃত্যকলা ওতপ্রোতভাবে গ্রথিত। সঙ্গীত ও নৃত্যকলা তাদের জীবনের সুর ও ছন্দের সমতুল। তাদের জীবন বীণায় সঙ্গীতের সপ্তসুর বাঁধা। সঙ্গীত তাদের জীবনের স্পন্দন। তাই সঙ্গীত ও নৃত্য উপজাতি সাংস্কৃতিক জীবনের মূলসুর। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত উপজাতিদের ইহলোক পরলোকের সঙ্গে সঙ্গীত অষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। সঙ্গীত ও নৃত্য এই দ্বিবিধ কলাবিদ্যা আদিম সমাজের অনুশীলনী ক্ষেত্র থেকে জন্ম নিয়েছিল তাও নয়। বরং বলা যায় তাদের জীবনের মৌলিক প্রয়োজনের তাগিদেই সঙ্গীত ও নৃত্যের জন্ম। আদিবাসী-সঙ্গীত দেবদেবীর বন্দনা, প্রেমমিলনের ব্যাকুলতা দৈনন্দিন আনন্দ বেদনা ও বিরহ-মিলনের বহিঃপ্রকাশ। এদের সঙ্গীত ধারাকে মূলতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা — ধর্মীয়, সামাজিক বা বিনোদনমূলক এবং রোমান্টিক বা কল্পনা-রঙ্গীন।

ধর্মীয় সঙ্গীত

জগৎপিতা, দেবদেবী, অপদেবতাদের প্রশস্তিমূলক গান, অনাবৃষ্টি, সুফসল, সংক্রামক ব্যাধির রোধ, শত্রুর বিনাশ, মৃত ব্যক্তির আত্মার আবাহনমূলক সঙ্গীত সমূহ ধর্মীয় সঙ্গীত পর্যায়ভুক্ত।

সামাজিক সঙ্গীত

জন্ম, বিবাহ, ফসলকাটা, নবান্ন এবং অন্যান্য সামাজিক উৎসব সমূহে পরিবেশিত সঙ্গীত সমূহ এই পর্যায়ে অন্তর্ভূক্ত।

রোমান্টিক সঙ্গীত

প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের হৃদয়মথিত কামনাবাসনা রোমান্টিক সঙ্গীতে বাঙময় হয়ে ওঠে। নরনারীর রোমান্টিক প্রেমসঙ্গীত অনেক সময় আধ্যাত্মিক রসস্নাত হয়ে ভগবৎপ্রেমে উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

নৃত্যকলা

নৃত্যকলা আদিবাসী সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। সঙ্গীতের অপরিহার্য অনুষঙ্গ। সঙ্গীত বিদ্যা (art) নৃত্যের অনেক পরে এসেছে। সঙ্গীত নৃত্যের প্রাণ স্পন্দন — নৃত্য সঙ্গীতের বহিরঙ্গ প্রকাশ মাধ্যম। তাদের সমাজ সঙ্গীত ও নৃত্য ব্যতিরেকে প্রাণহীন দেহ। এদের সঙ্গীত ও নৃত্যচর্চা অনাদিকালের। জীবন ও জীবিকাকে কেন্দ্র করে আচার অনুষ্ঠান পূজা পার্বণ ধর্মীয় আচরণ সমাজ মানসে অঙ্গীভূত হয়ে আছে সুদূর অতীত কাল থেকে। বিশ্ববিশ্রুত নৃ-বিজ্ঞানী ডক্টর ভেরিয়ার এলুইন উপজাতি নৃত্যধারাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। একটি আনুষ্ঠানিক অপরটি বিনোদনমূলক। (Ceremonial and recreational). আনুষ্ঠানিক নৃত্য ধর্মীয় উৎসবে পরিবেশিত হয় — বিনোদনমূলক নৃত্য যুবক-যুবতীবৃন্দ সামাজিক মিলন উৎসবে পরিবেশন করে থাকে।

এ রাজ্যে বিভিন্ন উপজাতি সমাজে বিভিন্ন ধরনের নৃত্য প্রচলিত আছে। ত্রিপুরী, রিয়াং, গারো, চাকমা, হালাম ও লুসাইদের নৃত্যরূপ বৈচিত্র্যময়। ত্রিপুরীদের গড়িয়া নৃত্য, লেবাং বুমানি, জুম নৃত্য, মশক নৃত্য, মামিতা, রিয়াংদের হজাগিরি (ভারসাম্য নৃত্যও বলা হয়), চাকমাদের বিজু নৃত্য (বর্ষবরণ নৃত্য), গারোদের গানা নৃত্য (আনুষ্ঠানিক) রণ নৃত্য (আনুষ্ঠানিক), দোক্রুনৃত্য (সামাজিক), আমবারে রুরুয়া নৃত্য (বিনোদনমূলক) কিলপুয়া নৃত্য (আচার নৃত্য), লুসাই বংশনৃত্য অর্থাৎ চেরনৃত্য (বিনোদনমূলক) এবং হালামদের হৈ-হক্ নৃত্য (ধর্মীয় বা আচর) প্রভৃতি ত্রিপুরার আদিবাসী নৃত্য জগৎকে সমৃদ্ধ করেছে — এই সমস্ত নৃত্যকলা জীবন ও জীবিকাভিত্তিক, লৌকিক সংস্কার ও ক্রিয়াকলাপ ও নৃত্যকলায় সম্পৃক্ত।

আদিবাসী নৃত্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে খ্যাতনাম্নী নৃত্য-বিশারদ শ্রীমতী গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় বলেছেন — "আদিবাসীদের নৃত্য ও সংস্কৃতির মূল্য যাচাই করতে গেলে তাদের জীবনের গুণগত মান, সামাজিক গঠন এবং মানসিক শক্তির বিষয়ে বোধগম্য হতে হবে। আদিবাসীরা জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করতে চায়। কর্মময় জীবন ও আসর বিনোদন এ দুটোকে আলাদাভাবে দেখতে তারা নারাজ। নৃত্যকলাকে জীবনের

পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যম হিসাবে তারা গণ্য করে। জীবন ও জীবিকার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল নৃত্য। আদিম যুগে নৃত্যকলা জীবন ধারণের সহায়ক বলে পরিকল্পিত হত। সে যুগে নৃত্যকলা জীবন সংগ্রাম ও উন্নতিসাধনের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সেই আদিম যুগে নৃত্য পরিবেশন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, প্রাণবন্ত এবং উৎসাহব্যঞ্জক — তাদের নৃত্যভঙ্গীমা প্রায়শই পশুপাখীর স্বাভাবিক চলনভঙ্গী থেকে অনুকৃত। রুষ্ট দেবদেবীকে সন্তুষ্ট করতে, মহামারী রোধ করতে, বৃষ্টিপাত ঘটাতে অথবা শিকার ধরার প্রেরণার মুখ্য মাধ্যম হিসাবে নৃত্য পরিবেশনা অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হত। আদিবাসী নৃত্যের মুদ্রা রচিত হয় অনেক সময় পশুপাখীর চলনভঙ্গীর অনুকরণে। ত্রিপুরীদের গড়িয়া নৃত্যও মুরগীর নানান ভঙ্গীর অনুকরণে রচিত।

জুম-কৃষি ভিত্তিক আদিবাসী সংস্কৃতি ও উৎসব

পার্বত্য জাতির জুমই প্রধান জীবিকা। পর্বতবাসী মানবের জুমই একমাত্র সহজতর জীবিকা। জুম প্রথা বন্ধুর পর্বতগাত্রে বেঁচে থাকার প্রকৃতির অবদান। সবুজ বনানীর পরিবেশে জুমকে কেন্দ্র করে পর্বতবাসী সমাজ মানুষদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। জুমের সঙ্গে জুমিয়াদের প্রাণের গভীর যোগ। পৌষালী হিমেল হাওয়া, বসন্তের পুষ্পসমারোহ, বর্ষার মাদকতা অথবা গ্রীষ্মের দাবদাহ জুমখেতকে নবনব রূপে বর্ণময় করে তোলে এবং ভাবপ্রবণ যুবক-যুবতীকে এক ভাবরাজ্যে নিয়ে যায়। শারদ পূর্ণিমার রজতশুভ্র জ্যোস্নাবিধৌত সোনালী জুমের শোভা কি মধুর ! কি স্নিগ্ধ ! কি অপূর্ব ! গৃহে গৃহে নবান্নের উৎসবে গীতি মুখর। নাচে আমোদে-আহ্লাদে, বাদ্যযন্ত্র কোলাহলে পান ভোজনে মুখরিত চঞ্চল সোনালী মুহূর্তে পূর্ণিমার চাঁদ দিগন্তে পর্বত আড়ালে ডুবে যায়। প্রভাতে দূরাগত বিহঙ্গ-কাকলিবাহী স্নিগ্ধ হাওয়া জুমে ভেসে বেড়ায়। সন্ধ্যায় পর্বতগাত্রে সন্ধ্যা নেমে আসে — পাহাড়ী ঝর্নার কলধ্বনি ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে — দূরবর্তী জুমঘরের বংশীধ্বনি ভেসে আসে — নিঃশব্দ অরণ্য মাঝারে নিশাচর পাখীর একটানা সুর। এক অভিনব নিঃসহায় ভাবরাজ্যের জন্ম দেয়।

হেমন্তের শিশির স্নাত বালসূর্য কিরণে আকাশের তারামণ্ডলের মত অসংখ্য কার্পাসের তুলা দেখা দেয়। তিল ফুলে ফুলে মৌমাছির আনাগোনা — চারিদিকে বনভূমি — তথায় জুমিয়া দম্পতি মুক্ত বিহঙ্গের মত বিচরণ করে — সে এক অনাড়ম্বর সরল জীবন — সেখানে মিথ্যা বঞ্চনা ছলনা দেনা পাওনার হিসাব নিকাশ তাদের কোমল হৃদয়কে স্পর্শ করে না। তাদের প্রাণ উদার, শান্ত সরল মধুময়। তাই কবি নবীন চন্দ্র সেন লিখেছেন ঃ

"ইচ্ছা হয় বিনিময়ে মোর এ বাঙ্গালী জীবন

মাগি নিব সেই জুমিয়া জীবন .... ।"

অপর দিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাগরিক জীবনের অশান্ত ও জটিলতাপূর্ণ জীবনকে দুঃসহ ভেবে লিখেছেন —

" দাও ফিরে সে অরণ্য"

মহামানবের সেই কাঙ্ক্ষিত অরণ্যের শান্তিময় ক্রোড়ে গড়ে উঠেছে জুমিয়া সংস্কৃতি, রূপকথা, উপকথা, ছন্দ ও গীতি। সেগুলি মুখে মুখে প্রচলিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার জীবনধারা ও জনকোলাহলের জীবন ছন্দের ঐকতান থেকে সে জীবন স্বতন্ত্র — আজো সে অনাদিকালের ফল্গুধারা সবুজ বনানীর অন্তরালে প্রবহমান। যান্ত্রিক জীবনের সমস্যা জর্জরিত জীবন যাত্রার মধ্যে সে এক কল্পনার জগৎ — তবু তার মূল্য অপরিসীম কেন না জুমিয়া জীবন আদিবাসীদের পরিপূর্ণ জীবন সংস্কৃতির জন্মভূমি। (bedrock of total way of life of the Adivasis)

উপজাতীয় সাহিত্য

উপজাতীয় সাহিত্য বলতে মূলতঃ মৌখিক সাহিত্যকে বুঝতে হবে — কেননা তাদের সাহিত্যের কোন লিখিত রূপ নেই — যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরাগত মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে তাদের এই সাহিত্য ধারা। উপজাতীয় মৌখিক সাহিত্য ভাণ্ডারে রয়েছে বিচিত্র সাহিত্য শাখা যথা পৌরাণিক কাহিনী, কিংবদন্তী, রূপকথা, ছেলে ভুলানো ছড়া, সঙ্গীত, কর্মসঙ্গীত, পার্বণ সঙ্গীত, গীতিকা, লোককথা (রূপকথা ও উপকথা লোককথারই শাখা)। একথা সর্বজন বিদিত যে সাহিত্য সমাজের দর্পণ — তাই যে সমাজে সে সাহিত্য সৃষ্টি সেই সমাজ ও সময় তার মধ্যে প্রতিফলিত হবেই — কালের বিচারে মৌখিক সাহিত্য লিখিত সাহিত্যের তুলনায় প্রাচীন। ত্রিপুরার আদিবাসী সমাজ মানুষের মৌখিক সাহিত্যের বিভিন্ন প্রশাখা আলোচনা করলে দেখা যায় নিরক্ষর আদিবাসী প্রাচীন ব্যক্তিরা যে গান, যে গীতিকা মুখে মুখে সৃষ্টি করেছেন সুর ও ছন্দের রূপ দিয়েছে সে কিংবদন্তী, রূপকথা উপকথা সৃষ্টি করে পরিবেশন করেছে তা অলিখিত মৌখিক স্তরের হলেও সমৃদ্ধ ও সৎসাহিত্যের ক্ষেত্রে ভূমি রচনা করে চলেছে —অনাদিকাল থেকে । তাই বলতে বাধা নেই উপজাতীয় মৌখিক সাহিত্যের বিবিধ শাখায় আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রচ্ছন্ন প্রাণশক্তি (potentiality) নিহিত রয়েছে। অল্প পরিসরে সে বিষয়ে বিশদ বলা সম্ভব নয় — তবু প্রসঙ্গক্রমে অল্পবিস্তর আলোকপাত করা যেতে পারে।

ত্রিপুরার নদ-নদী, দেবমন্দির, পর্বত প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে অনেক পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। গোমতী নদী ত্রিপুরার ঐতিহাসিক নদী, পবিত্র নদী — পবিত্র গঙ্গা নদীর যেমন অনেক পৌরাণিক কাহিনীর উৎস — গোমতী নদীরও অনেক কিংবদন্তী রয়েছে — পুরাকালে তীর্থমুখের সরোবরে গঙ্গাদেবীর বাহন মকর (শুঁড়বিশিষ্ট জলজন্তু) নাকি জলক্রীড়া করত গঙ্গাদেবীকে নিয়ে (আ-খায়ু-ডম্বুরু মতাই বলে ত্রিপুরী সমাজে প্রচলিত কথা রয়েছে) — একদা এক শ্বেতহস্তী নাকি গঙ্গাদেবীর রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রেম নিবেদন করেছিল — ছলনাময়ী দেবী প্রস্তাবে রাজি হয়ে শর্ত দিলেন গোমতীর স্রোতকে রুখে দাঁড়াতে পারলে তার বাসনা পুরণ হবে কিন্তু স্রোতের টানে শ্বেতহস্তীর জীবনপাত — গোমতী এবং কসমতি নামে এক কৃষকের কন্যাদ্বয়ের নাম অনুসারে গোমতী নদী ও খোয়াই নদীর নামের উৎপত্তি — জ্যেষ্ঠকন্যা গোমতীর বিয়ে হয় এক ছদ্মবেশী সর্পের সঙ্গে — গোমতীর পিতা সর্পকে গোপনে হত্যা করাতে গোমতীর অবিরাম অশ্রু বিসর্জন থেকে গোমতী নদীর উৎপন্ন। কনিষ্ঠা কন্যার বিয়ে হয় রাজার সঙ্গে । তার নাম অনুযায়ী খোয়াই নদীর উৎপত্তি — লংতরাই পর্বত নাকি এক দেবতার নাম থেকে উৎপত্তি। লংতরাই নামে উপকারী দেবতা ছিলেন তিনি বনের পশুপাখীর পালনকর্তা — মানুষের রূপ নিয়ে এক মহিলাকে বিয়ে করেন ইত্যাদি।

এ রকম অজস্র পৌরাণিক কাহিনী আদিবাসী সমাজে প্রচলিত রয়েছে। ঐগুলি লোক সাহিত্যের মূল্যবান উপকরণ।

ছেলে ভুলানো ছড়া

ছেলে ভুলানো ছড়া ইংরাজীতে Cradle song ত্রিপুরী চাকমা সমাজে সমধিক প্রচলিত। এগুলো শিশু সাহিত্যের উপকরণ। উদাহরণ স্বরূপ চাকমাদের গীতিসুষমাময় ও অর্থব্যঞ্জনাময় একটি ঘুমপাড়ানি গানের উল্লেখ করা যেতে পারে।

"কচি সোনা আমার, তোমার শরীর মিষ্টি আলুর পাতার চাইতেও নরম। বিড়ালের নখ ইক্ষুর পাতার চাইতেও ধারালো। আমার সোনামণি তার নখের আঁচড়ে তুমি আঘাত পাবে — তাতে আমি সইতে পারব না। লক্ষ্মী সোনা আমার, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো।" ত্রিপুরী সমাজে এহেন ঘুমপাড়ানি প্রচুর পরিমাণে রয়েছে।

লোকসঙ্গীত

মৌখিক সাহিত্যের অন্যান্য শাখার চাইতে লোকসঙ্গীত সমৃদ্ধ। এখানে ভাব ও বিষয়বৈচিত্র্য অপরিসীম। ত্রিপুরার সবুজ প্রকৃতি, নদী-পর্বত প্রভৃতি বর্ণময় রূপ এ সাহিত্যের জন্মদাতা — প্রকৃতির পরিবর্তনশীল রূপচ্ছবি উপজাতীয় নরনারীর গীতিভাব

প্রবণতা জন্ম দিয়েছে। উপজাতীয় লোকসঙ্গীতকে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন — কর্ম সঙ্গীত, পার্বণ সঙ্গীত, ব্যবহারিক সঙ্গীত, প্রেম সঙ্গীত, আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত। উপজাতীয় জুম-জীবনে উপরোক্ত সমস্ত সঙ্গীতই গীত হয়।

ক) ব্যবহারিক সঙ্গীত ঃ এই সঙ্গীত আনুষ্ঠানিকভাবে গীত হয়। উপজাতীয় রমণীদের মধ্যে বিবাহ উৎসবে এবং কন্যা বিদায়ের সময় এই সঙ্গীত গীত হয়।

খ) কর্ম সঙ্গীত ঃ জুমে ফসল কাটার সময় জুম বাছাই-এর সময় ক্লান্তিময় শরীরকে চাঙ্গা করার জন্য জুমিয়া নারী-পুরুষ এই গান গেয়ে থাকে ।

গ) পার্বণ সঙ্গীত ঃ পার্বণ সঙ্গীত বছরের সবসময় গীত হয় না। সামাজিক, ধর্মীয় পার্বণাদি উপলক্ষে এ গান গাওয়া হয়। ত্রিপুরীদের বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ উপলক্ষে গড়িয়া পূজো সপ্তাহ ব্যাপী পালনের সময় নৃত্যসহকারে যে গান গাওয়া হয় — তাকে পার্বণ সঙ্গীত পর্যায়ে ধরা যায় — বাংলার গাজন উৎসব — কৃষি দেবতা পুজোপলক্ষে যে গান গাওয়া হয় তাও পার্বণ সঙ্গীত। গড়িয়া পুজো যেহেতু বছরের নির্দিষ্ট সময়ে উদ্যাপিত হয় সুতরাং এটাকে পার্বণ সঙ্গীত বলা যায়।

গীতিকা

গীতিকা মৌখিক সাহিত্যের সমৃদ্ধ অংশ। উপজাতীয় সাহিত্য গীতিকা বলতে তাদের প্রেম সঙ্গীত বিরহ সঙ্গীতকেই প্রধানত বুঝতে হবে। ত্রিপুরার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নরনারীর মধ্যে প্রচলিত এই জাতীয় সঙ্গীতের সংখ্যা অজস্র। উপজাতীয় গীতিকা অতিশয় ভাবসমৃদ্ধ হৃদয়মথিত। উপজাতীয় যুবক-যুবতীর মনের আদান -প্রদানমূলক যে গীতিদ্বন্দ্ব গীত হয় তা অতীব রমণীয় এবং গভীর প্রেমরসে সম্পৃক্ত।

লোককথা

মৌখিক সাহিত্যের বৃহত্তর ক্ষেত্র দখল করে আছে লোককথা -সাহিত্য। এর ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধি সুদূর প্রসারী। রূপকথা এবং উপকথা এই দ্বিবিধ শাখা নিয়ে লোককথা। আদিবাসীদের রূপকথা ও উপকথার ভাণ্ডার অফুরন্ত। এই লোককথা ত্রিপুরীদের 'কেরেং কথমা'। ত্রিপুরী, রিয়াং, চাকমা, জমাতিয়া, গারো, হালাম প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত নরনারীর রূপকথা ও উপকথার ভাণ্ডার অফুরন্ত।

রূপকথা, উপকথা ও কিংবদন্তী

পুরাণ কাহিনী, দেবদেবীর কাহিনী, রাক্ষস-খোক্কসের গল্প, পশুপাখীর ছদ্মবেশী মানব চরিত্র অথবা মানবরূপী জন্তু জানোয়ারের মজাদার গল্প, চলনশক্তি ও বাক্‌শক্তি সম্পন্ন জড়বস্তুর কাহিনী বিন্যাস প্রভৃতি আদিবাসী সমাজে রূপকথা ও কিংবদন্তীরূপে

মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে অনাদিকাল থেকে। এই সমস্ত কাহিনী মৌখিক সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ এবং লিখিত সাহিত্যের আদিম উৎস হিসাবে আধুনিক যুগে স্বীকৃত। রূপকথা ও কিংবদন্তীর চরিত্রাবলী দেবদেবী — মানব — ইতর প্রাণী — জড়বস্তু — গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি। কাহিনীগুলিতে ধর্মের জয় — অধর্মের ক্ষয় — ন্যায়ের বিচার, দুষ্টের দমন, উদ্যোগী মানুষের সাফল্য — দুর্বল ও অসহায়ের প্রতি সমবেদনা, মানুষ ও পশুপাখীর মধ্যে মেলামেশা — বানর ও মানুষের মধ্যে বিবাহ বন্ধন প্রভৃতি অতি প্রাকৃত ঘটনাগুলি জীবন্তরূপে বর্ণিত হয়েছে। আবার কিংবদন্তী মিশ্রিত কল্প-ইতিহাস ও এ রাজ্যের প্রাচীন রাজন্য ইতিহাসের সঙ্গে রঞ্জিত হয়ে আছে — যেমন মহাভারতে বর্ণিত যযাতি রাজা চন্দ্রবংশীয় ছিলেন, তাঁর অন্যতম পুত্র দ্রুহ্যু ত্রিপুর রাজবংশের পূর্বপুরুষ — সেই সুবাদে ত্রিপুর রাজবংশ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়। তেমনি রয়েছে দেবতার কাহিনী — রাজা ত্রিলোচন শিবের বরে জন্ম — তাঁর অপর নাম 'শিবরাই' রাজা — ত্রিপুরীদের মন্ত্র উচ্চারণে শিবরাই-এর নাম প্রথমে উচ্চারিত হয়। শিবরাই রাজা ত্রিপুরার শিল্পকলার সৃষ্টিকর্তা বিধাতাপুরুষ। তেমনি রয়েছে অজগর সাপের গল্প যার সঙ্গে এক জুমিয়া কন্যার বিয়ে হয়েছিল — জামাই-সাপ শ্বশুর কর্তৃক নিহত হওয়ায় সাপপত্নীর অবিরত অশ্রুপাতের ফলে গোমতী নদীর উৎপন্ন। ছাতিম গাছের রোমাঞ্চকর এবং বিষাদভরা কাহিনী।

'রক্ত পিপাসু দেবতা' — দেবদেবীর কাহিনী — বানর বর — ধনেশ পাখীর গল্প, একটি মাছির গল্প প্রভৃতি মজাদার কাহিনী আদিবাসী লোকসাহিত্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার। এই সবের সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম — যুগযুগ ধরে মৌখিক স্তরে অস্তিত্ব রক্ষা করে এসেছে — তবে আশ্বাসের কথা এই যে বিভিন্ন গবেষকরা আদিবাসী লোকসংস্কৃতি বিভিন্ন দিক চর্চা করে সংগ্রহ করে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করছেন — লুপ্তপ্রায় লোকসাহিত্য সম্পদের উদ্ধারের কাজ কিছুটা হয়েছে-হচ্ছে।

উপজাতীয় সমাজের অলিখিত আইন ও প্রথানুগ বিধি (customary laws)

উপজাতীয় সমাজে অনেকগুলো অলিখিত আইন প্রচলিত হয়ে এসেছে সুদূর অতীতকাল থেকে। এগুলো সমাজের নিয়ম শৃঙ্খলার রক্ষাকবচ- বিশেষ। অতীতে এই আইনগুলো অত্যন্ত দৃঢ় এবং কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হত। আধুনিক সমাজের সংবিধিবদ্ধ (statutory law) আইন সমতুল। উপজাতি সমাজ ঐ অলিখিত আইনের শাসন মেনে চলতে হত — নাহলে শাস্তি পেতে হত। কিন্তু কালক্রমে আধুনিক সমাজের আইন আদালতের আওতায় এসে সেই অলিখিত আইন (customary laws)গুলো

ক্রমশঃ শিথিল এবং অকেজো হয়ে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজের নিয়মশৃঙ্খলার প্রয়োজনে এই প্রথানুগ-বিধি বা আইন অনস্বীকার্য। উপজাতীয় সমাজে আইন ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে কতিপয় প্রথানুগ বিধির প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা এখনো রয়ে গেছে। প্রচলিত কতিপয় প্রথানুগ বিধির (Customary laws) তালিকা দেওয়া হয় ঃ

১। বিবাহ বিচ্ছেদ অনুমোদন যোগ্য।

২। বিনা কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটালে স্বামীকে নগদ টাকা জরিমানা দিতে হবে।

৩। ভ্রষ্টাচার এবং লাম্পট্য দণ্ডনীয় অপরাধ।

৪। কোন মহিলা তার স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে স্পর্শ করতে পারবে না — বাক্যালাপও নিষেধ।

৫। কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর মা-বাবা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগ্নীর সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করতে পারবে না।

৬। সহোদর ও সহোদরার বিবাহ নিষিদ্ধ।

৭। মামা ভাগ্নী এবং কাকা ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ নিষিদ্ধ।

৮। বিধবা বা বিপত্নীক বা বিবাহ-বিচ্ছিন্ন নারী বা পুরুষ পুনরায় বিবাহের কোন বাধা নেই।

৯। স্ত্রীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগ্নীর সঙ্গে রসালাপ করতে কোন বাধা নেই।

১০। মৃত স্ত্রীর কনিষ্ঠ ভগ্নীর সহিত কোন ব্যক্তির বিবাহে আইনগত বাধা নেই।

১১। তার মৃত স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কোন মহিলা বিবাহ করতে বাধা নেই।

১২। কোন ব্যক্তির দুইয়ের অধিক পত্নী গ্রহণ করা নিষেধ।

১৩। কোন স্ত্রীর পক্ষে একাধিক স্বামী গ্রহণ করা নিষেধ।

১৪। সন্তানহীন দম্পতি দত্তক গ্রহণ করতে বাধা নেই।

১৫। পিতার পদবী ব্যবহারে পুত্রের অধিকার আইনসিদ্ধ।

১৬। গো-হত্যা নিষিদ্ধ।

১৭। প্রত্যেক গ্রামে বা পাড়ায় গ্রাম পরিষদ গঠন করা অপরিহার্য।

১৮। গ্রাম পরিষদের সদস্যবৃন্দ বেতনভুক্ত হবে না।

১৯। চৌর্য বৃত্তি, মিথ্যাচারিতা, অনধিকার প্রবেশ বা চর্চা এবং হামলাবাজী দণ্ডনীয় অপরাধ।

বলা বাহুল্য উপরোক্ত প্রথাগত বিধির সঙ্গে হিন্দু আইনের মিল রয়েছে — উপজাতির স্বার্থে বর্তমানে ঐ সমস্ত বিধিকে আইনের আওতায় (statutory act) আনা যায় কিনা সরকারী ও বেসরকারী মহলে চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূমিকা

পুস্তকটির প্রথম অংশে আদিবাসী সাংস্কৃতিক ভাবগত উপাদান সমূহের (subjective elements) শুধুমাত্র সংজ্ঞা ও উদাহরণ সমূহের সন্নিবেশিত করা হয়েছে মাত্র, তাও অতি সংক্ষেপে কিন্তু শুধুমাত্র উদাহরণ এবং সংজ্ঞায় সহৃদয় পাঠকবর্গের অনুসন্ধিৎসা পূরণ হয় না। ভাবগত উপাদান (subjective elements) সমূহের কিছু কিছু নিদর্শন-নমুনা উপস্থাপিত না হলে ভাবগত সংস্কৃতির ধারার সম্যক স্বরূপ ধরা পড়ে না। অনন্ত বৈচিত্র্যে ভরা আদিবাসী ভাবগত উপাদান- সঙ্গীত, লোককথা, রূপকথা, উপকথা, কিংবদন্তী, পূজা পার্বণ, আচার অনুষ্ঠান, প্রবাদ প্রবচন, ধাঁধা-লোক বিশ্বাস, লোক সংস্কার, স্বপ্নব্যাখ্যান প্রভৃতি আদিবাসী লোক সংস্কৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই সমস্ত ভাণ্ডারের কিছু কিছু নমুনা সংযোজিত করার মানসে মদীয় এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

ত্রিপুর পুরাণ কথা

জাতি উপজাতির লৌকিক ও ধর্মীয় জীবন রূপকথা ও কিংবদন্তীর মালমশলায় গড়া। নদ নদী, পর্বতমালা- গিরিশৃঙ্গকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট হয়েছে রূপকথা ও কিংবদন্তীর বিশাল জগৎ। এই কল্পজগতের বাসিন্দা দেবদেবী, দানব দানবী, রাক্ষস খোক্কস, অপদেবতা প্রভৃতি। মনুষ্যপ্রাণীর লৌকিক ও ধর্মীয় জীবনে এদের প্রভাব অপরিসীম। তাই হিন্দুধর্মের বিশ্বাসীদের কাছে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র যেমন আরাধ্য তেমনি হিমালয় পর্বত তাদের কাছে প্রণম্য — কারণ হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে এই সমস্ত নদী ও পর্বত জড়িত। এমনি অসংখ্য নদ নদী পাহাড় পর্বত ভারত বর্ষে রয়েছে যাদের সঙ্গে দেবদেবীর মহিমা জড়িত। তাই ভারতবর্ষের নদনদী পর্বতমালা ধর্মপ্রাণ নরনারীর মনোভূমিতে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র রূপে বিরাজ করছে।

বর্তমান কালের ত্রিপুরার অতীত ইতিহাস রূপকথা ও কিংবদন্তী প্রবাদ রঞ্জিত। ত্রিপুরার রাজবংশের (মাণিক্য রাজমাণিক্য) পটভূমিতে যেমন কিংবদন্তী কাহিনী প্রবহমান তেমনি রাজ্যপাট ও রাজ সিংহাসনের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে রূপকথা ও কিংবদন্তীর কাল্পনিক মায়াজাল। স্থান কাল পাত্র সমাজের ইতিহাস (history) এবং পরম্পরা (tradition) কোন সীমিত কালের গণ্ডীতে গড়ে উঠে না- শত সহস্র বছরের কল্পনা ও

বাস্তবের কথামালা একসূত্রে গ্রথিত হয়েই মনুষ্যসমাজের ইতিহাসের সঙ্গে সহাবস্থান করে চলেছে রূপকথা ও কিংবদন্তী।

ডুম্বুর পুরাণ

ত্রিপুরার প্রধান নদী গোমতীর উৎসস্থল গোলাকৃতি সরোবরের নাম ডুম্বুর। এই নামকরণের সঙ্গে দুটি লোকশ্রুতি রয়েছে। প্রথমটি কক্‌বরক শব্দজাত। কক্‌বরকভাষীরা জলপ্রপাতকে 'ডুঙ্গুর' বলে থাকে। সেই ডুঙ্গুর থেকে বাংলাভাষীদের উচ্চারণের প্রভাবে ডুম্বুর হয়ে গেছে বলে মনে করা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। দ্বিতীয়তঃ লোকশ্রুতি ও অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

পাঠকবৃন্দ যাঁরা তীর্থমুখে অতীত দিনে গিয়েছেন তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন সরোবরের ঠিক উজানে যেখানে জলপ্রপাত ধারা সরোবরে এসে মিলেছে ঠিক সেই স্রোতোধারার দু'পাশে বিশালাকার পাথর শায়িত রয়েছে। ঐ প্রস্তর খণ্ডটি নাকি মহাদেবের ডুম্বুরের মত দেখতে তাই সরোবরের নাম ডুম্বুর বলে কথিত বলে আজকের জনসাধারণের ধারণা। সরোবরটি পবিত্র রূপে তীর্থমুখ নামে অধিক পরিচিত। কেন এই ডুম্বুর সরোবরটি পবিত্র তীর্থ রূপে পরিণত হয়েছে তার পেছনে পৌরাণিক কাহিনীও প্রবহমান। লোকশ্রুতি অনুযায়ী পৌরাণিক যুগে এই সরোবরে গঙ্গাদেবীর বাহন 'মকর' মৎস্য নাকি জলক্রীড়া করতে নেমে এসেছিল - এমন একটি ত্রিপুরী ছড়ায় উল্লিখিত আছে। আ মায়ুং ডুঙ্গুর মতাই........ ইত্যাদি। (আ-মাছ, মায়ুং-হাতী; ডুঙ্গুরু মতাই — ডুঙ্গুর দেবী)। অর্থাৎ ত্রিপুরীরা মকর মৎস্যকে জলের হাতী বলে কল্পনা করেছে। তাই আজ তীর্থমুখ রাজ্যের পবিত্রতম সরোবর তীর্থক্ষেত্র। পৌষ সংক্রান্তিতে উত্তরায়ণ তিথিতে এখানে ধর্মীয় মেলা বসে প্রতি বছর। এই পবিত্র জলাশয়ে অবগাহন করে নিজেদের পবিত্র বলে মনে করে। এই সরোবরে পূর্বপুরুষের অস্থি বিসর্জনও দেয়া হয়।

শ্বেতহস্তী পুরাণ

তীর্থমুখ বা ডুম্বুর জলাধার বা সরোবরের ঠিক উজান মুখে একটা বিশালাকার পাথরের চাঁই-এর নেপথ্যে একটা রোমাঞ্চকর কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। জনশ্রুতি এই যে পুরাকালে এক শ্বেত হস্তী এই অঞ্চলে বিচরণ করত- সরোবরে ভ্রমণরতা গঙ্গাদেবীকে দেখতে পেয়ে শ্বেতহস্তীটি মুগ্ধ হয়ে দেবীর পাণিগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে। মায়াময়ী দেবী শ্বেতহস্তীর ঘৃণ্য প্রেম নিবেদনে রাগান্বিত হয়ে যান। কিন্তু ছলনাময়ী দেবী কপট-ইচ্ছা প্রকাশ করে শ্বেতহস্তীকে আশ্বাস দিয়ে বলেন- শ্বেতহস্তী যদি ভয়ংকর স্রোতস্বতীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে স্রোতের বেগ থামাতে সক্ষম হয় তা হলে তার মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

শ্বেতহস্তী আশায় বুক বেঁধে বেগবতী স্রোতস্বতীর মাঝখানে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড স্রোতের টানে তুলোর মত উড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারায়। প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে গঙ্গাদেবীর অভিশাপে শ্বেতহস্তীটির মরদেহ পাথরে পরিণত হয়। ডুম্বুর জলাশয়ের উজানমুখে শায়িত বিশালাকার পাথরটিকে সেই শ্বেতহস্তীর মরদেহের পাষাণ-রূপ বলে লোকের বিশ্বাস।

গোমতী পুরাণ

কিংবদন্তী ও প্রবাদ রঞ্জিত গোমতী নদী ভারত বিখ্যাত পুণ্যতোয়া গঙ্গানদীর মতই পবিত্র নদী। এই পুণ্যসলিলা গোমতীর নাম কি করে এল -এর উৎস কি এবং কোথায় এ নিয়ে লোকশ্রুতি ও কিংবদন্তী বর্তমান, যদিও যান্ত্রিক সভ্যতার তরঙ্গ ঢেউতে সে সমস্ত কল্প-কাহিনীর স্রোত বিলুপ্তপ্রায়। তবু এই সমস্ত লোককথা ও কিংবদন্তীর লোকসাহিত্য ও কাব্যভাবনার উপাদান উপকরণ হিসাবে এসবের মূল্য অপাংক্তেয় নয়। তাই এ সবের কাহিনী উপস্থাপিত করা হল —

সুদূর অতীতকালে ডুম্বুর জলপ্রপাতে সন্নিহিত অঞ্চলের 'কাইসকক' নামে একটি গ্রামে এক দরিদ্র জুমিয়া বাস করত। তার দু'টি কন্যা সন্তান ছিল। ওদের নাম গোমতী এবং কসমতি। পিতার নাম সার্দেংহা, মাতার নাম ডুম্বুরং।

সার্দেংহা পেশায় অচাই (পুরোহিত), মা ডুম্বুরং পেশায় ধাত্রী। সুতরাং মা বাবার পেশাগত কারণে কন্যাদ্বয়ের প্রতি যত্নবান হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সংসারের প্রতিও তাদের সে রকমে টান ছিল না— মেয়ে দুটো অর্ধাহার অনাহার এবং ছেঁড়া কাপড় দিয়ে কোন রকম লজ্জানিবারণ করত এবং জুম চাষ করে ফসল ফলাত। এমনি করে একদিন জুমে কাজ করার সময় হঠাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিল — ভয়ংকর ঝড় তুফান এবং অঝোর বৃষ্টির দাপটে দু'বোনের প্রাণ যায় যায়- এমন সময় বড় বোন দেবদেবীর কৃপা প্রার্থনা করতে লাগল- গলা চড়িয়ে বলতে লাগল যে কেউ তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করবে তাকে সে পতি-রূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। বড়বোনের কাতর মিনতি শুনতে পেয়ে সর্পরূপী 'বুড়াসা' (ত্রিপুরীদের মহাদেব সমতুল্য দেবতা মতাই কতর) দয়াপরবশ হয়ে দু'বোনের উদ্ধারের কাজে এগিয়ে এলো। আগুন জ্বালিয়ে শীতের হাত থেকে রক্ষা করল। প্রতিজ্ঞা অনুসারে বড়বোন গোমতী সেই ছদ্মবেশী সাপকে পতিরূপে বরণ করল। অতঃপর প্রত্যহ দু'বোন জুম খেতে আসতে লাগল। সর্প-স্বামীর জন্য গোমতী প্রচুর পরিমাণে খাবার নিয়ে আসত। বিশালাকার সাপ সব খাবার খেয়ে ফেলত- ফলে দু'বোনের কোন খাবার অবশিষ্ট থাকত না — পরিণাম স্বরূপ দু'বোনের স্বাস্থ্য দিন দিন শীর্ণ হতে লাগল। পিতা সার্দেংহা একদিন ছোট মেয়ে কসমতিকে

গোপনে জিজ্ঞেস করে সব ঘটনা জানতে পেরে একদিন সর্পজামাইকে গোমতীর অজান্তে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে বধ করে ফেলে। নিহত সর্পকে টুকরো টুকরো করে খুমপুইবনাকীর্ণ* জলাভূমিতে পুঁতে দিয়ে আসে।

ঘটনার পূর্বাপর গোচরে আসার পর গোমতী সেই অকুস্থলে গিয়ে সর্পস্বামীর খণ্ডিত অংশগুলিকে কোলে নিয়ে অনবরত অশ্রু বিসর্জন করতে থাকে।

গোমতীর অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে সমগ্র এলাকা প্লাবিত করে দেয়— গোমতীর অশ্রু জলরাশি গোমতী নদীর রূপ নিয়ে চির প্রবহমান স্রোতস্বতী হয়ে রইলো— সেই খরস্রোতা নদীর গর্ভে গোমতী তার সর্পস্বামীর দেহাবশেষ নিয়ে নিমজ্জিত হয়ে যায়। সার্দেংহা অচাই-এর জ্যেষ্ঠ কন্যা গোমতীর বিয়োগান্ত কাহিনী আজো আদিবাসী প্রাচীন-প্রাচীনাদের মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। গোমতীর নদীর এই কিংবদন্তী কাহিনীকে কেন্দ্র করে অসংখ্য গান ও গীতিকা রচিত হয়েছে। প্রাচীনকালে তা বংশপরম্পরায় মুখে মুখে উচ্চারিত হত! কিন্তু সংগ্রহ এবং অনুসন্ধানের লোকের অভাবে মূল্যবান বস্তু নিয়ে হারাতে বসেছে।

কসমতি পুরাণ (খোয়াই নদী)

বড় বোন গোমতীর সর্বনাশা পরিণাম প্রত্যক্ষ করে ছোটবোন কসমতি মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত। বড় বোনকে হারিয়ে কসমতি শোকসাগরে নিমজ্জিত- ছোটবোনের দুঃখে গোমতীর বিদেহী আত্মা স্থির থাকতে না পেরে দৈববাণী করতে লাগল— অনতিবিলম্বে এক রাজা সৈন্য সামন্ত নিয়ে সেই স্থান দিয়ে রওনা হলো - কসমতির রূপে মুগ্ধ রাজা তাকে রাজবাড়ীতে নিয়ে রাণীর মর্যাদা দিয়ে দিল। অন্যান্য রানীরা ছোট রানী কসমতির প্রতি ঈর্ষান্বিত হতে লাগল- কসমতির জীবনকে দুর্বিষহ করার মতলব তাদের মাথায় চাড়া দিয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে ছোটরাণী কসমতি সন্তানবতী হল। বড় রানীরা চক্রান্ত করে ছোট রানীর প্রসূতিস্থান নির্বাচন করল এক নদীর তীরবর্তী স্থানকে। কসমতি একে একে সাতটি সন্তান জন্ম দিল। কুচক্রী রাণীরা প্রত্যেকবার একটি করে কাঠের পুতুল নিয়ে রাজাকে দেখাতে লাগল। অপরদিকে সদ্যোজাত সন্তানগুলি জলে ফেলে দিতে লাগল।

কাঠের পুতুল জন্মদাত্রী কসমতির প্রতি রাজা বিরক্ত ও বিরূপ হয়ে বনবাসে পাঠিয়ে দিল। কসমতিকে জব্দ করতে পেরে বড় রানীরা খুশীতে ডগমগ।

অপরদিকে যে সন্তানদের জলে ফেলে দেয়া হয়েছিল তারা কসমতির বড় বোন

* খুম্পুই— একরকম দোলনচাঁপা

গোমতীর মাতৃস্নেহে লালিত হয়ে বড় হতে লাগল। একদা রাজপুত্ররা রাজবাড়ীতে সব ঘটনা প্রকাশ করলে রাজা জানতে পারল দুষ্টা রাণীদের বদমতলবে নির্দোষ নিষ্পাপ কসমতির ভাগ্যে এহেন দুর্গতি নেমে এসেছিল। রাজা তৎক্ষণাৎ কুচক্রী রানীদের বধ্যভূমিতে পাঠিয়ে দিয়ে কসমতিকে বনবাস থেকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে রানীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করল। এভাবে সাত সন্তান ও রানী কসমতি সুখে শান্তিতে প্রজা পালন করতঃ দীর্ঘদিন দীর্ঘযুগ রাজত্ব করতে লাগল।

লংথরাই পুরাণ

লংথরাই পাহাড় (এই পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ার নাম ফেংপুই-উচ্চতা ১৫৮১ ফুট) ত্রিপুরার সাতটি পাহাড়শ্রেণীর অন্যতম। উত্তর ত্রিপুরায় এই পাহাড় অবস্থিত। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে এটি লম্বালম্বিভাবে শায়িত। লোককথা অনুযায়ী লংথরাই নামক বনদেবতার নামে এই পাহাড়ের নাম এসেছে। লংথরাই পাহাড় শ্রেণীর সমগ্র অঞ্চল জুড়ে লংথরাই দেবতার রাজত্ব ছিল। সমস্ত পশুপাখীর পরিত্রাতা বলে লংথরাই দেবতা সুবিদিত। একাই সে এই অঞ্চলের অধীশ্বর। লংথরাই খুব খেয়ালী দেবতা- নানা রূপ গ্রহণ করত- মানুষের রূপও নিত- তবে খুব দয়ালু। পশুপাখী, মনুষ্য, প্রাণী সকলের রক্ষক ছিল এই দেবতা।

সুতরাং প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং হিংস্র বন্যপ্রাণীর হাত থেকে রক্ষা পেতে লংথরাই দেবতাকে পূজা করতে হবে। জুমিয়াদের কাছে তাই লংথরাই দেবতা গৃহদেবতা বলে পরিগণিত এবং পূজিত। লংথরাই দেবতার আশীর্বাদ লাভ করলে কোন জুমিয়া সুফসল থেকে বঞ্চিত হয় না।

লংথরাই দেবতার সমসাময়িককালে বুড়াসা দেবতার পত্নী হাচুকমা দেবী খেয়ালবশে এক রিয়াং রমণীর কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করে। কন্যাটির নাম শঙ্খতাড়িণী। শঙ্খতাড়িণী রূপে গুণে অতুলনীয়া হয়ে যৌবনে পা দিবার সঙ্গে সঙ্গে লংথরাই রিয়াং যুবকের ছদ্মবেশে রিয়াং দম্পতির গ্রামে হাজির হয়। লংথরাই ও শঙ্খতাড়িণী পরস্পর পরস্পরকে ভালবেসে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলো। অতঃপর এক বছর শঙ্খতাড়িণীর মা-বাবার বাড়ীতে কাটিয়ে নিজ বাড়ীতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। জামাই যাত্রার প্রাক্কালে রিয়াং দম্পতি অনেক সঙ্গী সাথী পাঠিয়ে যাত্রা করলো— কিছুক্ষণ যাবার পর দেবদেবী দম্পতি এমন দ্রুতবেগে পা বাড়িয়ে দিতে লাগল কারো পক্ষে পাল্লা দেবার সাধ্য ছিল না। দেখতে দেখতে সবার চোখের সামনে লংথরাই ও শঙ্খতাড়িণী অদৃশ্য হয়ে গেল। তা প্রত্যক্ষ করে সবাই বুঝতে পারল ঐ দম্পতি দেবতা না হয়ে পারে না। বছর দুয়েক ব্যবধানে লংথরাই পুনরায় স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরালয়ে হাজির হল। শঙ্খতাড়িণীর বাবা উভয়কে সাদরে অভ্যর্থনা জানালো। কিন্তু এ যাত্রায় লংথরাই অদৃশ্য হয়েই শ্বশুরবাড়ীর ভিতরে না ঢুকে

বাড়ীর উঠোনে বসে পানভোজনাদি সেরে ফেলল।

শ্বশুরালয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর দেবদম্পতি পুনরায় নিজ-বাড়ীতে রওনা হয়ে যায়। কয়েক বছর বাদে তাদের এক সন্তান জন্ম লাভ করে। সন্তানের নাম কালজীবন রাখা হয়। একমাত্র পুত্র সন্তান কালজীবনকে নিয়ে লংথরাই ও শম্বতাড়িণী পরম সুখে লংথরাই পর্বত অঞ্চলে বাস করতে লাগল। বর্তমান লংথরাই পাহাড় সেই লংথরাই দেবতা থেকে উদ্ভূত বসে জনশ্রুতি আছে। ত্রিপুরীদের ধর্ম-বিশ্বাস অনুযায়ী মতাই কতর (সর্বশক্তিমান ভগবান) ঐ বুড়াসারই অবতার। লংথরাইকে মতাই কতর অথবা বুড়ামার অবতার বলে ত্রিপুরীরা বিশ্বাস করে। লংথরাই পর্বত মতাই কতর বা বুড়াসার ছদ্মবেশী লংথরাই দেবতার বাসভূমি কল্পিত হওয়ায় এই পর্বত পবিত্র বলে প্রাচীন ব্যক্তিরা বিশ্বাস করত।

ত্রিপুরীদের পোষাক ও অলংকার

ত্রিপুরী নরনারীদের পোষাক সরল ও অনাড়ম্বর। এ রাজ্যের সকল আদিবাসীদের পোষাক ও সাজসজ্জা প্রায় একরূপ। তবে নকশা ও রংয়ের ব্যবহারে রকমফের রয়েছে। আদিবাসী রমণীদের নিম্ন অঙ্গের পোষাক রকমারি নকশা ও রংয়ের বাহার বেশ আকর্ষণীয়। এদের মধ্যে চাকমা, ত্রিপুরী (পুরান ও নূতন) রমণীর পিনন এবং রিকনাই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনীয়া ও সাব্রুম বিভাগে বসবাসকারী নূতন ত্রিপুরী ও চাকমাদের পাছড়া এবং বক্ষ আবরণী বস্ত্র বয়নে নকশা ও রংয়ের প্রয়োগ উন্নতমানের শিল্পের পরিচয় দেয়। ত্রিপুরী রমণীদের বস্ত্র বয়নে যে শিল্পদক্ষতা দেখা যায় সে বিষয়ে একটা পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে। ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাস গ্রন্থ 'রাজমালা'য় উল্লেখ আছে যে পৌরাণিক (mythological era) যুগের রাজা ত্রিলোচন (মহাদেবের বরে জন্মলাভ করেন বলে বর্ণিত) একদা ঘোষণা করলেন এই বলে যে তাঁর দেশের যে সমস্ত কুমারী রমণী বস্ত্র বয়নশিল্পে দক্ষতার পরিচয় দিতে সক্ষম হবে তাদের তিনি রানীর মর্যাদা দেবেন। রাজার ঘোষণা ত্রিপুরী যুবতীদের চমকপ্রদ উৎসাহে প্রদীপ্ত করে গেল। এও জানা যায় অনেক যুবতী বিচিত্র ধরনের নকশা সৃষ্টি করে রাজাকে মুগ্ধ করে তুলতে সক্ষম হয় - এবং রাজমহিষীর দুর্লভ সম্মান লাভে সক্ষম হয়। কোন ত্রিপুরী রমণী এমন একটা অপরূপ নকশা রিসায় (বক্ষ আবরণ) ফুটিয়ে তুলেছিলো যা বিচিত্র বর্ণের মাছির পাখনারই অবিকল প্রতিরূপ।

পৌরাণিক যুগের রাজা ত্রিলোচনকে শিল্পকলার জন্মদাতা বা প্রবর্তক বলা হয়। এমন কোন শিল্পের নিদর্শন নেই যা তিনি প্রবর্তন করেননি। তাঁরই প্রদর্শিত পথের অনুগামী

ত্রিপুরার অতীত দিনের শিল্পীরা বৈচিত্র্যময় শিল্প সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেছিল। তাই ত্রিপুরী রমণীদের মধ্যে সুদক্ষ শিল্পী দেখা যায়।

ত্রিপুরী রমণীরা লাল, হলুদ ও কালো রং পছন্দ করে থাকে। এই ত্রিবিধ রংয়ের সমন্বয়ে এরা 'রিসা' বয়নে অনন্ত বৈচিত্র্যের নকশা ফুটিয়ে তোলে। তাদের নিজস্ব কোমর তাঁতে (loin loom) সব রকম বস্ত্র বয়ন করা হয়। রিসা বয়নের সময় তারা উড়ন্ত প্রজাপতি বা পাখী, বহুশাখায়িত বটবৃক্ষ, আকাশে উড়ন্ত উড়োজাহাজকে সহজে রিসার নকশা হিসাবে বয়ন করে নেয়। ঐসব বর্তমান লেখকের নিজে চোখে দেখা।

ত্রিপুরীদের নিজস্ব পোষাকের নমুনা

ত্রিপুরী রমণীদের পোষাক প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত। নিম্ন অঙ্গের রিকনাই এবং উর্ধ অঙ্গের রিসা বক্ষ আবরণী। তৃতীয় পোষাক জামা বা ব্লাউজ জাতীয় পোষাক। এইগুলো তাদের ঐতিহ্যগত বা traditional dress, সবই নিজস্ব তাঁতে বোনা হয়। পুরুষদের পোষাকও তাই কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত ধুতি আকারে পরিধান করা হয় নিজস্ব তৈরী — গায়ে গেঞ্জি অথবা জামা বা শার্ট। এগুলো মিলের তৈরী। জুম চাষ করার সময় গায়ে পরার ফুলহাতা মোটা জামা ব্যবহৃত হয়। এই মোটা কাপড়ের জামা জঙ্গলকাটা এবং জুম চাষের উপযোগী। পুরুষরা পাগড়ী ব্যবহার করে থাকে তবে তা কাজের সময়।

হাটে বাজারে সভা সমিতিতে যাবার সময় তাদের পোষাকী কাপড় (ধুতি এবং জামা) রয়েছে। পায়ে জুতো তারা সাধারণতঃ ব্যবহার করে না। ত্রিপুরী রমণীদের বাহুল্যবর্জিত পোষাকেও বৈচিত্র্য এবং সূক্ষ্ম রুচিবোধের অভাব নেই। তাদের রিগনাই, রিসা, রিতুকু (ওড়না বিশেষ) এই তিন শ্রেণীর পোষাকে সজ্জিত ত্রিপুরী রমণীদের বনবালা শকুন্তলার কথা মনে করিয়ে দেবে যে কোন সৌন্দর্যরসবিদকে।

বর্তমানকালে অবশ্য ত্রিপুরীদের দেশজ পোষাকের ধারা অনেকটা রূপান্তরিত। শহুরে পোষাক আশাকে প্রভাবিত হয়ে পুরুষরা ধুতি, শার্ট, প্যান্ট নারীরা শাড়ী ব্লাউজ প্রভৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ঐতিহ্যবাহী পোষাক ও অলংকারে যে পরিবর্তন এসেছে- তা বিবর্তনের নিয়মের শাসনে হয়েছে।

পরিবর্তনের স্রোতে গা ভেসে গেলেও তাদের ঐতিহ্যগত পোষাকের গুরুত্ব কম নয়। নিম্ন প্রদত্ত পোষাকগুলির নমুনা জানান দিচ্ছে তাদের বৈচিত্র্যের পরিচয়।

রিতুকু ঃ এটি আধুনিক সমাজে ব্যবহৃত তোয়ালের দেশজ রূপ এক খণ্ড বস্ত্র। স্নানের সময় এটি ব্যবহৃত হয়।

পাকুড়ি বা পাগড়ী ঃ এটি মাথার আবরণ (cover) এবং আভরণ (dress) এ দুটোই বলা যায়। সমগ্র ভারতবাসীরা যে পাগড়ী ব্যবহার করে থাকে ত্রিপুরীদের এটিও ঐ সমতুল পোষাক। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিধান করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নকশা ও রংয়ের পাগড়ী তৈরী করা হয়। জুমচাষ, নৃত্য, বিবাহ এবং পূজা পার্বণ উপলক্ষে পরিধান করবার জন্য পাগড়ীর রকমফের রয়েছে। বিবাহের সময় ব্যবহৃত পাগড়ী হতে হবে সাদা রংয়ের।

কামচিলি ঃ মিলের তৈরী জামাকে ত্রিপুরীরা কামচিলি বলে। কামচিলি ত্রিপুরীরা নিজেরা তৈরী করে না, বাজার থেকে ক্রয় করে ব্যবহার করে। বলা বাহুল্য ত্রিপুরী রমণীদের তাঁতে তৈরী মোটা কাপড় (coarse) দিয়ে তারা যে জামা সেলাই করে তা শুধুমাত্র কাজের সময় ব্যবহৃত হয় — অন্য সময় নয়।

কুতাই ঃ নিজস্ব তৈরী মোটা সুতোর কাপড় দিয়ে তৈরী জামাকে কুতাই বলা হয়। এটা অনেকটা ফতুয়া জাতীয় ঢিলেঢালা রকমের জামা।

দুলাই ঃ এটি পুরুষদের ব্যবহৃত পশমী কাপড় বিশেষ। এটি শীতকালীন পোষাক।

রিত্রক ঃ এটি নিজস্ব তৈরী মোটা কাপড় বিছানা চাদর বিশেষ।

কামচার ঃ এটি গামছারই নামান্তর। স্নানাহারের পর্ব শেষে হাত পা মুখ মোছার জন্য এর ব্যবহার হয়।

অলংকার

ত্রিপুরী রমণীকুল অত্যন্ত অলংকারপ্রিয়। রৌপ্য ও পিতল নির্মিত নানাবিধ অলংকার এরা পরতে ভালবাসে। বিভিন্ন রকম অলংকারের অঙ্গের বিভিন্ন অংশে অর্থাৎ কানে, নাকে বাহুতে, হাতের কবজিতে, গলায় এবং গোড়ালির গাঁটে এদের অলংকার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়।

নিম্নে প্রদত্ত অলংকারসমূহ এদের অত্যন্ত প্রিয় ঃ

ওয়াখুম ঃ এটি রৌপ্য নির্মিত। গাদা ফুলের মত দেখতে। কানের লতিকে বেশ বড় আকারে ছিদ্র করে এটি পরতে হয়। ওয়াখুম-ডাটি লতির পেছনে থাকে সামনের দিকে চওড়া অংশটি সাদা ফুলের মত কানে শোভাবর্ধন করে।

তয়া ঃ এটি অত্যন্ত সুন্দর অলংকার, দেখতে হুবহু করবী ফুলের কলি বা মুকুলের মত।

এটি রৌপ্য নির্মিত। কানের উপর অংশকে ছিদ্র করে পরা হয়। তয়াকে দৃষ্টিনন্দন করার জন্য এর উপরের অংশে নাতিদীর্ঘ অতি সূক্ষ্ম শিকল জুড়ে দেওয়া হয়। শুধু তাই এর অগ্রভাগে চিড়েতন তাসের চিহ্নাকারে রূপোর পাতা জুড়ে তয়ার শোভাবর্ধন করা হয়।

খেরী/ঝুমকা ঃ ঝুমকা অলংকার পূর্ণ বিকশিত করবী ফুল সদৃশ। এটিকে ওয়াখুমের নলের ভিতর দিয়ে ঝুলিয়ে পরা হয়- এটি কানের দুল হিসাবে ত্রিপুরী রমণীদের অত্যন্ত প্রিয়।

বালি ঃ বঙ্গনারীদের অন্যতম অলংকার নাকছাবি এবং ত্রিপুরী রমণীদের বালির কোন তফাৎ নেই। এটিকে নাসারন্ধ্রে মধ্যিখানে ঝুলিয়ে পরা হয়। এটিও রৌপ্য নির্মিত।

নাকফু ঃ বঙ্গনারীদের জনপ্রিয় নাকফুলের ভাষান্তর। ত্রিপুরীরা নাকফুলকে নাকফু বলে। হয়তো ককবরক ভাষীদের উচ্চারণে নাকফুলের 'ল' অক্ষরটি লোপ পেয়ে গেছে। নাকফু দু'রকম। কলি এবং নাকফু। প্রথমটি ক্ষুদ্রাকৃতি এবং নকশা বিহীন — দ্বিতীয়টি আকারে বড় এবং বিচিত্র নকশায় মণ্ডিত। দুটি নাকের গোড়ার ডান দিকে ছিদ্র করে পরা হয়।

বাজুবন ঃ এটি বাহুতে পরা আকারে বড় এবং খুব চওড়া। এটিও রৌপ্য নির্মিত।

মাথিয়া ঃ বঙ্গনারীদের চুড়ি বালা এবং শাখা জাতীয় অলংকারই ত্রিপুরী রমণীদের মাথিয়া। এটি হাতের কব্জিতে পরা হয়, এটি রৌপ্য নির্মিত।

গলার অলংকার ঃ ত্রিপুরী রমণীদের প্রসিদ্ধ এবং জনপ্রিয় অলংকার রাংবাতাং অর্থাৎ টাকার মালা। রূপোর টাকায় বলয়াকার হাতল বা আংটা ঝালাই করে লাগানো হয়। প্রতিটি টাকার আংটার ছিদ্র পথ দিয়ে সূতো পরিয়ে মালা গাঁথা হয়। ত্রিপুরী রমণী ছাড়াও রিয়াং বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের মহিলারাও টাকার মালা পরিধান করে। সাধারণ গরীব ঘরের মেয়েরা রাংবাতাং ব্যবহার করতে সমর্থ হয় না — কেননা মালার জন্য অনেক রূপোর টাকার প্রয়োজন হয়। সুন্দরী ত্রিপুরী রমণীদের বক্ষপ্রদেশ শোভিত রাংবাতাং তাদের সঙ্গতির এবং আভিজাত্যের প্রতীক।

খুমবাতাং ঃ ত্রিপুরী রমণীদের সৌন্দর্যপ্রিয়তা সুবিদিত। তাদের পুষ্পপ্রীতি সৌন্দর্যজ্ঞানের পরিচায়ক। নানারকম নাম না জানা ফুলের গুচ্ছ সাজিয়ে থরে থরে মালা গাঁথা তাদের স্বভাবজাত। ত্রিপুরী রমণীদের পুষ্পপ্রীতি থেকেই তাদের পুষ্পশিল্পের জন্ম। পুষ্পশিল্প

ত্রিপুরী রমণীদের অপূর্ব সৃষ্টি। এই শিল্প গিরিকুঞ্জবাসী ত্রিপুরী রমণীকুল থেকে শুরু করে রাজবাড়ীর রাজ-অন্তঃপুরবাসিনীদের মধ্যে চর্চা হতো। ত্রিপুরার বরপুত্র কর্নেল মহিমচন্দ্র ঠাকুরের বাড়ীতে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আতিথ্য গ্রহণের সময় কর্নেল পত্নী রচিত পুষ্পমালাসজ্জিত শয্যা (কবিগুরুর জন্য) দেখে গুরুদেব চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিলেন। কুসুমশয্যার সৌন্দর্যকে উপভোগ করলেও তিনি সেই শয্যায় নিদ্রাগমন করেননি। পাশে অন্য একটি শয্যায় নিদ্রাগমন করেছিলেন। শুধু তাই নয় ত্রিপুরী রমণীদের অপূর্ব পুষ্প শিল্প দেখে এই শিল্পকে শান্তিনিকেতনে চালু করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সুহৃদ কর্নেল সাহেব গুরুদেবকে শিল্প-শিক্ষক যোগাড় করে দিতে সক্ষম হননি।

অন্যান্য অলংকারসমূহের মধ্যে গলার হার, চন্দ্রহার, আন্‌চলাই, শিকল, হাসলি এবং কানথি। ত্রিপুরী রমণীরা কোমরে একরকম রৌপ্য নির্মিত শিকলও পরে থাকে।

য়াসিতাম ঃ ত্রিপুরী ভাষায় য়াসিতাম হচ্ছে আংটি। সোনার পরিবর্তে রূপোর আংটিই এদের অতি প্রিয়। পুরোনো দিনের রূপোর সিকি টাকার তৈরী এই আংটি। বহুদামী সোনার আংটি ক্রয় ক্ষমতার অভাবেই আদিকাল থেকে রৌপ্য নির্মিত আংটির প্রচলন হয়েছে একথা বলাই বাহুল্য।

বেংকি এবং খারো ঃ দুটো অলংকারই পায়ের গোছায় পরা হয় — কারুকার্য খচিত রূপোর অলংকার বড়সড় মাপের চন্দ্রাকৃতি এই অলংকারের গলা বা মুখ খুব সরু। দুটো মুখই মোচাকৃতি।

ছুরুং ঃ এটি চুলের কাঁটা বিশেষ, সাধারণত জন্তুজানোয়ারের হাড় দিয়ে তৈরী। ক্ষুদ্রাকৃতি, একদিকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ- অগ্রভাগটি স্থূল ও নলাকৃতি- অগ্রভাগটিকে নানারকম নকশা খচিত। প্রেমিকার উপহার সামগ্রী হিসাবে প্রেমিকের ছুরুং অত্যন্ত মূল্যবান। প্রেম নিবেদন করার ছুরুং যথাযথ মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত।

সাঙ্গা ঃ এটি দ্বিশিখ কাঁটা বিশিষ্ট চুলের কাঁটা (two-pronged hair pin)। এটি সাধারণত টিন ধাতু নির্মিত। বেশ বিন্যাসের অপরিহার্য অলংকার। বিশেষ গোলাকৃতি খোঁপাকে পরিপাটি এবং সুডৌল রাখার জন্য সাঙ্গাটি খোঁপার উপর থেকে নীচ পর্যন্ত শক্ত করে গেঁথে দেওয়া হয়। একটি বার ইঞ্চি পরিমাপের লম্বা একটি টিন ধাতু শলাকাকে দু'ভাঁজ করে সমান সমান দ্বিশিখ কাঁটাবিশিষ্ট সাঙ্গার গোড়াটি বলয়াকার - ঐ বলয়াকার মাথায় গোলাকৃতি তামা বা রূপালি ধাতুর পাত থরে থরে গেঁথে দেওয়া হয়। এতে সাঙ্গার শোভাবর্ধন করে তোলে।

ত্রিপুরী লোকসংস্কৃতি

ত্রিপুরী সমাজে আচরিত গড়িয়া পূজা

বাঙালি হিন্দু সমাজের ধর্মীয় জীবনে আচরিত পূজাপার্বণের মতোই ত্রিপুরী সমাজের ধর্মীয় জীবনে বিবিধ পূজা পার্বণ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বাংলার সর্বজনীন 'দুর্গোৎসব', 'চড়ক পূজা', উত্তর ভারতের 'দশেরা', আসামের 'বিহু', পশ্চিম ভারতের 'সমুদ্র পূজা', দক্ষিণ ভারতের (কেরল) শ্রাবণ পূর্ণিমা উপলক্ষে 'ওনম' নামক প্রসিদ্ধ নবান্ন উৎসবের সমতুল এবং বাঙলার নববর্ষে অনুষ্ঠিত গড়িয়া পূজা ত্রিপুরার অধিকাংশ উপজাতিদের পালিত এক মহান ও ঐতিহ্যমণ্ডিত সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব। গড়িয়া পূজা ত্রিপুরী ছাড়াও জমাতিয়া, রিয়াং প্রভৃতি হিন্দু-ধর্মাবলম্বী উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত আছে। পূজার আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও, পূজার উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। গড়িয়া দেবতা সকলের পরম আরাধ্য দেবতা। পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি, শান্তি, ভোগ-বিলাসের জন্য তাঁর আশীর্বাদ একান্ত প্রার্থনীয়। তাই নববর্ষ-সূচনা লগ্নে পূজারীবৃন্দ গড়িয়া দেবতার পূজা-আরাধনাকে কেন্দ্র করে নৃত্যগীত মুখরিত আনন্দময় জগৎ-সংসারের ঠিকানা খুঁজে পায়।

গড়িয়া দেবতাকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শিবঠাকুর অথবা গণেশের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখানে তোলা থাক। তর্কের কিনারায় না গিয়ে শুধু বলব যে, ত্রিপুরী সমাজে পূজিত গড়িয়া দেবতা শিব বা গণেশ ঠাকুরের প্রতিরূপ বলে কল্পনা করার কোনো হেতু আছে বলে আমরা মনে করছিনে। কেননা সকল সমাজের মধ্যে নিজস্ব দেব-দেবীর কল্পনা, ধ্যান-ধারণা, ধর্ম, ভাবনা ও বিশ্বাস স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলে।

'চৈত্র-সংক্রান্তিকে ত্রিপুরী ভাষায়, 'বিষু' এবং আগের দিনটিকে 'হারিবিষু' বলা হয়। 'বিষু' উৎসব ত্রিপুরী সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্বণ। এই দিনে সামাজিক মেলামেশার একটি মাহেন্দ্রক্ষণ। 'বিষুর' দিনে ত্রিপুরী সমাজের অনেকেই পানাহার, উৎসব-অনুষ্ঠান ও হৃদয়ের আদান-প্রদান করে। 'হারিবিষুর' দিনে সবাই খুব ভোরে স্নান সেরে নূতন কাপড় পরিধান করে রকমারি বনজ ফুল সংগ্রহ করে। সে ফুল দিয়ে মালা তৈরি করে। এই মালা গরু-মহিষের গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়। গরু-মহিষের পায়ের কাছে ধূপধুনা দেওয়া হয়। 'হারিবিষু' উপলক্ষে হালচাষ এবং অন্যান্য কাজকর্ম বন্ধ থাকে। এই দিনে পুরুষরা বন থেকে নানা জাতের গাছের শিকড়, লতাপাতা ও ফল সংগ্রহ করে — অপরদিকে স্ত্রীলোকেরা রকমারি শাকসবজি সংগ্রহ করে রান্না করে।

গড়িয়া পূজার সূচনা

হারিবিষুর দিনেই গড়িয়া পূজার ঘট বসানো হয়। জমাতিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে পূজার প্রস্তুতি আরও আগে শুরু হয়। পূজার দিনে গৃহস্বামী প্রভাতী লগ্নে পবিত্র বস্ত্র পরিধান করে বন থেকে গোটা বাঁশ কেটে এনে অচাই-এর নির্দেশ মতো উঠোনের পূর্ব বা দক্ষিণ দিকে পুঁতে দেয়। বাঁশটি কিশোর হতে হবে। মনে রাখতে হবে, গড়িয়া দেবতার প্রতীক হিসাবে সাধারণত মুলি বাঁশকে নির্বাচিত করা হয়। গড়িয়াদেবের প্রতীকী বাঁশের দৈর্ঘ্য চার থেকে পাঁচ হাতের বেশি হয় না। প্রতীকী বাঁশকে বেজোড় গাঁট সমেত ফুল দিয়ে সাজানো হয়। প্রতীক-বাঁশের নিচের দিকটার পাঁচ কি সাত গাঁটের পাতা ছেঁটে ফেলা হয়। ওপরের অংশের পাতা রেখে অচাই বাঁশটিকে 'রিকনা' করেন। অর্থাৎ প্রতীক বাঁশের গায়ে দা দিয়ে সমান্তরাল রেখা এঁকে দেন। তারপর বাঁশের সবুজ রং দা দিয়ে সর্পিল রেখাকারে উঠিয়ে নেয়া হয়। যে অংশে পাতা রাখা হয়, সে অংশ বাদে নিচের অংশে আন্‌কোরা সুতোয় ফুল ও তুলো গেঁথে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। নূতন পবিত্র রিসা প্রতীকে জড়িয়ে দেওয়া হয়, মালায় গাঁথা ফুল ও তুলোর সংখ্যাও বেজোড় হতে হবে। যেমন ৫টি ফুল, ৫টি তুলো অথবা ৭টি ফুল এবং ৭টি তুলো।

সূতো, রিসা, চাল, মদ ইত্যাদি পূজোর সামগ্রী অনূঢ়া মেয়েদের হাতে তৈরি না হলে পূজোয় লাগে না। গড়িয়া প্রতীক উঠোনের নিভৃত কোণে বসাতে হয়। কেননা প্রতীকের ছায়া মাড়ানো নিষিদ্ধ। প্রতীক বাঁশের গোড়ায় কয়েকটি বাঁশের কঞ্চিও পুঁতে রাখার বিধি আছে। পূজার বেদীতে কলাপাতায় রকমারী ফুল ছড়ানো হয়। বিন্নিধানের খৈ ভেজে পাতার ওপর রাখা হয়। ধূপধূনা সহকারে মোরগ ও ডিম গড়িয়া দেবের নামে উৎসর্গ করা হয়।

অচাই পুরোহিত এবং সহকারী

পূজার কাজ সম্পাদন করার জন্য অচাই তাঁর সহকারীকে কাছে রাখেন। খুব শুদ্ধাচারে অচাই ও সহকারীকে পূজার কাজ সমাধা করতে হয়। নিরামিষ ভোজন ও কঠোর ইন্দ্রিয় সংযম না করে পূজা করলে গড়িয়ার পূজা সার্থক হতে পারে না বলে ত্রিপুরীদের বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে।

অচাই ও বারুয়াকে আহ্বান

প্রথানুসারে পূজার আগের দিন থেকেই গৃহস্বামীর পক্ষ থেকে অচাই ও বারুয়াকে আহ্বান করতে হয়। এই রীতিকে ত্রিপুরী ভাষায় 'অচাই বাতিমানি' অর্থাৎ পূজার জন্য পুরোহিত আহ্বান নামে অভিহিত করা হয়। সাধারণত গৃহস্বামীকে রাত্রের খাবারের

আগে অচাই, বারুয়া এবং জগাল্যা (উলুধ্বনিকারী) বলে আসতে হয়। আহ্বান করার আগে গৃহস্বামী অচাই-এর জন্য এক বোতল মদ, বারুয়ার জন্য আধ বোতল মদ এবং জগাল্যার জন্য পান-সুপারি নিয়ে যাবার রীতি আছে। এই আহ্বান গানের মাধ্যমে করতে হয়।

গড়িয়া পূজা ও ফলাফল

আগেই বলা হয়েছে, পূজার কাজে আগাগোড়া সাহায্য করেন বারুয়া। তাই পূজার দিন উভয়কেই স্নান সেরে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে শুচি হয়ে পূজায় বসতে হয়। গড়িয়া পূজার প্রাক্কালে 'রন্ধক' ও 'নকছুমতাই' এই দুই গৃহ দেবতার পূজা সেরে নিতে হয়। খুব ভোরে 'রন্ধক' পূজা করতে হয় — রন্ধক পূজার পরেই নকছুমতাই পূজা করা হয়। সকাল ছটার আগেই এই দ্বিবিধ পূজার পরেই নকছুমতাই পূজা করা হয়। সকাল ছ'টার আগেই এই দ্বিবিধ পূজার কাজ সেরে ফেলতে হয়। কেননা সকাল ছ'টা নাগাদ গড়িয়া দেবতার পূজা শুরু করতে হয়। পূজা শুরু হওয়ার আগে অচাই একবার তদারকী করে যান নৈবেদ্য এবং অন্যান্য পূজার আনুষঙ্গিক সামগ্রী যথাযথভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে কিনা। এ ব্যাপারে বারুয়াই সব দায়িত্ব পালন করেন। পূজার আয়োজন সম্পূর্ণ হলে অচাই 'পাতকারনা' করেন এবং পূজা শুরু করেন। 'পাতকারনা' সম্পন্ন হলে অচাই অনেকক্ষণ মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক গড়িয়াদেবের প্রতীক বাঁশে দেবত্ব দান করেন। দেবত্বদানের পর আবার 'পাতকারনা' করেন। ফলাফল ভাল হলে মন্ত্র উচ্চারণ করে গড়িয়াদেবের বেদীতে মোরগ উৎসর্গ করা হয়। মোরগ উৎসর্গ করার সময় জগাল্যা উলুধ্বনি রব তোলে এবং গৃহস্বামী ও পরিবারের লোকজন সকলে এসে গড়িয়াদেবের উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদন করে।

বলি প্রদানের পর কয়েক ফোঁটা তাজা রক্ত, মাথা ও গলার সামান্য মাংস কেটে প্রতীকের পাদমূলে দিতে হয়। তাছাড়া অচাই নিজের হাতে মোরগের মলদ্বার কেটে খুব সন্তর্পণে অন্ত্র বের করে পরীক্ষা করে দেখেন। অন্ত্র অক্ষত থাকলে পূজার ফল ভাল হয় এমন ধারণা সকলেই পোষণ করে থাকে। পূজা শেষ হয়ে গেলে গৃহস্বামী (নক্ফাং) উৎসর্গীকৃত মদ ও মাংসের গুণাগুণ সহকারে পূজার ফলাফল অচাই-এর কাছ থেকে জেনে নেয়। এ ধরনের পূজার ফলাফল জিজ্ঞাসাবাদকে ত্রিপুরী ভাষায় 'ছেমাছুংগ' বলা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের আগে এক বোতল মদ ও একটি লাঙ্গি অচাইকে উপহার দিয়ে পূজার শুভাশুভ জেনে নিতে হয়। এই মদ অচাই নিজে পান না করে উপস্থিত সবাইকে বিতরণ করে দেন। তবে অচাইকে পরিপূর্ণ পাত্রে সবার আগে পান করতে হয়। মদ্য পান করতে করতে অচাই পূজায় শুভাশুভ বলতে থাকেন। পূজার ফলাফল ভাল না

হলে প্রতিকার স্বরূপ গৃহস্বামীকে উপায় বাতলে দেন।

পূজার পাট চুকে গেলে গড়িয়াদেবের প্রতীক বাঁশের ছায়া যেন কেউ না মাড়ায় সেদিকে নজর রাখতে হয়। ছায়া মাড়ালে অমঙ্গল হবার আশংকা আছে।

গড়িয়াদেবের পদস্নান ও নৃত্য

বিকেল প্রায় তিনটে থেকেই গড়িয়াদেবের পাদমূলে মুরগীর ছানা ও ডিম রেখে গড়িয়াদেবের পা ধুইয়ে দিতে হয়। ত্রিপুরী ভাষায় একে 'য়্যাংকুং ছুরুঅ' বলে। এই সময় গৃহস্বামীর কল্যাণ কামনা করা হয়। পা ধোয়ানোর পর ভক্তপ্রাণ আবালবৃদ্ধ যুবকরা প্রতীক বাঁশে জড়ানো রিসা (বক্ষ আবরণী) খুলে নিয়ে তাতে জুমের তুলো, ধান চাল ও ফুল একত্রিত অবস্থায় পুটলি করে বেঁধে বর্শার মধ্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর এই বর্শা কাঁধে নিয়ে যুবকেরা মাদলের তালে তালে নানা মুদ্রা বা ভঙ্গিমায় নাচতে শুরু করে। গড়িয়া দেবতার প্রতীককে পূজা স্থলে পুঁতে রেখে তার চারিদিকে নাচিয়েরা ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে। গড়িয়ার নৃত্যের দল যার বাড়িতে উপস্থিত হয়, গৃহস্বামী তার উঠোন জল দিয়ে ধুইয়ে পবিত্রভাবে গড়িয়া দেবতাকে আসন করে দেয়।

আশীর্বাদ দান বা বর রিমানি

নাচের পালা শেষ হয়ে গেলে গৃহস্বামী তাঁদের কাছ থেকে বর বা আশীর্বাদ চেয়ে নেন। গড়িয়া নৃত্যের দল তখন গৃহস্বামীকে বর প্রদান করেন। ত্রিপুরী ভাষায় এটাকে 'বর রিমানি' বলে। আশীর্বাদ গ্রহণ করবার সময় গৃহস্বামী একটি থালায় আনকোরা শ্বেতবস্ত্র বিছিয়ে তার ওপর দু-একটি রূপোর টাকা, ফুল ও তুলো রেখে থালা হাতে করে হাঁটু গেড়ে বসেন এবং গড়িয়া দেবতার কাছে বর প্রার্থনা করেন। তাঁর একান্ত প্রার্থনা হল, যেন আগামী বছরেও এইভাবে পূজা করে আশীর্বাদ লাভ করতে পারেন। নৃত্যের দল তখন রিসায় জড়ানো তুলো, চাল, ফুল ইত্যাদি পূজার অর্ঘ্য স্বরূপ গৃহস্বামীকে অর্পণ করেন। গৃহস্বামী এইগুলোকে সিন্দুকে রেখে দেন। নাচিয়েরা যাবার সময় গৃহস্বামীর সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করে চলে যান। যাবার আগে 'মদ ও বুতুক' খেতে দেওয়া হয়। তা ছাড়া ডিম, শুকনো মাছ ও মাংস তাদের দেওয়া হয়।

বিসর্জন

পাড়া পরিক্রমা হয়ে গেলে বিসর্জনের পালা আসে। বিসর্জন দেওয়ার আগে গড়িয়াদেবের প্রতীক এক জায়গায় জড়ো করা হয়। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে প্রতীক বাঁশকে তুলে নিয়ে বিসর্জন দেওয়া হয়। গভীর রাত্রে কাছাকাছি ছড়া বা নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়।

ত্রিপুরীদের নৃত্য

লেবাং বুমানি নৃত্য

ত্রিপুরী সমাজে পরিবেশিত অন্যতম জনপ্রিয় নৃত্য। এই নৃত্যের মূল উৎস জুমখেত। ধান গাছে যখন ধানের শিষ নির্গত হয় তখন অপরিপক্ক বীজধানের নরম অংশটি লেবাং নামে কীটের (বাঙলায় পঙ্গপাল জাতীয়) অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। অজস্র লেবাং পোকার আক্রমণে জুম ফসল অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় যেমনটি বঙ্গীয় কৃষককুলের হয়ে থাকে পঙ্গপালের আক্রমণে। এই নৃত্যের উৎস লেবাং বিতাড়নের তাগিদ থেকে ধরে নিলেও, একে প্রমোদ নৃত্যের শ্রেণীভুক্ত করা যায়। সুতরাং লেবাং বুমানি নৃত্যের পরিকল্পনার নেপথ্যে আমোদ-প্রমোদ ও জীবিকার প্রয়োজনের তাগিদ — এই দুই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

লেবাং যখন জুমখেতে দলবদ্ধভাবে নেমে আসে তখন এদের তাড়াবার জন্য যে কৌশল বা পদ্ধতি ত্রিপুরী নরনারীরা গ্রহণ করে থাকে এবং পোকা তাড়াবার সময় যেভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন করতে হয়— কিভাবে ছন্দাকারে দৌড়তে হয়— সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে ছুটোছুটি করতে হয়, এসবের ছন্দোবদ্ধ মুদ্রাসমষ্টির বহিরঙ্গ-রূপই লেবাং বুমানি নৃত্য। লেবাং কীটকে মেরে তাড়াবার জন্য দলবদ্ধ নৃত্যই হচ্ছে লেবাং বুমানি নৃত্য (A dance for beating or driving away the insect called Lebang.)। 'বুমানি' কক্‌বরক শব্দ, যার অর্থ তাড়ানো। ভাষান্তরে, লেবাং তাড়াবার নৃত্য। একে লেবাং ধরবার নৃত্যও বলা যায়। কেননা যারা লেবাং বিতাড়নের জন্য নৃত্য পরিবেশন করে, তারা শুধু লেবাং তাড়িয়েই ক্ষান্ত থাকে না, ফাঁকে ফাঁকে লেবাং (কক্‌বরক ভাষায় কুক্) কীটগুলি হাতের মুঠোয় আটকে রেখে নাচিয়েরা মজা করে। লেবাং নৃত্য পরিবেশিত হয় এক টুকরো আস্ত বাঁশের তৈরি শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্রের তালে তালে। লেবাং নৃত্যকারীরা দু'হাতে দুটো টুকরো বাঁশ নিয়ে নৃত্যের তালে তালে ঐক্যবাদন সৃষ্টি করতে থাকে। তালবদ্ধ জোর শব্দের আকর্ষণে লেবাং ঝাঁকে ঝাঁকে জুমখেতে নামতে থাকে। এবং তখন নৃত্যকারীদের জুমখেতের উঁচুনিচু অংশে লেবাং ধরার বা মারার ভঙ্গি করতে হয়, সেই অনুকৃত মুদ্রাই লেবাং বুমানি নৃত্য। লেবাং বুমানি নৃত্যের পরিবেশনার ক্ষেত্র মূলত জুমখেত। কিন্তু জুমচাষ ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকায় জুমিয়াদের জীবিকার ক্ষেত্রও পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। তাই লেবাং বুমানি নৃত্য আজকাল জুমখেতের পরিবর্তে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রমোদ নৃত্যরূপে পরিবেশিত হচ্ছে। তাই লেবাং বুমানি নৃত্যকে এখন প্রমোদ-নৃত্য বলে আখ্যা দেওয়া যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, পত্র-পত্রিকায় বা তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন বিভাগের প্রচার

পত্রিকায় লেবাং বুমানি নৃত্যের সময় ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। বলা হয়েছে, লেবাং নৃত্য বৈশাখ মাসে জুমখেতে ধানবীজ পোঁতার সময় পরিবেশিত হয়। এই তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃতপক্ষে আশ্বিন-কার্তিক মাসে জুম-ধানে যখন শিষ নির্গত হয় তখনই লেবাং কীট জুমখেতে নেমে আসে।

গড়িয়া নৃত্য

মানব-সমাজে আচরিত সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গনৃত্য। নৃত্যের অনুষঙ্গ সঙ্গীত। সঙ্গীত নৃত্যের প্রাণস্পন্দন। আর মানব-সমাজ নৃত্য ও সঙ্গীত ব্যতিরেকে প্রাণহীন দেহ।

আবার জীবন ও জীবিকাকে কেন্দ্র করে আচার-অনুষ্ঠান পূজা-পার্বণ ধর্মীয় আচরণ সমাজ-মানসে অঙ্গীভূত হয়ে রয়েছে কোন আদিকাল থেকে। গড়িয়া নৃত্যও এমনি একটি জীবন ও জীবিকা-কেন্দ্রিক নৃত্য। গড়িয়া নৃত্য ত্রিপুরার জনপ্রিয় লৌকিক (Popular folk dance) নৃত্য। ত্রিপুরার অধিকাংশ জনগোষ্ঠী (উপজাতীয়) গড়িয়া নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। গড়িয়া পূজাকে কেন্দ্র করেই গড়িয়া নৃত্যের উদ্ভব হয়েছে। মনে রাখতে হবে, ত্রিপুরার গড়িয়া পূজার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জুমখেতকে শস্যপূর্ণ করে তোলার জন্য গড়িয়া শস্যদেবতাকে আরাধনা করে। ত্রিপুরী ও অন্যান্য সমাজে গড়িয়া দেবতাকে সম্পদ ও সমৃদ্ধির (God of wealth and prosperity) দেবতা রূপে কল্পনা করা হয়।

কৃষিভিত্তিক বঙ্গীয় সমাজে আচরিত উৎসব-অনুষ্ঠানের দিকে তাকালে আমাদের চোখে যা প্রতিভাত হয়ে ওঠে, তা হচ্ছে গাজন, ব্রত ও বিবিধ আচার নৃত্য। ঐসব উৎসব-অনুষ্ঠান জীবন ও জীবিকাভিত্তিক— ধর্মীয় আচার-আচরণও এসে মিশেছে এই সমস্ত নৃত্য-সংস্কারে।

ত্রিপুরার সার্বজনীন লোকনৃত্য গড়িয়া নৃত্যের অনুষঙ্গ হিসাবে পাশাপাশি রয়েছে লেবাং বুমানি ও মশক নৃত্য প্রভৃতি। গাজন নৃত্যে যেমন একদিকে ধর্মীয় সংস্কার অনুসৃত অপরদিকে তেমনি রয়েছে লৌকিক সংস্কার ও ক্রিয়াকলাপ। গড়িয়া নৃত্যের মধ্যেও সেই একই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। গড়িয়া পূজাকে কেন্দ্র করেই গড়িয়া নৃত্যের উদ্ভব । সেজন্যে গড়িয়া নৃত্যে দেবভক্তির ভাবনা-রসের সঙ্গে অনুষ্ঠানগত চিত্তবিনোদনের আনন্দরসের মিশ্রণ ঘটেছে। গড়িয়া পূজাকে সামাজিক উৎসবের সংজ্ঞা দেওয়া যায় এজন্যে যে গড়িয়া উৎসব বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণের পালা চলে প্রায় এক সপ্তাহব্যাপী। ত্রিপুরী, জমাতিয়া ও রিয়াং প্রভৃতি কক্‌বরকভাষী সম্প্রদায় গড়িয়া পূজা উৎসব পালন করে থাকে— তাদের একান্ত বিশ্বাস, গড়িয়া দেবতাকে তুষ্ট করলে জুমকৃষির ফসল ভালো ফলবে। পরিবারের, সমাজের মঙ্গল হবে। তাই গড়িয়া উৎসব একদিকে যেমন

সামাজিক, অপরদিকে ধর্মীয় বা পূজা পার্বণের। তাই গড়িয়া নৃত্যে ধর্মীয় আচারগত মিশ্রণ ঘটেছে। কিন্তু গড়িয়া নৃত্যের বিভিন্ন মুদ্রার ভঙ্গি প্রত্যক্ষ করলে ধর্ম ও আচার নিরপেক্ষ শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম অর্থাৎ প্রমোদ নৃত্য বলে প্রতীয়মান হবে। বলা বাহুল্য, গড়িয়া নৃত্যের অনুকৃত মুদ্রা বৈচিত্র্যপূর্ণ। প্রাকৃতিক ঘটনা ও পশুপাখির নানা অঙ্গভঙ্গিকে অনুকরণ করে গড়িয়া নৃত্যের মুদ্রার সৃষ্টি। শোনা যায়, প্রাচীনকালে গড়িয়া নৃত্যের মুদ্রার সংখ্যা ২২টি ছিল। এক-একটি মুদ্রা বা ঢংয়ের জন্য এক-একটি বোল। ঢোল (ত্রিপুরী ভাষায় 'খাম') বাজিয়ে বা বোল বাজিয়ে নৃত্যের ঢং বলে দেওয়া হয়। বোলের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাচের ভঙ্গিও যায় পাল্টে। যেমন ঢোলে যখন ঘেঘেনে খেচাং চাং চাং চাং বোল অনুযায়ী নৃত্য শুরু হল — সেই নৃত্য ভঙ্গি পরিবর্তিত হয়ে গেল যখন ঢোলে বোল বেজে উঠল ঘেঘেন চাং ঘেঘেন চাং চাং চাং ঘেঘেন চাং। প্রত্যেক ঢংয়ের অর্থ রয়েছে। কোনোটা স্নানের , কোনটা কাপড় কাচার, আয়না দেখে কেশ-বিন্যাস, কোনোটা বাচ্চাটাকে খাওয়ানো হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, প্রাচীনকালে ২২টি ঢংয়ের গড়িয়া নৃত্যের মধ্যে বর্তমানে পাঁচ-ছয়টির বেশি প্রচলিত নেই। গড়িয়া নৃত্যে ঐন্দ্রজালিক (magical) অথবা রহস্যময়তার (mysticism) ভাব নেই। শুধু নৃত্যধারাকে বৈচিত্র্যময় এবং রমণীয় করার জন্য পশুপাখির বিচিত্র চলন-ভঙ্গিমার অনুকরণ করে নাচের মাধ্যমে তা ফুটিয়ে তোলা হয়।

তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, সূচনা হিসেবে যে নৃত্য পরিবেশিত হয়, তা ধর্মীয় আচার নৃত্য বা লাস মুদ্রা। লাস মুদ্রা হচ্ছে দেবতার উদ্দেশ্যে বন্দনা বা স্তুতি জানাবার নৃত্যভঙ্গিমা। বঙ্গীয় সমাজের সর্বজনীন পূজামন্ডপে পরিবেশিত আরতি নৃত্যের সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। লাস নৃত্যের যে বোল (ঢাকের) বাজানো হয় তা নিম্নরূপ ঃ

গান্ কি ঘাঘান ঘিচন্ গান
চন গান্ গান্ ঘিচন্ ঘিচন্
ঘিচন চুগান্ ঘিচন্ গান্
চন্ গান্ গান্ ঘিচন্ ঘিচন্

গড়িয়া দেবতাকে বন্দনা করার পর যে সমস্ত নৃত্য ভঙ্গিমা বা মুদ্রা পরিবেশিত হয়ে থাকে, এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ

(১) তক্‌মা মই ক্রাকমানি অর্থাৎ মুরগী কিভাবে খাবার কুড়িয়ে খায় তার অনুকরণে নৃত্য-ভঙ্গিমার পরিবেশন। এই নাচের বোল হচ্ছে ঃ

গানি গানি ঘান্ চন্ চন্
চগান্ গাগান্ চন্ চন্

(২) তক্‌মা খিতুং জাংরিমানি অর্থাৎ মুরগী-পুচ্ছ সঞ্চালন ভঙ্গিমা। প্রাকৃতিক কারণে মুরগী যেভাবে লেজ নাড়াচাড়া করে থাকে সে ভঙ্গিকে ঢাকে বোল বাজিয়ে নাচের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এ নাচের বোল এইরূপ ঃ

গানি গানি গান্ গানি চন্ চন্

ঘিগির্ ঘিচন্ ঘিচন্ চন্

(ঘাঘান্ চুগান্ চুগান্ ঘান্)

(৩) হারুংমাই কিছিলমানি — অর্থাৎ সমতল জুমখেতের বায়ুতাড়িত নুইয়ে পড়া ধান গাছের ভঙ্গিমা । জুমখেতের ধানগাছ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে বাতাসের ঝাপটায় এদিক- সেদিক আন্দোলিত হয়ে নুইয়ে পড়তে থাকে। তারই অনুকরণ করে গড়িয়া নৃত্যের অন্যতম ভঙ্গিমায় রূপ দেওয়া হয়েছে — এই নাচের বোল নিম্নরূপ ঃ

গিগির্ গির্ গিগির্ গির্

গিগির্ ঘিচন্ ঘিচন্ চন্

গাগানে ঘান্ গাগানে ঘান্

গাগানে ঘিচন্ চন্

(৪) তক্‌মা ইয়াচিং মালমানি অর্থাৎ মুরগী হাঁটার সময় পায়ের আঙ্গুলগুলি কিভাবে সঞ্চালিত হয় তারই ভঙ্গিমা। এই নৃত্যের বোল নিম্নরূপ ঃ

চন্‌কে ঘাঘান্ ঘাঘান্ ঘাঘান্

গানি চন্ চন্ চন্‌কি চুগান

চনি গানি গান্ চুগান্ ঘান্

(৫) মায়ুং ছুন্টা চানাইমানি অর্থাৎ হাতি কিভাবে খাবার খায় তার ভঙ্গিমা । হাতির খাওয়ার অনুকরণ নৃত্য-ভঙ্গিমায় ঢাকের বোল নিম্নরূপ ঃ

গানি চনে গান্ ঘিচন্ ঘিচন্ ঘিচন্

গাগান্ ঘান্ গানি চন্ চন্

চুগান্ ঘিচন্ গাগানে গান্

গানি চনি গান্ ঘিচন্।

উপরি-উক্ত গড়িয়া নৃত্যের মুদ্রাসমূহ প্রাচীনকালের বিস্তৃত নৃত্য-রীতির সংক্ষিপ্ত রূপ। জনশ্রুতি অনুযায়ী গড়িয়া দেবতা মূলত রণ বা যুদ্ধের দেবতা। তাই গড়িয়া নৃত্যের মধ্যে

যুদ্ধ-নৃত্যের নিদর্শনও বর্তমান। কিন্তু গড়িয়া নৃত্যে সুখ-সমৃদ্ধির জন্য আত্মনিবেদন প্রাধান্য লাভ করায় যুদ্ধ বা বীররসের নৃত্যের তাল ও লয় গৌণ আকার লাভ করেছে। গড়িয়া নৃত্যকে জাতীয় পর্যায়ে বা মানে উন্নীত করা একান্ত প্রয়োজন। তার জন্য ব্যাপক চর্চা ও অনুশীলন, উন্নত পোষাক ও উন্নততর মুদ্রা বা ভঙ্গির সংযোজন করার প্রয়াস চালানো দরকার। তার জন্যে ভারতীয় ক্লাসিক নৃত্যবিদদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলা একান্ত সমীচীন হবে। গড়িয়া নৃত্য ত্রিপুরার সর্বজনীন নৃত্যধারা। তাই চর্চা ও সমীক্ষার আলোকে এগিয়ে যেতে হবে। এ রাজ্যের সংস্কৃতিমনা জনগণের প্রয়াস একান্ত কাম্য।

মশক নৃত্য (ত্রিপুরী)

'মশক' শব্দটি ত্রিপুরী বা কক্‌বরক শব্দ, যার অর্থ হরিণ। আক্ষরিক অর্থ হরিণ নৃত্য হলেও, প্রকৃত অর্থ হরিণ শিকার নৃত্য। পাঠকদের মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে, হরিণ শিকারের সময় কি নৃত্য পরিবেশন করা হয়? আসলে তা নয়। শিকারীদল শিকার নিয়ে খুশি মনে বাড়ি ফেরে। অনেক দূর-দূরান্তে গিয়ে তাদের শিকার করতে হয়। শিকার নিয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে করতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে — ক্লান্তিকর একঘেয়ে পথচলাকে রমণীয় করার জন্য চিত্তবিনোদনেরও প্রয়োজন হয়। তাই শিকার বহনকারীদের চলার পথকে রমণীয় করার উদ্দেশ্যে সঙ্গী-সাথীরা গানের সঙ্গে নাচের ভঙ্গিতে পা ফেলে হাঁটতে শুরু করে। নৃত্যের তালে তালে পথচলার ভঙ্গিকেই মশক নৃত্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। আজকাল অবশ্য হরিণ শিকারও নেই সুতরাং হরিণ নিয়ে নেচে নেচে বাড়ি ফেরার দৃশ্যও চোখে পড়বে না — তবু শিকারের নাচের ভঙ্গিটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, নাচের আসরে হরিণ শিকারের স্মৃতি হিসাবে মশক নৃত্য প্রচলিত হয়ে আছে।

মাইমিতা নৃত্য (ত্রিপুরী)

বাঙলার নবান্ন উৎসবের মতো ত্রিপুরী সমাজেও নবান্ন-উৎসব পালনের প্রচলন আছে। জুম-ধানের পাকা ফসল তোলার অব্যবহিত পরেই নবান্ন উৎসবের সাড়া পড়ে যায় ত্রিপুরীদের ঘরে ঘরে। নবান্ন উৎসবকে প্রাণবন্ত করার উদ্দেশ্যেই নৃত্য পরিবেশনের রীতি প্রচলিত হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে মাইমিতা বলতে নূতন ধান বোঝায়। হিন্দু বাঙালি সমাজে পালিত নবান্ন উৎসব ও মাইমিতা উৎসব এক ও অভিন্ন। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের শেষে জুম-ধানের ফসল তোলা হয়ে যায় এবং জুমখেতে নির্মিত অস্থায়ী শস্য-ভাণ্ডারে ফসল রাখা হয়। ফসল তোলার সঙ্গে সঙ্গে নবান্ন উৎসব পালিত হয় না — শুভ দিনক্ষণ দেখে মাইমিতা উৎসব পালন করা হয়। মাইমিতা উৎসবের সময় শস্য-আধারের বেদীতে মুরগী বলি দেওয়ার প্রথা আছে। রন্ধক (শস্য-আধার) পূজার পরে আত্মীয়-পরিজন মিলে পান-ভোজন করা হয়। উৎসবকে প্রাণবন্ত ও আনন্দময় করে

তোলার উদ্দেশ্যে নরনারী মিলে নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। মাইমিতা উৎসব উপলক্ষে নৃত্যটি পরিবেশিত হয় বলে এই নৃত্যের নাম মাইমিতা।

খার্চি পূজা তথা চতুর্দশদেবতার পূজা
(পৌরাণিক নেপথ্য কাহিনী)

ত্রিপুরা সুপ্রসিদ্ধ ও ঐতিহ্যমণ্ডিত খার্চি তথা চতুর্দশ দেবতার পূজার নেপথ্য কাহিনী অতীব কৌতূহলোদ্দীপক— যেহেতু এর কাহিনী আংশিক ইতিহাস মিশ্রিত এবং আংশিক প্রবাদরঞ্জিত। তামাম দুনিয়ার তীর্থক্ষেত্র ও দেবদেবীর মন্দির-দেউলের কাহিনীসমূহ দাঁড়িয়ে আছে সার্ধ-বাস্তব সার্ধ কল্প-কাহিনীর বেদীমূলে। ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস-গ্রন্থাবলী রাজরত্নাকর ও রাজমালা এসবের সাক্ষী বহন করছে। কথিত আছে, পৌরাণিক যুগে ত্রিপুরার রাজা দৈত্যের পুত্র রাজা ত্রিপুর অত্যন্ত অত্যাচারী, প্রজাপীড়ক ও বিধর্মী ছিলেন। পুত্রের অপকর্মে বীতশ্রদ্ধ হয়ে মহারাজ দৈত্য ত্রিপুরের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে বানপ্রস্থে গমন করেন।

মহারাজা ত্রিপুর রাজ্যভার প্রাপ্ত হয়েও তার পূর্বচরিত্রের কোনো পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হননি। বরং প্রজাদের ওপর তাঁর অত্যাচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে শান্তিপ্রিয় প্রজাবর্গ অত্যাচারী রাজার কবল থেকে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্ত দেবাদিদেব মহেশ্বরের কাছে আকুল প্রার্থনা নিবেদন করতে লাগল। প্রজাবর্গের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে তাদের দুর্গতির অবসান করার মানসে মহেশ্বর নিজের হাতে অত্যাচারী রাজা ত্রিপুরকে ত্রিশূলবিদ্ধ করে হত্যা করেন। এই প্রসঙ্গ রাজমালায় পাওয়া যায়।

"মারিলেক শল অস্ত্র হৃদয় উপর।

শিবমুখ হেরি রাজা ত্যজে কলেবর।।"

রাজমালা ; ত্রিপুর খণ্ড ১১ পৃঃ

মহাদেব কর্তৃক অত্যাচারী রাজা নিহত হবার পর রাজ্যবাসী প্রজারা অরাজকতার কবলে পতিত হয়। অতঃপর বিপন্ন প্রজাবর্গ মহাদেবের শরণাপন্ন হলে তাঁরই কৃপায় পুণ্যবান রাজা ত্রিলোচনের জন্ম হয়। কথিত আছে, মহাদেবের বরে ত্রিপুরের বিধবা পত্নী রানী হীরাবতী পুত্রসন্তান গর্ভে ধারণ করেন। রাজা ত্রিলোচন মহাদেবের বরদানে রানী হীরাবতীর গর্ভের সন্তান।

বলা বাহুল্য, রাজা ত্রিলোচন কিংবদন্তী যুগের (mythological age) রাজা বলে রাজ্য মালায় বর্ণিত হয়েছেন। রাজমালা প্রণেতাগণ রাজা ত্রিলোচনকে মহাভারতের

রাজা যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক রাজা বলে বর্ণনা করেছেন।

রাজ্যমালায় এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, মহাদেবের আদেশে রাজা ত্রিলোচন চতুর্দশ দেবতার বিগ্রহ স্থাপন করেন।

এখানে সবিশেষ উল্লেখ্য যে, ত্রিপুরার মহারাজারা মঙ্গোলজাতি গোষ্ঠীভুক্ত হলেও সুদুর অতীতকাল থেকে সনাতন হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী এবং সনাতন হিন্দুধর্ম পালন করে এসেছেন— যার প্রাচীনত্ব নির্ণয় করা সুকঠিন। চতুর্দশ দেবতাবর্গের মধ্যে সকলই হিন্দু দেবদেবী। যথা ঃ

হর, উমা, হরি, মা, বাণী, কুমার, গণপা, বিধি, ক্ষ্মা, অব্ধি, গঙ্গা, শিখি, কাম ও হিমাদ্রি।

এই চতুর্দশ দেবদেবী ত্রিপুরার মাণিক্য-বংশের কুলদেবতা হিসাবে পূজিত। চতুর্দশ দেবদেবীর মুণ্ড-মূর্তি অর্চিত হয়। মুণ্ডসমূহ অষ্টধাতু নির্মিত। চতুর্দশ দেবতার প্রধান পুরোহিতের উপাধি চন্তাই। অন্য পূজারীবর্গ দেওড়াই নামে পরিচিত। কামাখ্যাদেবীর পূজারীদের উপাধি দেওড়ি। দেওড়ি ও দেওড়াই একার্থবাচক বলে অনুমান করা যায়। এই শব্দযুগল দেবল শব্দের অপভ্রংশ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

রাজমালা প্রণেতা মনে করেন চন্তাই ও দেওড়াইগণ সবাই বহিরাগত এবং সংসার ত্যাগী দণ্ডী ছিলেন। তবে পরবর্তীকালে ত্রিপুরায় দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে এবং তাঁদের উত্তরপুরুষদের সঙ্গে স্থানীয় সমাজের মানুষদের বিবাহাদি ও সামাজিক সংমিশ্রণের ফলে তাঁরা সংসারী হয়ে পড়েন— কিন্তু তাঁদের আচার-ব্যবহার ও পবিত্র জীবনযাপন প্রশ্নাতীত।

ত্রিপুরা রাজাদের শাসনকালে দেওড়াই উপাধিধারী পূজকগণ ছাড়াও গালিম বা ঘালিম প্রভৃতি কতিপয় সম্প্রদায়ের লোক পুরুষানুক্রমে দেবালয়ের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এরা সবাই রাজকারী বৃত্তিভোগী কর্মচারী বা সেবাইত ছিলেন। এদের বংশধর ছাড়া অন্য কোনো বংশের লোক চতুর্দশদেবতার পূজারী হবার অধিকার নেই। তাদের বংশ থেকেই যোগ্যতা অনুসারে পূজারীবৃন্দ নিযুক্ত হয়ে থাকেন— এবং পূজারীবৃন্দ থেকেই যোগ্যতা ও সাধুতার গুণে ক্রমশ চন্তাইপদে নিযুক্ত হন।

চতুর্দশদেবতার পূজার বৈশিষ্ট্য

আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে খার্চি পূজার সূচনা হয়। এখানে সবিশেষ উল্লেখ্য যে, খার্চি পূজা স্থানীয় ধর্মীয় উৎসব হলেও, (যেহেতু এ জাতীয় পূজা অন্য

কোথাও পালিত হয় না) এ পূজা হিন্দুদেবদেবীর পূজা— যদিও পূজা-পদ্ধতি ভিন্নতর। চতুর্দশ দেবদেবীর সকলেই আর্যগণের পূজিত দেবদেবী। দেবদেবীর বিগ্রহের পূজকগণও ত্রিপুরার পার্বত্য জাতি নয় বলে রাজমালার প্রণেতা বর্ণনা করে গেছেন। তবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচরিত ও পূজিত চতুর্দশ দেবদেবীর পূজকদের (চন্তাই ও দেওড়াই) পূজাপ্রণালী ও মন্ত্রাদি পাঠ ভিন্নতর। চন্তাইগণ যে মন্ত্র পাঠ করেন তা দুর্বোধ্য। এইসব মন্ত্রের অর্থ যুগ যুগ ধরে গোপন করে রাখা হয়েছে— কথিত আছে, পূজাপ্রণালী ও মন্ত্রাদি বিষয়ে কোনো এক মহারাজ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হলে চন্তাই বলেছিলেন— "মহারাজ, পূজা-প্রণালী ও মন্ত্রাদি অত্যন্ত গোপনীয় এবং প্রকাশযোগ্য নয়— প্রকাশ করলে ইষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে।"

জগৎখ্যাত ভাষাবিদ ডঃ সুনীতিকুমার স্বয়ং এ বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেও চন্তাইদের কাছ থেকে কোনো উত্তর পাননি। তবে চন্তাইগণ পূজা-অর্চনা বিষয়ে গোপনীয়তা রাখলেও দেবদেবীগণের মহিমা কীর্তনের বর্ণনা-পাঠে অনুধাবন করা যায়— খার্চি পূজা-মন্ত্রের সঙ্গে ধ্যানের সাযুজ্য রয়েছে।

কের পূজা

কের পূজা ত্রিপুরার অন্যতম প্রসিদ্ধ স্থানীয় পূজা। এ পূজা-অনুষ্ঠান মূলতঃ রাজপরিবার কর্তৃক পালিত হলেও, রাজবাড়ির বাইরে মফস্বলবাসী ত্রিপুরী সমাজেও এ পূজা পালিত হয়ে থাকে। এ পূজার মূল উদ্দেশ্য জনগণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করা।

খার্চি পূজার সমাপ্তির চৌদ্দদিন পর শনি কিংবা মঙ্গলবারে কের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। খার্চি পূজার সঙ্গে কের পূজার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়ে গেছে। খার্চি পূজার পুরোহিত চন্তাই কের পূজারও পুরোহিত। পূজা আরম্ভ হওয়ার আগে একটি এলাকা নির্ধারিত করা হয়। এই নির্ধারিত এলাকার ভেতরে পূজা চলাকালীন কারুর জন্ম ও মৃত্যু হলে পূজা পণ্ড হয়ে যায় এবং তা অমঙ্গলসূচক বলে ধরে নেওয়া হয়। এ জন্য পূজা আরম্ভের আগে খোঁজ-খবর নিয়ে আসন্নপ্রসবা রমণী ও মৃতপ্রায় রোগীদের সীমানার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পূজা-অর্চনাকালে মানুষ, গৃহপালিত পশু ইত্যাদি সীমানার বাইরে যাওয়া পুরোপুরি নিষিদ্ধ। পূজার সময় জামা-জুতো, খড়ম, পাগড়ি বা ছাতা ব্যবহার নিষিদ্ধ। গীতিবাদ্য, কোলাহল এমনকি জোরগলায় কথা বলাও নিষিদ্ধ। স্বয়ং মহারাজগণও এই নিয়ম পালন করতেন। পূজা অর্চনাকালে একদিন দু রাত নির্ধারিত সীমানার ভেতর লোকজনদের অবরুদ্ধ থাকতে হয়। বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজের সময় কিছু সময়ের জন্য লোকজনদের বাইরে যাবার অনুমতি দেওয়া হত তোপধ্বনি ঘোষণার মাধ্যমে। পুনর্বার

তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বাইরে অবস্থানরত সবাইকে ঘরে ফিরে আসতে হত। কের পূজা করলে রাজ্যের মঙ্গল ও দশের মঙ্গল হয় বলে লোক-বিশ্বাস বিরাজমান। কোনো কারণে পূজা ভেঙে গেলে বা বিঘ্নিত হলে পুনর্বার সপ্তাহের মধ্যে শনিবার অথবা মঙ্গলবারে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে পূজা সম্পাদন করতে হয়। রাজধানীর কের পূজার পাট সম্পন্ন হবার পর পার্বত্য পল্লীতে পূর্বোক্ত নিয়মে কের পূজা পালিত হয়। তৎকালে বাইরের লোকজন পল্লীতে প্রবেশ নিষিদ্ধ। কের পূজার প্রধান উদ্দেশ্য বছরে একবার সকলকে নবসৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। সারা বছরের সঞ্চিত পাপকার্যাদি ঝেড়ে ফেলে সকলকে পবিত্র করে নবজীবনের মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সংসার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হবে একথাটি জানান দেবার জন্যই কের পূজার আয়োজন। ধর্মাচরণের সঙ্গে তাত্ত্বিক-উপদেশের এহেন আদর্শ প্রচার অন্যত্র বিরল। কের পূজা বর্তমানে আগের মতো জাঁকজমক সহকারে পালিত হয় না — শুধু নিয়ম রক্ষার জন্য রাজবাড়ির চত্বরে কের পূজা পালিত হয় — কের পূজা উপলক্ষে রাজ্য সরকারের সকল অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ বন্ধ থাকে।

সপ্তাহকালব্যাপী পূজা-অনুষ্ঠান

খার্চি শব্দের সম্ভাব্য অর্থ

খার্চি পূজা পালন করতে হয় অত্যন্ত পবিত্রতা ও শুচিতার সঙ্গে। এ পূজার একদিন আগে ভোরবেলায় হাওড়া নদীতে দেবদেবীর বিগ্রহকে স্নান করানো হয়।

খার্চি শব্দের প্রকৃত অর্থ এখনো জানা যায়নি। শব্দটি ত্রিপুরী ভাষা অর্থাৎ কক্‌বরক থেকে উদ্ভূত কিনা, নিশ্চিত করে বলা যায় না। খার্চি যদি কক্‌বরক্ শব্দজাত না হয় তাহলে ক্ষ্মা (পৃথিবী) এবং অর্চি (দীপ্তি বা শিখা) এই শব্দযুগল থেকে খার্চি শব্দের উৎপত্তি বলে অনুমান করা চলে। খার্চি শব্দ পৃথিবী ও দীপ্তি এ দুই-এর সমাহারে সৃষ্টি হয়ে চতুর্দশ দেবদেবীদের পৃথিবী ও দীপ্তির প্রতীক স্বরূপ একটি মাত্র শব্দ খার্চি রূপে অভিহিত হয়েছে — এরকম ব্যাখ্যা দিলে পাঠকবর্গের কাছে গ্রহণযোগ্য না হলেও তাদের অনুসন্ধিৎসু মনকে চাঙ্গা করে তুলবে এ বিষয়ে লেখক সুনিশ্চিত।

সপ্তাহব্যাপী খার্চি পূজার সময় চতুর্দশ দেবতার মন্দির-সংলগ্ন পুরাতন রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে ধর্মীয় ও সামাজিক মেলা বসে। পূজার সাতদিন সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত অগণিত ভক্তবৃন্দের সমাবেশ পূজার প্রাঙ্গণকে আনন্দমুখর ও ধর্মীয় বাতাবরণে পরিপূর্ণ করে তোলে। পুরাকালে মোষবলি ছাগবলি এমনকি মনুষ্য বলির প্রথা ছিল বলে শোনা যায়। বর্তমানে শুধুমাত্র ছাগবলি, পায়রাবলি ও মুরগীবলির প্রথা প্রচলিত আছে। এখানে

উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র পূজার সাতদিন সকল দেবতার বিগ্রহ বাইরে এনে একটা প্রশস্ত জায়গায় স্থাপন করে পূজা করা হয়। সারা বছর মন্দিরের প্রকোষ্ঠে রাখা হয়।

একদা রাজ-পরিবারের কুল-দেবতা হিসাবে শুধুমাত্র রাজ-পরিবারে এই পূজা অনুষ্ঠান সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে চতুর্দশ দেবতা সর্বজনীন পূজা— এ পূজা শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় — এ পূজা সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় সংহতির প্রতীকরূপে ত্রিপুরার জনগণের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব রূপে সারাদেশে সমাদৃত।

ত্রিপুরীদের রূপকথা ও কিংবদন্তী

এক ফালি লাউয়ের গল্প

ওরা দু'বোন। দু'বোনেরই বিয়ে হয়েছে। ছোটবোনের অনেক টাকা পয়সা, সোনাদানা। বড়বোন খুবই গরীব। এবাড়ী ওবাড়ী ভিক্ষে করে খায়। তার কথা বলতে গেলে ঠিক এভাবে বলতে হয়—

দুঃখীজনের দুখের কথা কোথায় বলি ভাই।
চোখের জলে বান ডেকে যায় বলতে যদি চাই।।

একদিন বড়বোন ছোটবোনের বাড়ীতে বেড়াতে এসেছে। ছোটবোনের কাছে যদি কিছু সাহায্য পাওয়া যায় এই আশা নিয়ে। ছোটবোন দিলেও বটে। একফালি লাউ দিয়ে একবেলা চলতে পারে মত চাল। তার বেশী নয়। অঢেল টাকা পয়সা থাকলে কি হবে, ছোটবোনের মনটা ছিল ভারী খারাপ। বড়বোনকে অমনিতেই দিয়ে দেবে একবেলার চাল ! না, তা হবে না। ওকে দিয়ে চালের বদলে যা হোক একটা কিছু করিয়ে নিতে হবে।

দু'জন দু'জনের মাথায় উকুন বেছে দিচ্ছে। ছোটবোনই প্রথম দেখল বড়বোনের মাথা। বড়বোন গরীব। মাথায় তেল নেই, চিরুনীও পড়ে না। ছোটবোন বড়বোনের মাথায় উকুন পেল। "এবার আমার মাথাটা বেছে দাও দিকিনি" বলে ছোটবোন মাথা এগিয়ে দিলে। বড়বোন ছোটর মাথায় উকুন পেল না। কিন্তু ছোটবোন নিজেই নিজের মাথা আঁচড়াতে গিয়ে একটা উকুন পেয়ে গেল। উকুন পেয়েই সে মনে মনে ভাবতে লাগল - দিদি দেখছি আমাকে ঠকাতে চাইছে। একবেলার খাবার পেয়েই খুশীতে ডগমগ, কাজের বেলা দেখছি কিছুই নেই। আচ্ছা রোস, রাক্ষুসীটাকে মজা দেখাচ্ছি। রাগে ফুলতে লাগল ছোটবোন। যাবার সময় ছোটবোন একফালি লাউ দিয়ে যে ভেট দিয়েছিল

বড়বোনের হাত থেকে তাও কেড়ে রেখে দিল। সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলে ছেলেপিলেদের অমঙ্গল হবে। তাই সামনের দরজা দিয়ে বেরুতে দিলে না— পেছনের দরজা দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। বড়বোন আর কি করবে ! কাঁদতে কাঁদতে বাড়ীর পথে পা বাড়াল।

বাড়ী যাবার পথ। চোখের জলের বিরাম নেই। ঘরে ছেলেমেয়েরা সারাদিন না খেয়ে আছে। পথের পাশে বুনো কচুবন। যাবার পথে ওগুলোই একমুঠো তুলে নিল রেঁধে খাবে বলে। বাড়ীতে গিয়ে বুনো কচুর ডাঁটাগুলোই কেটে কুটে উনুনে চাপিয়ে দিলে। যাহোক একটা কিছু পেটে পড়বে এই ভেবে। সারাদিন কিছুই খেতে পায়নি। খুবই ক্লান্ত। অদৃষ্টকে দোষারোপ করতে করতে একসময় উনুনের পাশেই ঘুমিয়ে পড়ল। এমনি সময়ে দেবতা এসে ওকে স্বপ্নে বলল — "দেখ্ মা, তোর অবস্থা দেখে আমি খুব ব্যথা পেয়েছি। আমি আর কি করতে পারি। উঠে দেখ, তোর কচুগুলো সব সোনা করে দিয়েছি। এগুলো বেচে ছেলেপেলেদের নিয়ে সুখে থাকিস।" দেবতার আদেশ পেয়ে ধড়মড়িয়ে উঠল সে। উঠেই দেখল উনুনে চাপানো কচুগুলো সেদ্ধ হতে হতে কখন জানি সোনা হয়ে গেছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। আর একবার ভাল করে চেয়ে দেখল; হাঁ সত্যিইতো, কড়াইতে চাপানো কচুগুলো দেখছি সব সোনা হয়ে গেছে ! সেও একতাল সোনা বেচে একদিনেই ধনী হয়ে গেল। ঘরদোর সব সাজিয়ে গুছিয়ে ঝকঝকে তকতকে করে ফেলল।

একদিন ছোটবোন তাড়িয়ে দিয়েছিল — কথাটি সে আজও ভুলেনি, খুব মনে আছে। দেবতার দয়ায় তারও আজ সুযোগ এসেছে। তাই তার ঘরদোর এসে দেখে যেতে ছোটবোনকে খবর পাঠাল। বড়বোনের অবস্থা ফিরে যাওয়ার কথা ছোটবোন লোকের মুখে শুনেছিল। তা, নিজের চাইতে বেশী কি কম — নিজের চোখে পরখ করে দেখতে ছোটবোন একদিন বড়বোনের বাড়ীতে বেড়াতে এল। বড়বোনের সোনাদানা হাল অবস্থা দেখে ছোটবোন খুব খুশী হল।

দু'বোন সারাদিন একসাথে খাওয়া-দাওয়া করল, কত কথাই বলাবলি করল। বাড়ীতে ফিরে ছোটবোনও দিদিকে 'একদিন এসে বেড়িয়ে যেয়ো' খবর পাঠাল। বড়বোন এ সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিল। সেও একদিন ছোটবোনের বাড়ীতে এল। বড়বোন তার সব সোনার অলংকারগুলো গায়ে পরে ঘোড়ার গাড়ী হাঁকিয়েই এসেছিল। বড়বোন এসে পৌঁছুতেই ছোটবোন সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে 'এস, এস, ঘরে এস' বলে বড়বোনকে এগিয়ে নিতে এল। একদিন তাকে পেছনের দরজা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তাই আজ সে সামনের দরজা দিয়ে ঘরে না ঢুকে পেছনের দরজা দিয়েই ঘরে ঢুকল।

খাবার সময় হল। বড়বোন খেতে বসেছে। ছোটবোন ভাল ভাল খাবার সাজিয়ে এনে বড়বোনের সামনে দিল। ভাল খাবার হলে কি হবে, বড়বোন কিন্তু একটুকুও খেল না। সে শুধু সোনার অলংকারগুলো খাবারের থালাতে কয়েকবার ঠুকে ঠুকে পেছনের দরজা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বড়বোন বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে ছোটবোন ডেকে জিজ্ঞাসা করল — "তুমি দেখছি কিছুই খেলে না দিদি।" দাওয়ায় দাঁড়িয়েই দিদি উত্তর দিল — "আগে যখন তোর বাড়ীতে এসেছিলাম তখন আমার সোনাদানা ছিল না। তাই একফালি লাউ আর এক মুঠো চাল দিয়েও হাত থেকে কেড়ে রেখেছিলি। তোর ছেলেমেয়েদের অমঙ্গল হবে বলে আমাকে সামনের দরজা দিয়েও বেরোতে দিলি না, পেছনের দরজা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলি। আমি গরীব বলেইতো এতটুকু করতে পেরেছিলি। আর আজ ? আমার কিছু সোনাদানা হয়েছে বলেই তো আমাকে এতটুকু আদর করছিস। তুই দেখছি আমাকে ভালবাসিস না, ভালবাসিস সোনাদানাকে। সে জন্যই আমি আজ না খেয়ে খাবার থালাতে অলংকারগুলো ঠুকে চলে এসেছি।" এই বলে বড়বোন গাড়ীতে গিয়ে চেপে বসল।

ছোটবোন নিজের কাজের জন্য উচিত সাজা পেল।

ধনেশ পাখীর গল্প

বুড়ো-বুড়ীরা যেমনি বসে থাকে— ঠিক তেমনি বসে থাকে ; লম্বা ঠোঁট, বিরাট শরীর পাখীটাকে তোমরা হয়ত দেখে থাকবে। সে পাখীটার নাম ধনেশ পাখী। অনেক প্রাচীনকালে পৃথিবীতে ধনেশ পাখী ছিল না। কোন এক সময় শাপগ্রস্ত হয়ে সে পৃথিবীতে এসেছে। সে গল্পটা হল এ রকম।

অনেক আগের দিনে দূর পাহাড়ের গাঁয়ে এক গেরস্ত জুম চাষ করত। তার নাম ছিল কচাক রায়। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের সংসার। স্ত্রীর নাম ছাম্পারি। স্ত্রী ছাম্পারি কাজে-কর্মে খুবই ভাল। ছ'কুড়ি ছ'ঘরের গাঁয়ে ওর মত আর একটিও মেয়ে নেই।

কচাকদের জুম খুব বড়। জুমের পাশেই ওদের ঘর। জুমে ফসলও হয় অনেক। কিন্তু এত ভাল জুম হলে কি হবে, কচাক কিন্তু এদিকের কুটোটিও ওদিকে নেয় না। রাজ্যের সেরা আলসে। মদ পেলে তো কথাই নেই— দিনরাত তা নিয়েই থাকে। তা না পেলে বারান্দার দাওয়ায় বসে সেই সকাল থেকে সন্ধ্যা অব্দি বাঁশি বাজাবে। ওদিকে স্ত্রী ছাম্পারি সমবয়সীদের নিয়ে কাজ করে। জুম পরিষ্কার থেকে শুরু করে ঘরে ফসল তোলা অব্দি— সব কাজ একহাতেই করতে হয়। ঘরে এসেও তার বিশ্রাম নেই। রান্না-বান্না করতে হয়— স্বামীকে খাওয়াতে হয়। কচাক ছিল খুব বদমেজাজী। ছাম্পারি

এতটুকু করেও ওর মন পেত না। পান থেকে চুন খসলেই ও রেগে যেত, ছাম্পারিকে খুব করে বকুনি দিত। তবু ছাম্পারি কচাককে ভালই বাসত। ও রেগে গেলেও ছাম্পারি কিন্তু একবারও রা-টি করত না।

সুখ দুঃখে ছাম্পারির দিন যায়। ছাম্পারি মা হবে। আজ হবে কি কাল হবে। ছাম্পারির মন খুশিতে ভরপুর; ছেলে হলে কি নামে ডাকবে, কেমন করে পিঠে নিয়ে বেড়াবে এসব চিন্তাতেই দিনরাত মশগুল হয়ে থাকে। এমনি দিনে ছাম্পারির ঘরে একটি ছেলেও হল। ছেলেতো নয় যেন একটি সোনার চাঁদ—'মগদাম' (ভুট্টা)-এর মত গায়ের রং।

কাজের মরশুম এসে গেছে। জুমের কাজে যেতে হবে। নয়ত আসছে বছর খাওয়া জুটবে না। এদিকে ছেলেটি এখনও খুব ছোট। পিঠে বয়ে নেবার মতও হয়নি। কিন্তু কাজে যে যেতেই হবে। কাজেই ছেলেকে খাইয়ে দাইয়ে দোলনায় ঘুম পাড়িয়ে ছাম্পারি রোজ কাজে যায়।

সেদিনও ছাম্পারি ছেলেকে খাইয়ে দাইয়ে দোলনায় ঘুম পাড়িয়ে কাজে গেল। যাবার সময় কচাককে বারবার বলে গেল ছেলের দিকে নজর রাখতে।

সেদিন কি জানি কেন ছাম্পারির মন জুমে যেতে সরছিল না। কিন্তু তবু যেতে হল। আজ ওদের জুমে কাজ হবে। ওদের জুম ছিল খুব দূরে। ঘর থেকে বেরুতে গিয়েও ছাম্পারি ছেলের দিকে নজর রাখতে কচাককে বলে গেল। কচাকও "হাঁ-হাঁ, দেখব" বলে ছাম্পারির কথার উত্তর দিল।

এদিকে ছাম্পারিও ঘর থেকে বেরিয়েছে — কচাকও রোজ দিনের মত পশ্চিমের বারান্দায় বাঁশি নিয়ে গিয়ে বসল। ওদের গায়াণ্ডি-এর দরজা ছিল পূব দিকে। ওদিক দিয়েই ছিল টংঘরে আসা যাওয়ার পথ।

ওদের ঘর থেকে খানিক দূরেই ছিল একটা বাঁশঝাড়। সেখান থেকেই ঘন বন শুরু। এত ঘন বন — দিনেই রাতের আঁধার নেমে থাকে। ভালুক, বনকুকুর, বাঘেরা সে বনেই দল বেঁধে থাকে। সুযোগের অপেক্ষায় ছিল একটা ভালুক। সুযোগ বুঝে একসময় এসে দোলনা থেকে ছেলেটিকে মুখে নিয়ে দে ছুট। ঘুমিয়েছিল বলে খোকার মুখ থেকে রা-টিও বেরুল না। গায়ণ্ডি-এর নীচে থেকে শূয়রগুলো শুধু একবার 'ঘোঁৎ-ঘোঁৎ' আওয়াজ করে উঠল। ব্যাস, তারপরই সব নীরব। ওদিকে বাঁশি নিয়ে মশগুল কচাকও বিন্দু বিসর্গ জানতে পারল না।

সূর্য তখনও ডোবেনি। ছাম্পারি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এল। এসেই দোলনার

পাশে। 'কোথায়— কোথায় আমার জুমের লাল ফলটি' বলে ছাম্পারি ডুকরে উঠল। কিন্তু খুব দেরী হয়ে গেছে। সেই কখনইতো সব শেষ হয়ে গেছে। বুক চাপড়াতে চাপড়াতে স্বামীকে খুব করে বকতে লাগল ছাম্পারি। মনে ব্যথা পেয়ে কেউ বকুনি দিলে তা না লেগে যায় না। ছাম্পারির কথাও ঠিক লেগেছিল। ছাম্পারি স্বামীকে বলতে লাগল— "আর জীবনে তুমি পাখী হয়ে জন্মাবে। তোমার ঠোট দু'টো বাঁশির মতই লম্বা হবে। গলার স্বরও হবে খুব কর্কশ— শুনলে যেন কানে তালা লাগে। আরও বলছি, তোমার ছেলেমেয়েরা বড় না হওয়া অব্দি ওদের বুকে নিয়েই তোমার স্ত্রী বসে থাকবে। ছেলে হয়েও তুমি আলসের একশেষ। তাই আসছে জীবনে ছেলেপিলেদের নিয়ে বসে থাকা স্ত্রীকে সারাদিন ঘুরে ঘুরে খাবার এনে খাওয়াবে। এভাবে দিনভর খেটে তুমি ক্লান্ত হবে। তোমাকে সাহায্য করারও কেউ থাকবে না।' এতটুকু বলে ছাম্পারি ঝট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল গভীর বনের দিকে— আর ফিরে এল না।

সেদিন থেকে ধনেশ পাখীর বাচ্চা হলে মা পাখীটি তার ছেলেপিলেদের আগলে গাছের বড় গর্তে বসে থাকে সারাদিন। পুরুষ পাখীটির নাওয়া নেই, খাওয়া নেই— সকাল-সন্ধ্যা ঘুরে ঘুরে ওদের খাবার যোগাড় করে ক্লান্ত হতে থাকে।

স্বর্গের ফুল রাম্না

চৈত্র মাস শেষ হতে চলল। বৈশাখ আসছে। দুদিন পরেই হবে 'গড়িয়া পূজা'। পূজার সময় কয়েকদিন ধরে ঘরে ঘরে চলবে হৈ হুল্লোড়, পান ভোজনের ছড়াছড়ি। এখন থেকেই তার প্রস্তুতি চলছে।

এমনি দিনে এক যুবক শ্বশুর বাড়ীতে জামাই খাটার মেয়াদ শেষ হলে স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ী ফিরে যাচ্ছে। এবারকার 'সেনা'য় (গড়িয়া উৎসবের সময়কে বলা হয় 'সেনা') স্ত্রীকে নিয়ে নিজের গাঁয়ে থাকবে, বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আনন্দে গা ভাসাবে। তাই মনে আনন্দের শেষ নেই।

খেয়ে দেয়ে রওয়ানা হতে হতে খানিকটা বেলা হয়ে গিয়েছিল। তবু আশা, সূর্য্যি ডোবার আগেই গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছতে পারবে। দু'জনেই খুব পা চালিয়ে হাঁটছে।

বনের মধ্য দিয়ে পথ। লোকজন নেই কোথাও। বেলা যতই গড়িয়ে যাচ্ছে বোশেখী হাওয়ার বেগও ততই বেড়ে যাচ্ছে। দখিনা বাতাস মন উদাস করে। আচমকা বাতাসে ভেসে এল নাম না জানা কি একটা ফুলের মিষ্টি গন্ধ। "— বাঃ - কী চমৎকার ! এমন সুগন্ধ কি ফুলের গো ?" স্ত্রী জিজ্ঞাসা করে স্বামীকে।

স্বামী— "ও ফুলের নাম" খেরেংবার বুবার "(রান্না)।"

স্ত্রী—"কি নাম বললে, খেরেংবার ? এ নামতো কখনও শুনিনি। এমন মিষ্টি গন্ধও কখনও পাইনি। আমাকে এক গোছা পেড়ে দাও না গো, পরতে ভারী শখ হচ্ছে।"

স্বামী— "কি সর্বনেশে কথা বলছ তুমি ! ও ফুল কি মানুষ পরতে পারে ?"

অবাক হয়ে স্ত্রী বলল — "এমন মিঠে গন্ধ ফুল কেউ পরে না - বল কি ?"

স্বামী — "সত্যি বলছি, কেউ পরে না। শুনেছি ও ফুল স্বর্গের ফুল। দেবতাদের জন্যই শুধু ও- ফুল ফুটে থাকে। মানুষে পরলে খুব অনিষ্ট হয়।"

স্ত্রী আরও অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে — "স্বর্গের ফুল পৃথিবীতে এল কি করে ?"

স্বামী - "কোন এক অপ্সরা নাকি এনেছিল। শাপভ্রষ্টা হয়ে পৃথিবীতে আসার সময় দেবী তার প্রিয় ফুলের চারা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। স্বর্গের ফুল পৃথিবীর জলবায়ু সইতে পারবে না, তাই ওকে বাঁচানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করল দেবী। চেয়ে দেখ, ওটাই খেরেংবার ফুল। মাটির সাথে ওর যোগাযোগ নেই । বেঁচে আছে অন্য একটা গাছে শিকড় আঁকড়িয়ে — সে গাছের গা থেকে রস শুষে নিয়ে।"

স্ত্রী— "আহা, দেখ-দেখ, ফুলগুলো দেখতেও কী সুন্দর ! আচ্ছা, ওফুল পরলে কি হয় বল না ?"

স্বামী বলল — আমাদের "কামিতে (পাড়ায়) একজন দিয়ারী (ধ্যানকারী) আছেন। তিনি বলেন, ও ফুল পরলে 'হুলক' (উল্লুক) হয়ে যায়।"

কথাটা স্ত্রীর তেমন বিশ্বাস হল না। কিছু না বলে শুধু সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে রইল সে।

এমন মিঠে গন্ধ ফুল পাড়তে না পেরে স্ত্রীর মন খুবই খারাপ হয়ে গেল। তাই যুবক তার স্ত্রীকে বলল "ফুল না পেয়ে খুব দুঃখ হচ্ছে বুঝি ? আচ্ছা, দুঃখ করো না। আমি এক্ষুনি পেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু দেখো, ফুল হাতে পেয়েই খোঁপায় গুঁজে বসবে না যেন। তা হলে আমি হুলক হয়ে যাব। দিয়ারীর মুখেই শুনেছি, দেবতার ফুল দেবতার নামে উৎসর্গ করে পরলে নাকি ক্ষতি হয় না। বাড়ীতে গিয়ে দিয়ারীর পরামর্শমত যা করবার করা যাবে। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থেকো, আমি গাছে উঠছি।" এই বলে তরতর করে গাছে উঠে কয়েক গোছা ফুল হাতে নিয়ে যুবক স্ত্রীকে বলল, "এই নাও, হাত পেতে ধরো। ফুলগুলো ফেলছি।"

স্ত্রী হাত পেতে ফুলগুলো নিলো। এমন সুন্দর এমন মিষ্টি ফুল ! স্ত্রী আর লোভ

সামলাতে পারল না। সাথে সাথে এক গোছা ফুল খোঁপায় গুঁজে দিল। আর ওদিকে সাথে সাথেই তার স্বামীর হাত পা আটকে যেতে লাগল গাছের ডালে। গাছ থেকেই স্বামী ভয় পেয়ে বলে উঠল— "একি, আমার শরীরটা বদলে যাচ্ছে কেন ! তুমি কি ফুলগুলো পরেছ?"

স্বামীর কথা শুনে স্ত্রী ভয় পেয়ে উপর দিকে তাকাল। সত্যি সত্যিই স্বামী তার বদলে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ফুলের থোকাটি খোঁপা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কিন্তু তাতেও কিছু হল না। সর্বনাশ যা হবার সেতো কখনই হয়ে গেছে। স্বামী বেচারা আর আগের মত হল না। তখন সে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল— "হায়, কেন আমি ফুলগুলো পরতে গেলাম। লোকটি হুলক হয়ে যাচ্ছে। কি করব এখন— কি করে ওকে আবার মানুষ করে তুলব। ওকে এখানে রেখে আমি কোন মুখে গাঁয়ে ফিরে যাই। আমি কি নিয়ে বাঁচব।"

গাছে উঠে সে স্বামীকে নামিয়ে আনতে চাইল। একে মেয়ে মানুষ, তার উপর গাছটাও খুব উঁচু। কিছুতেই সেই বিরাট গাছটায় উঠতে পারল না। নিরুপায় হয়ে শোকে-দুঃখে নিজের চুল ছিঁড়তে লাগল। চীৎকার দিয়ে সে বলতে লাগল, "ওগো, তুমিতো পুরুষ মানুষ। অনেক কিছু দেখেছ, জেনেছ, । একবারটি বল না, কি করলে তুমি আবার মানুষের চেহারা ফিরে পাবে ?"

স্বামী বেচারা এতক্ষণে প্রায় হুলক হয়ে গেছে। কথাগুলোও জড়িয়ে আসছে। অস্পষ্ট ভাষাতেই সে হাত-পা নেড়ে বলতে লাগল, "আমি আর মানুষের চেহারা ফিরে পাব না। তোমাকে নিয়ে ঘর করব বলে মনে কত সাধ ছিল। কপাল মন্দ বলে তা আর হল না। এখন তুমি এক কাজ কর। তুমি আর এখানে থেকো না। অন্ধকার হয়ে আসছে। একটু পা চালিয়ে বাড়ীর দিকে হেঁটে যাও। তাহলে সন্ধ্যার সাথে সাথেই বাড়ীতে পৌঁছতে পারবে। আমাদের 'কামি'ও (পাড়া) এখান থেকে বেশী দূরে নয়। ওই পায়ে চলা পথটি ধরে এগিয়ে গেলে পথ হারাবে না। মা বাবাকে আমার কথা বুঝিয়ে বলবে — তাদের সান্ত্বনা দিও। তুমি যাও। এ জীবনে না হলেও আরেক জীবনে তোমার সাথে মিলিত হব এখন থেকে আমাকে 'হুলক' হয়েই থাকতে হবে।

নীচে থেকে স্বামীর কথা শুনছে আর ব্যথায় বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে স্ত্রীর। সে চীৎকার করে গাছের গোড়াতে মাথা কুটতে লাগল। আর বলতে লাগল— "ওগো অমন কথা বোলো না। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। আমার জন্যই তো তুমি 'হুলক' হলে। কেন আমি সর্বনাশা ফুল পরতে গেলাম। তোমাকে না নিয়ে আমি কি করে কামিতে ফিরে যাই ? না,—না, এ আমি কিছুতেই পারব না। আমি এক্ষুণি এ গাছের গোড়াতেই মাথা কুটে মরব।" ঘটলও তাই। গাছের সাথে মাথা ঠুকতে ঠুকতে এক সময় স্ত্রীর দেহটা

অসাড় হয়ে পড়ল। স্বামীর দিকে চেয়ে চেয়ে সেখানেই এক সময় মরে পড়ে রইল।

ওদিকে উপর থেকে স্বামী বেচারা সবই দেখছিল। তীব্র যন্ত্রণায় বুক ফেটে গেলেও মুখ ফুটে কোন কথা বলতে পারছিল না। এতক্ষণে পুরোপুরি হুলক হয়ে গেছে। স্ত্রীর দিকে চেয়ে চেয়ে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল গোঙানির শব্দ — "হু-হু, হু-হু, হুলক হুতে, হুলক হুতে।"

স্ত্রীর অতৃপ্ত হৃদয়-মন চেয়েছিল স্বামী সান্নিধ্য। তাই আবার সে জন্ম নিল 'মুফুক' (গোধিকা) হয়ে সে বনেই। তার দুরাকাঙ্ক্ষার শাস্তিস্বরূপ সে 'হুলক' হয়ে জন্মাল না।

আজও বোশেখ মাস এলে 'খেরেংবার' (রাস্না, অর্কিড) ফুল ফুটলে হুলক তার গত জীবনের কথা মনে করে 'হুলক-হুতে, হুলক-হুতে' বলে গুমরে উঠে। আর তক্ষুণি মাটি থেকে মিলনাকাঙ্ক্ষী 'মুফুক' লেজ চাপড়াতে থাকে।

নরনারীর এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার কান্না বুঝি দেবতাদের মনেও দোলা দিয়েছিল। আর কোনদিন যাতে এ রকমটা না ঘটে তার জন্যই দেবতারা সেদিন থেকে খেরেংবার ফুলের গন্ধ নিজেদের গায়ে নিয়ে নিল। তাই আজ আমরা রাস্না ফুলের বুকে কোন গন্ধ খুঁজে পাই না।

সজারুর বুদ্ধি

খুব বড় একটা দাঁতাল হাতী। নদীতে জল খেতে এল। জল খেতে নেমেই দেখল জলগুলো বিচ্ছিরি— একদম ঘোলা। ওদিকে কেউ চান করছে হয়ত। তার জন্যই এদিকে ঘোলা জল ভেসে আসছে। তা' মানুষ কি এত নোংরা জল খেতে পারে। হাতী রাগে ফেটে পড়ল। কী — কার এত সাহস! দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি। হাতী হেলে-দুলে উজানের দিকে এগিয়ে চলল — পাঁজিটাকে শিক্ষা দিতে। বেশী দূর যেতে হল না। খানিকটা এগিয়ে যেতেই — হাতী দূর থেকে ছোট্ট একটা সজারু নদীর জলে চান করে গর্তে ঢুকছে দেখতে পেল। দূর থেকে হাতী ততটা আন্দাজ করতে পারেনি। তাছাড়া প্রথম থেকেই হাতী খুব রেগেছিল। ওকে দেখেই সে চীৎকার করে উঠল — "তুই কি আমার খাবার জল ঘুলিয়েছিস ?" এদিকে সজারু শরীরের প্রায় সবটাই গর্তেঢুকিয়ে দিয়েছিল। খানিকটা মুখ বের করে দাঁত দেখিয়ে সজারু খেকিয়ে উঠল। সে বলল — "কি, কি বলছিস তুই?" হাতী আরও রেগে গিয়ে বলে উঠল — "কি বলছি বুঝতে পারছিস না ? এ পাহাড়ের সব্বাই আমাকে মেনে চলে, ভয় করে। তুই কোথাকার এমন, আমার খাবার জল ঘুলিয়ে দেবার সাহস হল?" সজারু কিন্তু এতটুকুও ভয় পেল না। সেও যতটুকু সম্ভব রেগে গিয়ে বলল — "তোর সাহসের বলিহারি যাই। আমি

হলাম এ রাজ্যের রাজা। তোর জল খাবার জায়গাটা — তাও আমার রাজ্যের ভেতরেই। আর তুই কিনা চোখ রাঙিয়ে আমাকে ভয় দেখাতে এলি ? যা— যা, শীগগীর এখান থেকে দূর হয়ে যা বলছি। না হলে এক্ষুনি মাটিতে পুঁতে ফেলব দেখিস।" এভাবে বললে কি আর মাথা ঠিক থাকতে পারে কারো ! হাতী শুঁড় তুলে দাঁত বের করে বিরাট শরীরটাকে দু'একবার নাড়া দিয়ে নিজের শক্তি দেখাতে চাইল। গলার আওয়াজটাও মেঘের গর্জনের মত করে উঠল। "তুই তো দেখছি খুবই বড়াই করছিস। তোর সবটা শরীর আমার একখানা পায়ের সমানও যদি হয়তো বলি।" সজারু বলল — "আরে ধ্যাৎ তুই কি আমাকে এতটুকুন ভাবছিস নাকি ? মনে রাখিস, তোর মত তিন চারটে জানোয়ার আমার সকাল বেলার জল খাবার খেতেই লেগে যায়।"

হাতী ভড়কে গেল। সত্যিইতো এ আবার কেমন লোক ! হাতী আগে কখনও সজারু দেখেনি, আজই প্রথম। তাছাড়া আজকে যেটুকু দেখল, তাও পা থেকে মাথা অব্দি সবটা দেখতে পায় নি। গর্তে ঢোকার সময় লেজের দিকে খানিকটা, পরে মুখের খানিকটা শুধু দেখতে পেয়েছিল। কে জানে বাবা, সত্যি সত্যিই খুব বড় কিছু একটা কিনা কে জানে ! হলেও বা হতে পারে । কিন্তু তা বলে ভয় পেলে তো চলবে না। ভয় পেলেও শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়েই চীৎকার করে উঠল সে — "তা হলে বেরিয়ে আয় একবার, তুই কত বড় মানুষখেকো পরখ করে দেখি।" সজারু গর্ত থেকে না বেরিয়েই শরীর থেকে একটা কাঁটা তুলে হাতীর সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বলল — "তা আমার শরীরের এ লোমখানা মেপে দেখ দিকিনি, তা হলেই আমাকে বুঝতে পারবি।" হাতী ওটা হাতে নিয়ে ভাল করে পরখ করে দেখতে লাগল। সত্যিই তো, এতো দেখছি একখানা আস্ত লোহার কাঁটা। মানুষের লোম কি এত শক্ত ! জীবনে অনেক মানুষের দেখা পেয়েছি, কিন্তু এমন সূঁচের মত লোমওলা একজন মানুষও দেখিনি। ওর সাথে কুস্তিতে পেরে উঠব না বলেই মনে হচ্ছে। ভয়ে শিউরে উঠল হাতী। লেজ আকাশে তুলে পড়ি কি মরি, যেদিকে দু'চোখ যায় পালিয়ে বাঁচল। একবারও পেছন দিকে ফিরে চাইল না। সজারুর হাসি তখন কে দেখে ! শরীর বড় হলে কি হবে, হাতীও কখন কখন বুদ্ধিতে ওর চেয়ে ছোট্ট কারো কাছে হেরে যেতে পারে।

কথা বলা আংটি

দশ গাঁয়ের সেরা ছ'কুড়ি ছ'ঘরের এক গাঁ। ও গাঁয়ে বুড়ো আর বুড়ীর এক ঘর। ওদের নাতি আছে দু'টো — ওদের সঙ্গেই থাকে। নাতি দু'টো একদিন জুমে গেল কাজ করতে। কাজের মরশুম। কাজ করতে করতে কখন যে দুপুর গড়িয়ে গেল খেয়াল ছিল না। বড্ড খিদে পেয়েছে। কী যে খাই ! জুমের পাশেই ছিল ঘুঘুর বাসা। দু'ভাই মিলে সে

বাসা থেকে চারটে ডিম খেল।

দিনের শেষে ঘরে ফিরে এল দু'ভাই। এসে ঠাকুরমাকে বলল, "আচুই, আচুই, (ঠাকুরমা ঠাকুরমা) জুমে কাজ করতে করতে খিদে পেলে আমরা আজ ঘুঘু পাখীর ডিম খেয়েছি! সত্যি ডিমগুলো খু—ব স্বাদ, খেলে জিভে লেগে থাকে।

ওদের ঠাকুরমা বলল — "তা' আমার জন্য আনলে না কেন ? আমিও দু'টো খেয়ে দেখতাম। অনেক দিন হল আমিও খাইনি।" বুড়ো-বুড়ী প্রসঙ্গটা সেখানেই চেপে গেল। এক সময় ছেলে দু'টো যখন ঘরে নেই তখন বুড়ো-বুড়ী বলাবলি করছে— "মা বাবা মরা ছেলে দু'টো, ওদেরকে আমরা কতই না আদর করি। ভাল মন্দ কিছু একটা হলে ওদের না দিয়ে মুখে দিই না। আর, ওরা কিনা আজ দিব্যি জুমে গিয়ে ঘুঘুর ডিম খেয়ে এল। দাদু দিদির জন্য একটা ডিমও নিয়ে এল না। আপদগুলোর বিন্দুমাত্র দয়ামায়া নেই দেখছি। ওরা জুমে যাক আর একদিন। ওরা জুমে গেলে আমরাও বড় তেলালো শূয়োরটা কেটে খাব। রাক্ষসগুলোর জন্য এক টুকরোও রাখব না।

যেমনি কথা তেমনি কাজ। পরদিনই দু'ভাই জুমে গেলে বুড়ো-বুড়ী দু'জনে মিলে বড় তেলালো শূয়োরটা কেটে বসল। চেঁচে ছুলে মাংস কাটার সময় দু'ভাই জুম থেকে এসে হাজির। ওদের দেখে বুড়ো-বুড়ীর চোখ ছানাবড়া। দু'জনে বলাবলি করছে — "আপদগুলোকে না দিয়ে খেতে চেয়েছিলাম; এসে গেছে দেখছি। আচ্ছা, আচ্ছা, রোসো,একটা বুদ্ধি বের করছি।'

দু'ভাই জুম থেকে এসে ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করছে — "আমাদের না বলে শূয়র কাটতে গেলে কেন ঠাকুরমা ?" ঠাকুরমা উত্তর দেয় — "কেটেছি বেশ করেছি ; খাব বলে। আচ্ছা, এখন যা দেকিনি, নাড়ীভুঁড়িগুলো চট করে চিরে ধুয়ে মুছে নিয়ে আয় দেকিনি।' দু'ভাই চলে গেল ভুঁড়িগুলো ধুয়ে আনতে। এদিকে ওরা চলে গেলে বুড়ো-বুড়ী মাংস রেঁধে তাড়াহুড়ো করে সব খেয়ে ফেলল। যেটুকুন খেতে পারল না, লুকিয়ে রাখল। ওদের জন্য এক টুকরো মাংসও নেই। তাইতো, এতগুলো মাংস কোথায় গেল। ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করল — "ঠাকুরমা, আমাদের মাংস কোথায় ! " "তোদের আবার কি জন্যে" বুড়ী খেঁকিয়ে উঠল। ঘর থেকে বেরিয়ে যা আপদগুলো। তোদের মনে দয়া মায়া নেই। " এই বলে বুড়ী তার নাতিদুটোকে ঘর থেকে বের করে দিল।

ঘর থেকে বের করে দিলে ছেলে দুটোও আর এ গাঁয়ে থাকবে না বলে ঠিক করল। আশ্রয়ের খোঁজে ভিন গাঁয়ের পথে বেরিয়ে পড়ল। বনের ভেতর দিয়ে পথ। তখনকার পাড়াগুলোও ছিল খুব দূরে দূরে। মানুষও ছিল এখনকার চাইতে অনেক কম। যেতে যেতে বেলা শেষে ওরা এক জায়গায়ে গিয়ে থামল। খিদে তেষ্টায় দু'জনেই অবসন্ন, পা

আর চলছে না। কাছে পিঠে খাবার মত কিছুই খুঁজে পেল না। পাশেই একটা বিরাট গাছ ; উপরে পাখির বাসাও দেখা যাচ্ছে অনেক। উঠে দেখতে হয় বৈকি! দু'একটা হয়তো পাওয়া যেতে পারে। ওদের মধ্যে একজন তরতর করে গাছে উঠে গেল। এবাসা ওবাসা হাতড়িয়ে কয়েকটা ডিম পেলও বটে— তবে শকুনের। পেটের খিদেয় আর ওর সইছিল না। তাই একটা ডিম ফেলে দিলে মাটিতে ছোট ভাইয়ের জন্য মাটিতে পড়েই ডিমটা চৌচির হয়ে গেল। ছোট ভাইয়ের আর ডিম খাওয়া হল না। ওদিকে গাছে বসে যে শকুনের ডিম খেয়েছিল — কি জানি কেন, আস্তে আস্তে সে শকুন হয়ে গেল। কি আর করবে ! শকুন তখন তার ছোট ভাইকে গাছের উপর থেকে বলছে, "ভাই, দেখতেই পাচ্ছিস, আমি শকুনের ডিম খেয়ে শকুন হয়ে গেছি। মানুষের সঙ্গে আর থাকতে পারব না; শকুনের দলেই যেতে হবে এখন ।" দাদার কথা শুনে ছোটভাই উপর দিকে চেয়ে কেঁদে কেঁদে বলছে " আমি একা কি করে থাকব দাদা ? এদিকে লোকজনও দেখছি না — বনও খুব গভীর।" শকুন হলে কি হবে, মনে কিন্তু ছোট ভাইয়ের জন্য আগের মতই মায়া রয়েছে। উপর থেকে সে বলল, আমি চলে গেলেও তোকে গাঁয়ের কাছে পৌঁছে দেব। তুই একটা কাজ করিস, আমি উপর দিয়ে উড়ে যাই, তুই আমাকে দেখে দেখে চলে আয়।"

শকুন উপর দিয়ে উড়ে চলল। ছোট ভাই উপর দিকে চেয়ে জঙ্গলের পথ বেয়ে এগুতে লাগল। খানিক বাদেই শকুন ছোটভাইকে এক বিধবার জুমে পৌঁছে দিয়ে চিরদিনের মত চলে গেল।

জুম হলে কি হবে — সে শুধু নামেই। আবাদও হয়নি ততটা। ফসলও খুব অল্প। টং ঘরের খুঁটির চিহ্ন দেখা যায় না কোথাও। এক গরীব বিধবার জুম কিনা — তাই এ হাল। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, সারাদিনের ক্লান্তিতে নুইয়ে পড়েছে ছেলেটি। তাহোক, কিছু একটা পেটে দিতে হবে ভেবে ছেলেটি ঢুকে পড়ল খাবারের খোঁজে। অনেক খুঁজে পেতে একটা ফুটি পাওয়া গেল। সে জুমে ওই একটাই ফুটি ফলেছিল। ছেলেটি তাই খেয়ে নিলে। যাহোক পেটে তো কিছু পড়ল, এবার ঘুমোব কোথায় ? লতাপাতা কুড়িয়ে গাছের নীচেই এক জায়গায় ঘুমিয়ে পড়ল। দুপুর রাতে ছেলেটি স্বপ্ন দেখছে — এক দেবতা এসে তাকে বলছে- "বাবু, রাত ভোরে বিধবার জুমের পাশের বাঁশঝাড়টি খুঁড়ে দেখবে। ওখানে একটি জিনিষ পাবে। তা তোমার কাছে যত্ন করে রেখে দিও, কাজে লাগবে। " ভোর না হতেই দেবতার কথামত সে ওই বাঁশঝাড়টা খুঁড়ে দেখল। কি আশ্চর্য ! ওখানে একটা সোনার আংটি। এ আংটিটা কিন্তু সাধারণ আংটি নয়। সে কথা বলতে পারে। বলে দিলে, কোন কাজই তার অসাধ্যি নেই — সব কাজই করতে পারে। ছেলেটি হাতের আঙ্গুলে আংটিটি পরে রাখল।

রাত ভোর হতেই বিধবা এল জুম দেখতে। এদিক ওদিক চেয়ে দেখল ফুটিটা নেই। সে আপন মনেই বলতে লাগল — "আমি বিধবা, কাজ করার লোকও নেই। অন্যদের জুমের মত আমার জুমও ততটা বাড়-বাড়ন্ত নয়। অফলন্ত সময়ে একটা ফুটি ফলেছিল - তাও বুঝি কে খেয়ে নিলে।" এমনি সময়ে ছেলেটি এগিয়ে এসে বলল — "মা তোমার ফুটিটা আমিই খেয়েছি। দুদিন হল পেটে কিছু পড়েনি। তাই খেতে বাধ্য হয়েছি। আমাকে বোকো না।" বিধবা বলে — "তুমি যখন আমাকে মা বলে ডেকেছ, তখন আর কি করি। খেয়েছ তো খেয়েছ। আমার ছেলেমেয়ে কেউ নেই। আজ থেকে তুমিই আমার ছেলে। তুমি না খেলে কে খাবে বল ? ছেলেটিও বলল — "আমারও কেউ নেই মা। আমি তোমার এখানেই জুম আগলিয়ে থাকব, শুধু দু'বেলা দু'মুঠো আমাকে খেতে দিও।" দু'জনেই দু'জনকে ভালবেসে ফেলল।

বিকেল বেলা বিধবা বাড়ী ফেরার সময় ছেলেকে বলছে — "বেলা যাচ্ছে বাবা, চল এখন বাড়ী যাই ।" "না — মা, আমি এখানেই জুম আগলিয়ে থাকব। তুমি যাও'— ছেলেটি বলল। "আগলাও আর যাই কর, কাল ভোরে এসেও তো করতে পারবে। একটা টং ঘরও নেই, রাত বিরেতে কি করে থাকবে এখানে ?" —স্নেহের কণ্ঠে বলল মা। ছেলে কিন্তু কিছুতেই গেল না। মাকে সে বুঝিয়ে বলল — "তুমি ভয় পেওনা মা। আমি এখানে বেশ থাকতে পারব, দেখে নিও। তুমি ঘরে ফিরে যাও।" বিধবা দুশ্চিন্তা নিয়ে একাই বাড়ী ফিরে গেল। বিধবার জুমে ছেলেটি একাই রয়ে গেল।

রাত হয়েছে। কেউ কোথাও নেই। এবার ছেলেটি তার আংটিকে ডেকে বলছে— "শোন আংটি, আমার এখানে থাকার জায়গা নেই দেখতেই পাচ্ছ; আমাকে এক্ষুনি একটা "গায়রিঙ' (টংঘর) বানিয়ে দাও দিকিনি।" সঙ্গে সঙ্গেই আংটিও খুব সুন্দর একটা 'গায়রিঙ' বানিয়ে দিলে। ঘর গেরস্তালীর সব জিনিষপত্তর একে একে সাজিয়ে রাখল ভেতরে। ছেলের আদেশ মত বিধবার জুমটাকেও আরও বড় করে শাক সব্জী, ফসল দিয়ে সাজিয়ে দিলে। নতুন জুমটা পুরোনোটার চাইতে চারগুণ বড় হয়ে গেল। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ছেলেটি সে রাত টংঘরে উঠেই কাটাল।

পরদিন রাত ভোর হতে না হতেই বিধবা জুমে ফিরে এল। ছেলে একা একা জুমে রয়েছে — কত কিছু বিপদই তো হতে পারে। তাই দূর থেকেই দেখছে আর ভাবছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, সে যেন চিনতেই পারছে না তার জুমটাকে। আগে তো তার জুমে 'গায়রিঙ' ছিল না। কি করে উঠল ! পুরোনো জুম আর নেই, খুব বড় হয়ে গেছে দেখছি। জুমে ফসলও দেখছি প্রচুর। সবই অবাক লাগছে তার কাছে। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে টংঘরের উপরে গিয়ে ছেলের দেখা পেল। অবাক হয়ে ছেলেকে জিজ্ঞাসা

করল - "আচ্ছা বাবা, তুমি কি করে এক রাতের মাঝে এত বড় একটা টংঘর তুলতে পারলে ?" "তা এমনিতেই তুলেছি মা," এই বলে সে চেপে গেল। আর কিছুই বলল না সেদিন। এখন থেকে বিধবার থাকা খাওয়ার কোন কষ্ট রইল না। মা ছেলে খুব সুখেই থাকতে লাগল।

ধান কাটার বাকী আছে কিছুদিন। "বালা কামাদি" (ধান কাটার পুর্বে দেয় পূজা) দিতে হবে। অচাই (পুরোহিত) ডাকতে গেল বিধবা পুরানো পাড়ায়। পুরোহিত বিধবার ওখানে পূজো দিতে চায় না। কেননা, বিধবার ওখানে গেলে মদ তো দূরের কথা, একবেলা খেতেও পায় না। বিধবা খুব অনুরোধ করে নিয়ে এল অচাইকে। ওদিকে ছেলে আংটিকে বলে পূজোর জিনিষ পত্তর সব সাজিয়ে রেখেছে। অচাই এসে পূজো দিল। পূজোর শেষে তাকে ভাল করে এক পেট খাইয়ে দিল। এসব দেখে অচাই মনে মনে ভাবছে — তাইতো, বিধবার তো চালচুলো কিছুই ছিল না। রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেছে দেখছি। সেও গাঁয়ে গিয়ে সবাইকে বলতে লাগল— "তোমরা বিধবার জুমে গিয়ে দেখ, ওর আগের মত আর অভাব নেই। এখন সে গাঁয়ের সবার চাইতে ধনী। জুমের ধানও গিয়ে দেখ কত — কত ! অচাইর কথায় যারা দেখতে এল ওরাও দেখল — হ্যাঁ ঠিকই তো।

একদিন ছেলে তার মাকে একটি লাঙ্গা বানিয়ে দিলে। বিধবাও লাঙ্গাটি নিয়ে পুরোনো গাঁয়ে আসে যায়। সে গাঁয়ের চকদ্রির (গাঁয়ের প্রধানকে 'চকদ্রি বা চৌধুরী বলা হয়) একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল। সে দেখল লাঙ্গাটি । "বাঃ— এত সুন্দর লাঙ্গা তো আর কখনও দেখিনি।" তারও এমন একটি লাঙ্গা পেতে ভারী ইচ্ছা। সে একদিন বিধবাকে জিজ্ঞাসা করে বসল তুমি এত সুন্দর লাঙ্গা কোথায় পেলে মাসী ? কে তোমাকে বানিয়ে দিয়েছে। আমি এমন একটা লাঙ্গা পেলে — আমাকে একটা বানিয়ে দাও না । "আমার ছেলে বানিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা, ওকে বলে দেখি ।" বিধবা বলে, চকদ্রির মেয়ে একদিন ছেলে নিয়ে এসে বেড়িয়ে যেতেও মাসীকে বলে দিল। জুমে ফিরে এসেই বিধবা তার ছেলেকে সব বলে শোনাল। ওকে গাঁয়ে যেতেও নিমন্ত্রণ জানিয়েছে, একথা বলতেও ভুলল না। ছেলে কিন্তু কিছুতেই গাঁয়ে যেতে রাজী হল না। একদিন চকদ্রির মেয়েই বেড়াতে এল তার মাসীর সঙ্গে বিধবার জুমে। জুমে বিধবার ছেলের সঙ্গে তার দেখা হল। একথা সেকথার পর চকদ্রির মেয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করল — "আমাকে একটা বানিয়ে দেবে ?" ছেলেটি হেসে উত্তর দেয় — "তা দেব বৈকি ! সময় হলে নিশ্চয়ই দেব।"

জুমের ধান পেকেছে। প্রচুর ধান হয়েছে। "হ্যাঁ বাবু, ধান তো পেকেছে। কখন কাটবে ?" বিধবা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল। ছেলে বলল— "তা' তুমি চিন্তা করো না

মা। সময় হলে কাটবখ'ন।" সে রাত্তিরেই ছেলে আংটিকে বলছে "দেখ আংটি, জুমের ধানতো পেকেছে। এবার কেটে মেরে ঘরে উঠাও দেখিনি।"আংটিও এর রাতের মধ্যেই জুমের সমস্ত ধান কেটে মেরে ঝেড়ে ঘরে উঠিয়ে দিলে।

এদিকে বিধবার জুম থেকে ফিরে আসা অবধি চকদ্রির মেয়ের মুখে হাসি নেই। দিন রাত যেন কি ভাবছে। মেয়ের কি হল তা নিয়ে বাপ মায়েরও চিন্তার শেষ নেই। বিয়ে দিলে হয়ত ভালও হতে পারে — এই ভেবে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করতে লেগে গেল।

আগের দিনের বিয়ে থা' কিন্তু আজকের মত ছিল না। গাঁয়ের সুন্দরী মেয়েদের বিয়ে করতে হলে গাঁয়ের ছেলেদের কোন একটা শক্তির পরীক্ষা দিতে হত। পরীক্ষা উতরিয়ে শক্তিশালী ছেলেটিই পারত সুন্দরী মেয়েটিকে বিয়ে করতে। চকদ্রিও তাই ঘোষণা করে দিল — "যে শক্তিশালী যুবক এক হাত দিয়ে একটা শূয়োর মেরে কেটে, ছেঁচে-ছুলে সবাইকে খাওয়াতে পারবে তার সাথেই তার মেয়ের বিয়ে হবে"।

"ছিক্লা পতলকে"র (বিয়ের জন্য ছেলেকে যে শক্তির কিংবা বুদ্ধির পরীক্ষা দিতে হয় তাকেই বলা হয় "ছিক্লা পতলক"। এই পরীক্ষা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকত।) তিন গাঁয়ের অবিবাহিত শক্তিশালী ছেলেরা সবাই এসে জড় হল চকদ্রির বাড়ীর উঠোনে। মজা দেখতে নারী পুরুষের সংখ্যাও হল প্রচুর। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বিধবাও এসেছে। এদিকে চকদ্রি সবচেয়ে শক্তিশালী শূয়োরটাকে খাঁচায় পুরে রেখেছে। গাঁয়ের যুবক ছেলেরা একে একে খাঁচায় ঢুকে নিজেদের শক্তির পরীক্ষা দিতে লাগল। কেউবা নাকে মুখে আঁচড় খেল, কেউবা হাতে পায়ে ব্যথা পেয়ে ফিরে এল। দু' একজন তো শূয়োরের কাছেই ঘেঁষতে পারল না। একে একে সবাই মাথা হেঁট করে ফিরে আসতে বাধ্য হল। কেউ শূয়োরটাকে কাবু করতে পারল না। তাই চকদ্রি পরিহাস করে গাঁয়ের ছেলেদের বলছে "এতো দেখছি একেবারে ভারী লজ্জার কথা। আমার গাঁয়ের ছেলেরা দেখছি একেবারে শক্তিহীন। গাঁয়ের মেয়েকে ওরা গাঁয়ে রাখতে পারলে না। আমাকে বাধ্য হয়ে এখন ভিন গাঁয়ের জোয়ান ছেলেদের ডাকতে হবে"। ছেলেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে — "আমরা তো সবাই চেষ্টা করে দেখলাম। বিধবার ছেলেটি কিন্তু এখনও দেখেনি। ওতো আমাদের গাঁয়েরই ছেলে"। গাঁয়ের ছেলেদের মধ্যে একজন তাই ওকে বলছে — "তুমি কেন চেষ্টা করে দেখলে না ভাই, তোমাকেও দেখতে হবে বৈকি ! তুমিও তো গাঁয়েরই ছেলে !" "— না, না আমি দেখব না ভাই। তোমরা সবাই যা পারলে না আমি কি তা পারব ?" বিধবার ছেলে উত্তর দেয়। গাঁয়ের ছেলেরা কিন্তু ওকে ছাড়ল না। জোর করে ঢুকিয়ে দিলে খাঁচার ভেতর। ঢুকিয়ে যখন দিয়েছে কি আর করবে

সে। এদিক ওদিক দু' একবার দেখে নিল ভাল করে। তারপর জুতসই জায়গা বেছে নিয়ে আচমকা শূয়োরটার একটা পা ধরে ফেলল একহাতে। আর যাবে কোথায় ? দু' একটা পাক দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েই পা দিয়ে শূয়োরটার গলা চেপে ধরল। অন্য পায়ে চেপে ধরল পেছনের পা দুটো। ধীরে ধীরে শূয়োরটা ক্লান্ত হয়ে এল। সুযোগ বুঝে বিধবার ছেলে শূয়োরটার বুকে প্রচণ্ড এক ঘা বসিয়ে দিতেই শূয়োরটা মরে গেল। উপস্থিতসবাই বিধবার ছেলের শক্তির তারিফ করতে লাগল। এবার বিধবার ছেলে এক হাতেই শূয়োরটাকে ছেঁচে-ছুলে রান্না করে সবাইকে পরিবেশন করে খেতে দিল। গাঁয়ের চকদ্রি খুশি হয়ে 'অচাই' ডেকে পূজো দিয়ে পবিত্র জল ছিটিয়ে খুব জাঁক করে ওদের দু'জনের বিয়ে দিয়ে দিল।

সেদিন থেকে দশ গাঁয়ের সেরা দু'কুড়ি ছ'ঘরের এক ঘর হয়ে ওরাও সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে লাগল।

কলাবতী কন্যা

এক দেশে ছিল এক মস্ত বড় জমিদার—। তাঁর ছিল পাঁচটি ছেলে। চার ছেলের ছিল সুন্দর বউ—। ছোট ছেলেটি ছিল সব চেয়ে সুন্দর অথচ ভীষণ অলস। এতো অলস যে শুয়ে বসেই তার দিন কাটে। এমনকি কলাটি পর্যন্ত খোসা ছাড়িয়ে খেতে পারে না। তবু চার বৌদির বড় আদরের দেবর ছিল সেই ছোট কুমার।

একদিন বড় বৌদি ঠাট্টা করে বললো— 'ইস্', আলসে ছোট কুমারের ঘরে কোন মেয়েই আসবে না, আমার ভীষণ দুঃখ লাগছে।

— ছোট কুমার খাটের পাশেই বসেছিল পা ঝুলিয়ে বড় বৌদির কথায় তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ছুড়ি বললো—

— কি। আচ্ছা দেখে নিও, বড় বৌদি আমার বউ সবচাইতে সুন্দর হবে—। যেই বলা সেই কাজ। ছোট কুমার জুমের একটা সুন্দর ফল, একটা বেতের ছড়ি, একটা চকচকে ধারালো ছুরি আর থুং নিয়ে বের হলো বউ খুঁজতে—।

সুন্দর সূর্যটা সোনালী আলো ছড়িয়ে পূর্বের আকাশ থেকে তখন মধ্য গগনে বিরাজ করছে। ....। অনেক উঁচু পাহাড়, পাথরের বড় বড় চাঁই পেরিয়ে ছোট কুমার হাঁটতে লাগলো— ঘন নিবিড় বনে গাছগুলি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট কুমারের সুন্দর স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে ভরা মুখখানা রোদে টক্‌টকে লাল দেখাচ্ছে—।

সে পিপাসায় কাতর হয়ে বসে পড়ল একটা বড় গাছের তলায়—। ঝিরঝিরে

বাতাসে চোখে কেমন একটা ঘুম ঘুম আবেশ—। হঠাৎ একটা হলদে পাখী গাছের শাখায় ডেকে উঠলো—কুমারের তন্দ্রা ভাব কেটে গেল— । দৃষ্টি চলে গেল একটা জুমের মাচান ঘরে। রিনাই পরা সুন্দর একটা মেয়ে খোঁপায় অজস্র বুনোফুল মাথায় একপাশে বসে সূতা কাটছে। চরকার ঘ্যানর ঘ্যানর শব্দ ক্রমশঃ যেন ছোট কুমারকে আকর্ষণ করছে। তার চোখ দুটি ব্যাকুল প্রত্যাশায় চিক্ চিক্ করে উঠলো—। সে কাছে গিয়ে বললো— ওগো সুন্দরী আমাকে কি একটু পানি দেবে ?

— বা। দেবনা কেন ? তুমি বসো। মেয়েটি ফিক করে হেসে ভেতরে চলে গেল। হায় ! ছোট কুমারের মন বিষণ্ণতায় ভরে গেল। যে মেয়েটিকে দূর থেকে এত সুন্দর দেখছিলো তার সব ক'টি দাঁতই পোকায় খাওয়া। মেয়েটি পানি এনে দিল। ছোট কুমার পানি খেয়ে আবার পথ চলতে লাগল— যেতে— যেতে — যেতে —। অনেক পথ পেরিয়ে একটা পাড়ায় এসে পড়লো। কুকুরগুলি নবাগত অতিথিকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার জুড়ে দিলো —। ছোট কুমার প্রথমে একটা বাড়ীতে উঠে তামাক খেতে চাইলো। সেখানেও একটা মেয়ে পানি তুলছে—। তার রূপার অলংকারগুলিতে রিনি ঝিনি শব্দ হচ্ছে —। বুকের রিমাই ভেদ করে দেখা যাচ্ছে তার দেহ সৌষ্ঠব —। মসৃণ সিক্ত কুন্তল রাজি পিঠের উপর দুলছে —। কুমার ভাবলো চমৎকার মেয়েটি, এবার এখানেই থাকবো—। ওরা খুব আপ্যায়ন করলো। মেয়েটির বাবাকে বলল— আমি একটি সুন্দর মেয়ে খুঁজছি। যদি তেমন একটা মেয়ের সন্ধান পাই তাহলে ঘরজামাই হিসেবে থাকবো—। বুড়ো খুব খুশী হলো। মেয়ের বৌদিরা এনে দেখাল মেয়েটিকে— হা কপাল। ভাল করে দেখে ছোট কুমার দীর্ঘশ্বাস ফেললো। ভগবান, এতো ফরসা মেয়েটির চোখ একটা ট্যারা। ছি! ছি! এই মেয়ে সে বিয়ে করবে না—। কিছুক্ষণ পরেই সে বিদায় নিয়ে চলে গেল ....।

পাড়া শেষ হয়ে এলো প্রায় —। সূর্য অস্তাচলে। আবীরের রঙ গাছের শাখায় শাখায়—। পাখীরা নীড়ে ফিরে যাচ্ছে—। দিগন্তে রঙিন মেঘের ভেলা। ছোট কুমারের মন অবসাদে ভরে গেল। তার থুং এর কলাপাতায় মোড়া ভাতগুলো খুলে দেখলো পিঁপড়ে ধরেছে। সে রাগে দূর করে ফেলে দিলো।

সামনে একটা কলা বাগান। ছোট একটা মাচান ঘর। পাশে শাক্ সব্জীর বাগান। মাচানের উপর একটা মেয়ে শুকনো ধানগুলি তুলছে একটা ফার্লং এ—। এক মুহূর্ত মাত্র। ছোট কুমার থমকে দাঁড়াল। মেয়েটিও চমকে মুখ তুলে তাকাল। আহা। যেন স্বর্গের দেবী। চোখে বিদ্যুতের চমক। অনিন্দ্য সুন্দর মুখশ্রী—। চারপাশ তার রূপে আলোকিত—। ছোট কুমার অস্পষ্ট আবেগে ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকলো— এই শোনো।

মেয়েটি নিমেষে কলাবাগানের মধ্যে হারিয়ে গেল। ছোট কুমারের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি চার পাশে ব্যাকুল হয়ে একজনকে খুজতে লাগলো—। কোথাও না দেখে সে ঐ ঘরটার মাচানের উপর বসলো—। ঐ বাড়ীর মালিক কুশলাদি জিজ্ঞেস করলো— তখন চারপাশে আবছা অন্ধকার। আকাশে দু একটা তারা ঝিকমিক করছে—।

আশ্চর্য অবসাদে ছোট কুমার ক্লান্ত হয়ে গেল। তার তৃষিত ব্যাকুল হৃদয় একজন, কেবল একজনকে খুঁজতে লাগলো।

ঘরের বুড়ো লোকটিকে বললো, আজ রাতে আমি আপনাদের ঘরে একটু ঘুমোতে চাই। কাল ভোরে হাঁটবো আবার। কিন্তু আমার এই জিনিষগুলো একটু যত্ন করে রেখে দিন— ঐ বলে সে তার বেতের ছড়ি, থু, ছোট ফলটি আর ধারালো ছুরি খানা ভাল করে রাখতে বলে দিলো—।

খাওয়া দাওয়ার পরে ভালোভাবে থাকার ব্যবস্থা করে সবাই যে যার ঘরে ঘুমোতে গেল। রাত বাড়তে লাগলো—, ছোট কুমার শিয়ালের চিৎকার, বাঁদরের লাফালাফি, ঝিঁ ঝিঁ পোকার মিষ্টি গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লো—।

সকালে অদ্ভুত একটি প্রশান্তি নিয়ে সে ঘুম থেকে জাগলো, বৃদ্ধকে বললো— আমার জিনিষগুলি দিন, আমাকে যেতে হবে। — বৃদ্ধ ভিতরে গিয়ে দেখলো। কিছুই নেই—। বউরা রান্নার সময় ছড়িটা ভুলে চুলোয় দিয়েছে আর ফলটা রান্না করে ফেলেছে। ছুরিটাও হারিয়ে ফেলেছে—। ওটা পাওয়া যাচ্ছে না আর—। — ছোট কুমার ক্ষেপে উঠল। আপনারা আমার সব জিনিষ নিয়েছেন ভাল হবে না — সত্যি ভাল হবে না। হয় আমার জিনিষগুলি দিন নতুবা এ বাড়ীর মেয়েকে দিন।

বৃদ্ধের মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে। অতিথি ব্যাজার হলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়—। অগত্যা বড় শূকরের মাংস দিয়ে ভোজ দিলেন পাড়ার লোকদের। ছোট কুমারকে যাবার সময় একটা কলার মোচা (থোড়) হাতে দিয়ে বললো এই আমাদের এক মাত্র মেয়ে— কলাবতী—। খবরদার রাস্তায় এর পাঁপড়িগুলো খুলো না যেন।

ছোট কুমার খুব খুশী হলো। সে সবাইকে প্রণাম করে নাচতে নাচতে পথ চলতে লাগলো—। বেলা বাড়তে লাগলো। কৌতুহলে এক একটা পাঁপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে অবশেষে দেখলো, ঠিকই কলাবতী কন্যা। অপূর্ব আলো ছড়িয়ে সামনে দাঁড়িয়ে —।

সে ভয়ে বললো, কুমার আমার চেষ্টা পেয়েছে —। ছোট কুমার কলাবতীকে রেখে ছুটল পানির খোঁজে ....। অনেক দূরে ছোট ঝরনা — তির তির করে বয়ে যাচ্ছে তার ছোট্ট স্রোতোধারা স্বচ্ছ জল। পাতায় করে পানি নিলো কুমার —। এদিকে বেলা

ডুবু ডুবু। কলাবতী কন্যা ভয়ে অস্থির। সে একটা গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ালো—। সেখানে থাকতো এক ডাইনী বুড়ী—। সে দেখলো কলাবতীকে—। মুলার মতো দাঁত বের করে খানিকটা হাসলো।

—হি —হি—হি— তুই কে রে আমার আস্তানায় ?

—আমি ছোট কুমারের নতুন বউ।

—বটেরে তোকে আমি খাবো—।

—দোহাই আমাকে খাও। কিন্তু আমার দুটো ছোট আঙ্গুল ঐ ঝরনায় ফেলে দিও— ভয়ে কাঁপছে কলাবতী—ডাইনী কলাবতীকে খেয়ে বউ সেজে বসলো—। আঙ্গুল গুলি ফেলে দিলো ঝরনায়—। ছোট কুমার বউকে আঁজলা ভরে পানি খাওয়ালো—। তারপর বাড়ীতে নিয়ে এলো—। ছোট দুটি আঙ্গুল হয়ে গেল দুটো মাছ। একটার রং সোনালী— অপরটা রূপালী।

ঘরে অশান্তি। ছোট বউ এর সঙ্গে কেউ কথা বলে না। বিশ্রী ছোট বউএর মুখ— একে গাল পাড়ে—ওর সাথে ঝগড়া করে—। ছোট কুমার চিন্তায় চিন্তায় শুকিয়ে যায়—। প্রায় গভীর রাতে স্বপ্ন দেখে—। সেই ঝরনা। যেটা সবুজ পাহাড় বেয়ে নেমে এসেছে। সেখানে ছোট্ট একটা পাথরের কুয়ায় দুটো মাছ।

একদিন হাঁটতে হাঁটতে সেখানে গেল। স্নান করলো— আশ্চর্য দুটো মাছ। একটা সোনালী, একটা রূপালী। ছোট কুমারের কাছে যায়— ধরতে গেলে ছুটে পালায়—। ছোট কুমার তারপর থেকে প্রায়ই যায়, কুয়ার মধ্যে হাত ডুবিয়ে আদর করে ছোট মাছগুলিকে। মাছগুলি খেলা করে কুমারের সাথে—। ফিস্ ফিস্ করে বলে। ছোট কুমার, বলোতো আমরা কে— ?

— জানি না। বিষাদ কণ্ঠ বেজে উঠে ছোট কুমারের—। —আমরা কলাবতীর দুটো ছোট আঙ্গুল। ঘরে তোমার ডাইনী বউ—। ছোট কুমার কেন তুমি রাস্তায় কলার মোচা খুললে — ?

ছোট কুমারের চোখে জল—কেবল জল। সে জল ঝরনার সাথে মিশে যায়—। মাছগুলি খেলে, ছোটাছুটি করে সে জলে।

শোভা ত্রিপুরার সৌজন্যে প্রবন্ধটি চট্টগ্রামে প্রকাশিত গিরিনির্ঝর থেকে পুনর্মুদ্রিত। লেখিকা শোভা ত্রিপুরা।

চাকমা লোকসংস্কৃতি

চাকমাদের কাব্যিক প্রবণতা

চাকমারা সহজাত কাব্যগুণের অধিকারী। এদের কল্পনাপ্রবণ মন থেকে সুন্দর কবিতা, প্রেমের কবিতা ও গান জন্ম নেয়। নরনারীর প্রেম নিবেদন বিষয়টি চাকমা যুবক-যুবতীর কাছে চিরন্তনী আবেদন নিয়ে হাজির হয়। তাদের প্রেমের গানে নিম্নলিখিত গভীর ভাবমথিত আকুতি ফুটে ওঠে।

"উড়ন্ত পাখি গগনবিহারী হতে ক্ষান্ত হতে পারে, কিন্তু তুমি আমার গভীর প্রেম থেকে কোনদিন বঞ্চিত হবে না।"

চাকমাদের অনেক সুন্দর ঘুমপাড়ানি গান আছে যা গীতি-সুষমা ও অর্থব্যঞ্জনায় মধুময়। শিশুসন্তানকে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে মা ঘুম পাড়াচ্ছে ঃ

"কচি সোনা আমার, তোমার শরীর মিষ্টি আলুর পাতার চাইতেও নরম। বিড়ালের নখ ইক্ষুর পাতার চাইতেও ধারালো। আমার সোনামণি তার নখের আঁচড়ে তুমি আঘাত পাবে — তা তো আমি সইতে পারব না। লক্ষ্মী সোনা আমার, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো।"
চাকমাদের প্রবাদবাক্যগুলি অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত সরল ও বিদ্রূপপূর্ণ। প্রবাদগুলির অর্থ-গভীরতা ও ভাবসমৃদ্ধিতে চাকমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত। এই প্রবাদগুলি একদিকে যেমন সূক্ষ্ম রসসমৃদ্ধ, অপরদিকে বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন এবং বিচক্ষণতার প্রতিভূ।

চাকমা প্রবাদসমূহ

১. জ্ঞানী মানুষ সকলের চাইতে সেরা।

২. পরের ছেলে বরাবরই নোংরা, কিন্তু তোমার নিজের ছেলে সর্বদা পরিষ্কার।

৩. অভ্যাস দ্বারা মানুষ পারদর্শিতা লাভ করে।

লোকসাহিত্য

চাকমা সাহিত্যের কোনো পাণ্ডুলিপি বা মুদ্রিত পুস্তক নেই। কিন্তু চাকমাদের লোকসঙ্গীত, লোকগীতি ও লোকসাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ যা যুগ যুগ ধরে মৌখিক স্তরে বিরাজ করে আসছে। চাকমাদের বারমাসী গান, পালাগান, প্রণয়মূলক গান, উবাগীত (প্রণয় গান), ঘুমপাড়ানি গান, ছেলে-ভুলানো ছড়া, গল্প, ধাঁধা ইত্যাদি লোকসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। চাকমাদের ইতিহাসমূলক পালা গান 'গেংখুলী' ঐতিহ্যবাহী কাব্যিক

উপকরণ। বিবাহ এবং বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে গায়করা চাকমাদের অতীত কাহিনী গানের মাধ্যমে শ্রোতাদের সামনে পরিবেশন করে। বেহালা সহযোগে এই বর্ণনামূলক গান পরিবেশিত হয়ে থাকে। শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শোনে। চাকমা গ্রামে-গঞ্জে এখনো 'গেংখুলী' পালা-গানের মহড়া দেখা যায়।

কতিপয় চাকমা লোকসাহিত্যের বিশেষ নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হল—

(১) গেংখুলী ঃ এটি বিশেষ ধরনের চাকমা গীত। এতে চাকমাদের প্রাচীন কাহিনী বর্ণিত হয়।

(২) ছাতিগাং ছড়াপালা ঃ (চিটাগাং ত্যাগের কাহিনী) এটি একটি বর্ণনামূলক গীতি কবিতা। চাকমারা কোনো এক সময় কোনো কারণে — চিটাগাং ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। দেশত্যাগের করুণ কাহিনী এই পালায় বর্ণিত। পালাটি অতি প্রাচীন। প্রাচীন চাকমা রাজা সারমাত্যের আমলে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে পালাটি লিখিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে।

(৩) গোজেন লামা ঃ চাকমাদের প্রার্থনা । 'গোজেন' শব্দের অর্থ গোঁসাই। বুদ্ধদেবের প্রার্থনা এই গ্রন্থের মূল বিষয়। লামা শব্দের অর্থ ঈশ্বর সূত্র। গুরুর মাধ্যমে বুদ্ধদেবের কাছে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভের জন্য প্রার্থনা জানানো হয়। গোজেন লামার রচয়িতা উদাসী শিবচরণ চাকমা। কোনো কোনো লেখক শিবচরণকে কাপ্তাই-নারেই পাহাড়ের অন্তর্বর্তী এক গ্রামের বাসিন্দা বলে অনুমান করেন। তিনি অষ্টাদশ খ্রিস্টাব্দে গোজেন লামা রচনা করেন বলে বলা হয়েছে। এটি সাতটি লামায় বিভক্ত।

(৪) আগরতারা ঃ এটি চাকমাদের প্রাচীন ধর্মীয় শাস্ত্র। ধর্মশাস্ত্রটি অপভ্রংশ পালি ভাষা ও বর্মী ভাষায় গদ্যে-পদ্যে লিখিত হয়েছিল। আগরতারার সংখ্যা ছাব্বিশটি। প্রাচীনকালে বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় আগরতারা পাঠ করা হত। এই তারা চাকমা রাজা সাদেং গিরির সময় রচিত হয় বলে অনুমিত।

কেউ কেউ মনে করেন চাকমাদের ব্রহ্মদেশে বাসকালে এগুলি রচিত হয়। আগরতারা ১০০০ বছর আগে রচিত হয়েছিল বলা হয়।

রাধামণ ও ধনপতিপালা

এটি একটি বর্ণনামূলক দীর্ঘ গীতি-কবিতা। চাকমাদের প্রাচীন রাজা সাদেংগিরির

স্ত্রী কপুতীর কন্যা ধনপতির জীবনের উপাখ্যান এই পালার উপজীব্য।

বারমাসী

বিবিধ কাহিনীকে নিয়ে বারমাসী গান রচিত। গিরিকুঞ্জবাসী যুবক-যুবতীদের প্রণয়ঘটিত কাহিনীও এ গানের অন্যতম উৎস। বিভিন্ন ঋতুতে নর-নারীর বিরহ-বেদনা ও মিলনং আকাঙ্ক্ষার করুণ গীতিমাল্য হচ্ছে বারমাস বা বারমাস্যা। এই বারমাসী 'মেয়াবী', 'কির্য্যাবী' ও 'তান্যবী' ইত্যাদি নামে পরিচিত। নমুনাস্বরূপ এখানে একটি বারমাস্যার উদ্ধৃতি দেওয়া হল—

মেয়াবী বারমাস্যা

প্রথম বৈশাখ মাস দেবা গল্য কালা
আমারে ছাড়ি মেয়া কারে দেখ ভালা,
তুমি ছাড়িলে মেয়া আমি না ছাড়িব;
রাত্রিকালে নিদ্রা গেলে স্বপনে দেখিব।
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে মেয়া গাছে পাকে আম,
মন কয় গলায় কলসী বাঁধি জলে দিতাম ঝাম।
ঝম্প দিয়া তেজেদুং বন্ধুহী জীবন,
তোমা বিনা মেরা অন্ধকার এই তিন ভুবন ....

ইত্যাদি

তল্লিক শাস্ত্র ঃ এটি একটি রোগ নির্ণয়ের পুস্তক। এটিকে নিদানতত্ত্বও বলা হয়। বনের লতাপাতা ও ধাতু থেকে কিভাবে ওষুধ তৈরী করা হয়, এই সমস্ত নির্দেশ তল্লিক শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। তল্লিক শাস্ত্র পাঠ করলে রোগবিদ্যা (Pathology) বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা যায়।

উবাগীত ঃ প্রণয় সঙ্গীত। গীতিময় উবাগীতে প্রেমিক-প্রেমিকার চিরন্তন ও হৃদয়মথিত প্রেম ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে।

মন্ত্র-সাহিত্য (যাদুমন্ত্র) ঃ চাকমাদের অন্তর-জীবনে মন্ত্র-সাহিত্যের (যাদুমন্ত্র) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মন্ত্র-সাহিত্যকে লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা বলে অনেক গবেষক মনে করেন। চাকমা সমাজের মন্ত্র-সাহিত্যের অন্যতম শাখা লোকচিকিৎসা

এবং মন্ত্রতন্ত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এদের তন্ত্রমন্ত্র (black magic) বলতে ভোজবাজি, সম্মোহন ও যাদুবিদ্যাকে বোঝায়। রোগ নিরাময়, প্রিয়জনদের মন জয় করা প্রভৃতি বিষয়ে এরা তন্ত্রমন্ত্র বা তুকতাক কৌশল প্রয়োগ করে থাকে। দেবদেবীর পূজার মাধ্যমে রোগ নিরাময় হয় এমন বিশ্বাস এদের রয়েছে। ত্রিপুরী ও অন্যান্য উপজাতীয় সমাজেও এ রকম পদ্ধতি প্রচলিত আছে। চতুর্বেদের শেষতম অথর্ব বেদের ব্রাত্য অনুচ্ছেদে এ জাতীয় তন্ত্রমন্ত্র ও যাদুবিদ্যার উল্লেখ রয়েছে। এই মন্ত্রতন্ত্রের প্রয়োগ করে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা এবং শত্রুর দেহে রোগ চালান দেওয়া হয়। অথর্ববেদে উল্লিখিত তন্ত্র ও যাদুবিদ্যা এ যুগের উপজাতীয় সমাজের লোকমন্ত্র সাহিত্যের সমতুল। 'যুগকালাম' এবং 'ফগিরি কালাম' নামে দুটি বৃহৎ আকারের গ্রন্থ চাকমাদের বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যোগ অভ্যাসের মাধ্যমে মানবদেহকে কীভাবে সুস্থ এবং সবল রাখতে হয় তার বিশদ বিবরণ এই গ্রন্থদ্বয়ে বিধৃত। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থদুটিতে তান্ত্রিকতার প্রভাব প্রতিফলিত। পূজা বা রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের চাকমারা 'বৈদ্য' বলে থাকে। চাকমা সমাজে 'বৈদ্য'র মান খুব উঁচু। সবাই বৈদ্যকে সম্মান জানায়। প্রতিটি গ্রামে কয়েকজন বৈদ্য থাকে। বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হলে তাদের ডাকা হয়। কোনো ব্যক্তি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হলে 'বৈদ্যরা' পশু বলি দিয়ে অলৌকিক শক্তির সাহায্যে চিকিৎসা করে থাকে। চাকমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, পশুর রক্তের বিনিময়ে দেবদেবীরা অসুস্থ ব্যক্তির শরীর থেকে রোগ নিয়ে যায়। সুতরাং দেবদেবীদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য পশুবলি দিতেই হয়।

সম্মোহক মন্ত্র

(সম্মোহনের জন্য ফুলপড়া)

উং উত্তরেত্তুন আনিলুং ফুল
নাঙে নিরঞ্জন,
গোরখ নাথে দিল ফুল
গরিলুং যত্তন।
দেলে তরে
না দেলে মরে,
সাত গাঙ সাজুরি
ফলনার দ্বিচরণত্ পড়ে।
উং স্বাহাঃ পুয়াঃ।

বঙ্গানুবাদ ঃ উত্তর থেকে এনেছি যে ফুল, তার নাম নিরঞ্জন। গোরক্ষনাথ দিয়েছে এই ফুল। তা যত্নে রেখেছি। দর্শনেই প্রাণরক্ষা পায়। অদর্শনে হয় মৃত্যু। সাত নদী সাঁতার কেটে ফলনার (যার উদ্দেশ্যে মন্ত্রটি জপ করা হয় তার নাম) দুটি চরণে নতজানু হয়। উং স্বাহাঃ ফুঃ।

পরিশুদ্ধি মন্ত্র (গাঙ পূজা)

জুরো ছড়া জুরো পানি।

দেরে গঙা মা দেরে পানি।

অবুজ মানেই শুদ্ধ গরঙ

শুদ্ধগরি পাধাং ঘর

মর নাম শিব শঙ্কর।

বঙ্গানুবাদ ঃ ছোট পাহাড়ী নদীর জল শীতল। গঙ্গা মা, আমাকে তুমি জল দাও। প্রবাহিত স্রোত থেকে তুলে নেব জল। গঙ্গা মা আমাকে তুমি জল দাও অবোধ মানুষকে শুদ্ধ করি। শুদ্ধ করে গৃহে পাঠিয়ে দিই। আমার নাম শিব শঙ্কর। উং স্বাহাঃ ফুঃ।

শিল ভাঙি পাথর গরঙ

পাথর ভাঙি দর্যা গরঙ

দর্যা পানি হুজে তুলং

সুজং নালে ভরং পানি

অবুজ মানেই শুদ্ধ গরঙ

শুদ্ধ গরি পাধাঙ ঘর

মর নাঙ শিব শঙ্কর

উং স্বাহাঃ পুয়া।

বঙ্গানুবাদ ঃ শক্ত পাথর ভেঙে গড়ে তুলব সমুদ্র। পদচিহ্নে ভরে তুলব জল। প্রবাহিত স্রোত থেকে তুলে নেব জল। অবোধ মানুষকে শুদ্ধ করি। শুদ্ধ করে গৃহে পাঠিয়ে দিই। আমার নাম শিব শঙ্কর। উং স্বাহাঃ ফুঃ।

চাকমাদের জাতীয় চরিত্র

অন্যান্য উপজাতির মতো চাকমারা সরলপ্রাণ, সৎ ও দয়াবান। স্বভাবে এরা পরিণামদর্শী নয়। কোনো কিছুতে এরা দ্বিধাগ্রস্ত ও সক্রিয় নয়। সরল জীবন যাপন

করতে ভালবাসে— বাহ্যিক আড়ম্বর এদের নেই। অপরের অধীনতাকে এরা কম পছন্দ করে। আবার এরা পরিশ্রমী এবং উদ্যোগী হয়ে কাজে অগ্রসর হতে পারে। এরা হঠাৎ করে রেগে যায় না। এরা সহজে উত্তেজিত হয় না, ক্ষিপ্ততাও এদের স্বভাববিরোধী। তবে খুব আত্মবিশ্বাসী। চাকমারা সৌন্দর্যপ্রেমী। এরা পুষ্পপ্রেমী। এদের সৌন্দর্যজ্ঞান সুবিদিত। চাকমারা জুমখেত সুন্দর করে তোলার জন্য গাঁদা ফুল ও অন্যান্য ফুলগাছ লাগিয়ে দেয়। চাকমা যুবতী ও কিশোরী ফুলের অলংকারে নিজেদে র সাজিয়ে আকর্ষণীয় করে তোলে।

চাকমা সমাজে উল্লেখযোগ্য কোনো নাচ বা গান প্রচলিত নেই। তবে যুগসঞ্চিত জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে তারা আঁকড়ে রেখেছে। অন্যান্য উপজাতিদের মতো চাকমারাও অসীম ধৈর্য্যের অধিকারী নয়। সময় সময় এদের কর্তব্যে শৈথিল্য এসে পড়ে। তাই গুরুত্বপূর্ণ কাজে এদের সাফল্য আসে না। বিশেষ করে ব্যবসা বাণিজ্যে এরা সফলতা অর্জন করতে পারে না সেই একই কারণে।

চাকমা রমণীদের যথেষ্ট স্বাধীনতা রয়েছে— তবে এরা উচ্ছৃঙ্খল জীবনে অভ্যস্ত নয়। চাকমাদের মান-মর্যাদার জন্য চাকমা সমাজ খুব সচেতন। চাকমা রমণীরা স্বামীদের সঙ্গে জুমচাষ থেকে আরম্ভ করে সব কাজে সহযোগিতা করতে সক্ষম। ঘরকন্না এবং সন্তান পালন প্রভৃতি কাজের মধ্যে নিজেদের নিয়োজিত করেও পুরুষদের সঙ্গে ঘরের বাইরের কাজ করা কম কৃতিত্বের কথা নয়। চাকমারা অত্যন্ত অতিথি পরায়ণ। অতিথিসেবায় এরা কোনোদিন বিরক্তি প্রকাশ করে না।

ব্যাং ও সুদত পাখীর গল্প (চাকমা লোককথা)

এক খচ্ছুয়া ব্যাং (এক জাতীয় ছোট ব্যাং) আর এক সুদতটুপি (এক জাতীয় ছোট পাখি) পাখির মধ্যে খুব বন্ধুত্ব হয়। একদিন খচ্ছুয়া ব্যাং শহর থেকে ফিরে আসছে এমন সময় সুদতটুপির সঙ্গে দেখা। সুদতটুপি ব্যাংকে বললে, "আচ্ছা বোন, তুমি যে শহরে গিয়েছিলে তা কি খবর নিয়ে এলে সেখান থেকে বলো।।" খচ্ছুয়া ব্যাং বললে, 'বন্ধু, সংবাদ তো বড় ভয়ানক!' সুদতটুপি জিজ্ঞাসা করে, 'কি সংবাদ?' ব্যাং বলে, "বন্ধু রে কয়না এমন তুফান জানি হবে, মাটির ভেতরে কয়াং আলু (বুনো আলু) তিন-চার টুকরো করবে। এক গাছের ছাল আর এক গাছে নেবে, আর বুড়া মানুষের 'উল' (অণ্ডকোষ) ছিঁড়ে নেবে আর পরমা মিলার (সন্তানবতী মায়ের) 'দুধ' ছিঁড়ে নেবে। আমি তো একটা বাঁশের চোঙা পেলে তাতে ঢুকে থাকতে পারবো। নিজের জন্যে আমার চিন্তা নেই। যত চিন্তা তোমার জন্যে। তুমি কোথায় থাকবে?"

সুদতটুপি সব কথা শুনে বললে, "তুমি একটা যুক্তি দাও না বন্ধু, কোথায় থাকবো, কি করবো ?"

ব্যাং বললে, "তুমি এক কাজ করো— যখন তুফান কিছু কিছু আসতে আরম্ভ করবে তখন তুমি পূব দিকের বড় পাহাড়ে চলে যেও। সেখানে দেখবে একটা রবাং পাখি একটা গাছে হাঁ করে বসে আছে হাওয়া খাওয়ার জন্যে। তুমি তার মুখ দিয়ে ঢুকে পেছন দিয়ে বেরিয়ে পড়বে।"

তারপর একদিন তুফান শুরু হল। বন্ধুর পরামর্শ মত সুদতটুপি পূবের বড় পাহাড়ের দিকে উড়ে গিয়ে দেখে সত্যি একটা বড় রবাং একটা গাছে হাঁ করে বসে আছে। সুদতটুপি আর দেরী না করে বন্ধুর কথামত কাজ করলো। রবাং পাখি তাতে ভয় পেয়ে বরাং করে ডাক দিয়ে উঠলো। একটা বানর সে সময় একটা লাউ নিয়ে গাছে উঠছিল। রবাংএর ডাক শুনে ভয়ে তার লাউ গেল পড়ে। গাছের নিচে ছিল এক হরিণ। লাউটি হরিণের পিঠে পড়তে সে ভয়ে দৌড় দিলো। দৌড়তে গিয়ে এক সাপের গায়ে তার পা পড়লো। কোমরে চোট খেয়ে সাপ কোনো দিকে বেশি যেতে পারে না। ক্ষিধের চোটে সে অরলী নামে পিপড়ের ডিম ফেললে খেয়ে। অরলী রাগের চোটে কেন্যা নামে শূকরের অণ্ডকোষে দিলে কামড়। শূকরের অণ্ডকোষ ফুলে গেল। সে বেশি চলাফেরা করতে পারে না বলে জঙ্গলের মধ্যেই জলের ধারে বিধবার ধান খেত থেকে ধান খেতে সুরু করলে। বিধবা রাগের চোটে রোজ রাতে একটা গাছের গোড়ায় বাড়ি মারে আর চেঁচায়। রোজ মার খেয়ে গাছের গোড়া গিয়ে রাজার কাছে নালিশ করলো বিধবার নামে।

রাজা পেয়াদা-পাইক পাঠালেন বুড়ীকে ধরে আনবার জন্যে। বুড়ী এসে বললে, "আমি বিধবা মানুষ, অতি কষ্টে একটু জুম করেছি। সেই জুমের ধান রোজ রাতে খেতে আসে কেন্যা। তাকে তাড়ানোর জন্যে আমাকে বাড়ি দিতে হয় গাছে।' তখন ডাক পড়লো কেন্যার। রাজা ধান খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করতে কেন্যা বললে, "মহারাজ, অরলী আমার অণ্ডকোষে কামড় দেওয়ায় আমি বেশি দূরে যেতে পারি না বলেই বুড়ীর ধান খাই নতুবা ক্ষিধের জ্বালায় জীবন যায়।"

অরলীকে ডাকা হলো। রাজার প্রশ্নের জবাবে অরলী বললে, "মহারাজ, সাপ আমার ডিম খেয়েছে দেখে রাগে আমি কামড় দিয়েছি।" রাজা তখন সাপকে ডাকালেন। সাপ বললে, হরিণ তার কোমরে 'পাড়া' দিয়েছে বলে সে চলতে পারে না, ক্ষিধের জ্বালায় অরলীর ডিম খেয়েছে।

হরিণের ডাক পড়লো তখন। রাজা বললেন, 'তুমি সাপের গায়ে 'পাড়া' (পা) দিয়েছ কেন ?" হরিণ বললে, "বানর, আমার গায়ের উপর লাউ ফেললে আমি ভয়ে

পালাতে গিয়ে হঠাৎ সাপের গায়ে পাড়া দিয়েছি। ইচ্ছা করে পাড়া দিইনি। বানর কেন আমার পিঠে লাউ ফেললে তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে বিচার করুন মহারাজ।"

বানরকে ডাকা হলো। রাজার প্রশ্নের জবাবে বানর বললে, "মহারাজ, আমি একটা লাউ নিয়ে গাছে উঠছিলাম এমন সময় রবাং পাখি হঠাৎ ডাক ছাড়ায় লাউটা ফস্কে পড়ে যায়। রবাং হঠাৎ কেন চিৎকার দিলে মহারাজ আগে তার বিচার করুন। সে যদি চিৎকার না করতো আমার লাউ তাহলে পড়তো না"

রবাং পাখিকে ডাকা হলে সে বললে, "আমি একটা গাছে বসে হাঁ করে হাওয়া খাচ্ছিলাম। এমন সময় সুদতটুপি হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে ঢুকে পেছনে দিয়ে বেরিয়ে যেতে আমি আচমকা ভয় পেয়ে ডাক দিয়েছিলাম। আগে সুদতটুপির বিচার করুন মহারাজ।"

তখন ডাক পড়লো সুদতটুপির। রাজার জিজ্ঞাসায় সুদতটুপি তার বন্ধুর কাছে যা শুনেছিল সব কথা বললে। রাজা সব শুনে খচ্ছুয়া ব্যাংকে বেঁধে আনার হুকুম দিলেন। রাজার লোক গিয়ে খুঁজতে খুঁজতে একটা বাঁশের চোঙায় তাকে পেয়ে বেঁধে নিয়ে এল রাজার কাছে। রাজার হুকুমে তাকে আচ্ছা করে মার দেওয়া হল। সেদিন থেকে কেন্যা বিধবার ধান খাওয়া বন্ধ করে দিলে। বিধবাও গাছের গোড়াকে মারা বন্ধ করলে। এদিকে মার খেয়ে খচ্ছুয়া ব্যাঙের পিঠের চামড়া ফোড়ার মত ফুলো ফুলো হল।*

চাকমা ছড়া

চাকমা ছেলেমেয়েরা খেলাধুলার সময় নানা ছড়া কাটে। খেলার গানও গায় খেলতে খেলতে। এখানে সেরকম দু'একটি ছড়া উদ্ধৃত হল।

ছেলেদের ছড়া ঃ

মোইলা ঘরত পৈলা যায়।
কুরা-এ্যা ভাগিনা খায়।।
বদা খলা দুধ মিধা।
পাগানা কলা বিলি পদা।।

প্রথম মামার বাড়িতে গেলে ভাগ্নেকে মামা খুবই যত্ন করে। মুরগীর মাংস, ডিম, দুধ, গুড়, পাকা কলা ও বিনি চালের পিঠা খাওয়ায়।

খেলার ছড়া ঃ ছেলেমেয়েরা পরস্পরের পিঠে হাত রাখে চিমটি কাটার ভঙ্গিতে আর

* শ্রীবিন্দুলাল কারবারী কর্তৃক সংগৃহীত।

এই ছড়াটি সমস্বরে বলে ঃ

১)

কবাং যাং কষা ষাং।

নোয়া জুমৎ বা যাং।।

চাকনা খাং ঘিলুক খাং।

ফগ্‌রা কাবি রিবাং খাং।

হা—বা—বা—বা।।

এইভাবে দাঁড়ানোর ভঙ্গি হল দোলনায় দোল দেওয়ার মত। দোলনার চার কোনার চারটি দড়ি ধরে সামনে-পেছনে ঝাঁকানির দোল দেওয়ার মত তাদের হাত উপরে উঠানামা করে। মুখে বলে নতুন জুমে গেলে তারা কাঁকড়ার ঘিলু ও ফগরা গাছের সার খাবে।

২)

টেং টেং রোরি টেং টেং রোরি (ফড়িং)

বারা বনে বারা বান।(টেঁকিতে পাড় দে)

কার্য্যা চোল ভাত দুইব্যা রান।(দু'বার কাড়া চালের ভাত রান্না কর)

রান্দে রান্দে চাম্পা ফুল (রাঁধতে রাঁধতে চাঁপা ফুল হয়)

চাম্পা ফুল তলে

দুইব্যা হরিণ লড়ে (দু'টি হরিণ নড়ে)

হরিণ নয় চগুরা।

চলা লোদি বোমরা।।(চলা পাতায় ভোম্‌রা)

ধাঁধা ও প্রবাদমালা

চাকমা সাহিত্য গান, ছড়া, গল্পের মত ধাঁধা এবং প্রবাদেও সমৃদ্ধ। এগুলি শুধু তাঁদের অবসর বিনোদনের স্মৃতিমাত্র নয় ; চিত্তের সরসতা, প্রতীক-প্রবণতা ও উপস্থিত বুদ্ধির বেশ পরিচয় পাওয়া যায় এগুলি থেকে। চাকমা ভাষায় ধাঁধার অর্থ হল 'বানা'। এখানে উত্তর সহ কিছু ধাঁধা সঙ্কলিত হল।

খাইদে গুলাক্কুন্ বুধু নেই ঃ ডিম।

মা কান্‌দে পোঙা ডাঙর অয় ঃ চরকা।

(মা কাঁদে, পোলা বাড়ে)

উরি উরি যায়, ধরি না পায় (উড়ে উড়ে যায়, ধরা যায় না)	ঃ	বাতাস।
বড্ কলগত্ সুদা ফুদে এঘর বেটী ঐ ঘরে যায়	ঃ	আকাশের তারা।
ভেরাক বুরুক চাবর খায়	ঃ	ধান ঝাড়ার কুলা।
রাঙা রাদল্যা ঘর বেড়ায়	ঃ	রাঙা পোষাক-পরা ভিক্ষু।
লুদি তান্যে মোন গুজুরে	ঃ	খেং গরং।
সরত্ আগুন্ বাড়্যে কোন্ বাদাত ডাক পর্য্যে	ঃ	হুঁকা।

প্রবাদ

চাকমা প্রবাদের সংখ্যা রীতিমত বিস্ময়কর। এইসব প্রবাদের মধ্যে দিয়ে তাঁদের বৈষয়িক বুদ্ধি, সাংসারিক জ্ঞান, রসবোধ ও মার্জিত রুচির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও কোন প্রবাদ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও নিগূঢ় অর্থবহ। কিছু প্রবাদ অর্থসহ এখানে সঙ্কলিত হল। কোনও কোনও প্রবাদের সঙ্গে বাংলা প্রবাদের সাদৃশ্যও দেখা যায়। এগুলি বাঙালীর প্রভাবপুষ্ট হতে পারে।

প্রবাদ— মানুষ বুঝি পুগিয়ে কামাড়ায়।
অর্থ — বোকাকেই চালাক ঠকায়।

প্রবাদ— বিদেশত্ গেলে রাজার ঝিঅ বেদি অয়।
অর্থ — রাজকন্যাও বিদেশে গেলে বিদেশীরা তাঁর সঙ্গে সাধারণ স্ত্রীলোকের মত ব্যবহার করে।

প্রবাদ— ঝিরে মারি বৌরে শিখায়।
অর্থ — ঝিকে মেরে বৌকে শেখায়।

প্রবাদ — যে দেশত্ বৃক্ষ নেই সে দেশত্ এরন্ডা প্রধান।
অর্থ— যে দেশে বড় বৃক্ষ নেই সে দেশে এরণ্ডই বৃক্ষ বলে গণ্য।

প্রবাদ — যে কুকুরের লেজ বেঙা হাজার চুমাত ভরেলেও উজ্জ্বল না হয়।
অর্থ— দুষ্ট লোকের চরিত্র পাল্টায় না।

প্রবাদ— উলত্ নেই তেনা।

অর্থ — কোমরে নেই কাপড়।

প্রবাদ — মিডা গুলি ভাত খানা।।

অর্থ — মিষ্টি দিয়ে ভাত খায়।

প্রবাদ — সেদাম নে যার।
তিন মুখ তার।।

অর্থ — যার কাণ্ডজ্ঞান নেই তার তিন বৌ।

প্রবাদ — পানি নষ্ট ফেনা।
মানুষ নষ্ট কানা।।

অর্থ — ফেনায় নষ্ট জল।
কানায় নষ্ট মানুষ।

প্রবাদ — রাতা নেই দেশৎ।
কুরি এ ডাক করে।।

অর্থ — দেশে নেই মোরগ, মুরগী পাড়ে ডাক।

প্রবাদ — ঠাখুরে খেলে চ্যং।
কারগায় খেলে ভাত।।

অর্থ — ঠাকুর বা বৌদ্ধ ভিক্ষুরা আহার করলে বলে 'চ্যং' আর কারগা অর্থাৎ তাদের সেবকরা আহার করলে বলে ভাত।

কোনও কোনও প্রবাদের মূলে আছে সরস কোন জনশ্রুতি। যেমন এক পণ্ডিত সব সময়েই তার পাণ্ডিত্য জাহির করে বেড়াতো। সে সব শুনে একজন ভাবলো যে, পণ্ডিত তো সব সময় পাণ্ডিত্য জাহির করে সুতরাং তারও কিছু বলা দরকার। সে তখন বললে —

কথা নেই কদোকি, ম মোক্কোয়া পেদলী।

অর্থাৎ কথা কিছু বলবার নেই তবুও পণ্ডিত। আমার স্ত্রী গর্ভবতী।

নেই মোক্ চেলে কান্ মোক্ ভালা।

সবাই ন পাদে রাজা ঝী ভালা।।

অর্থাৎ, স্ত্রী একেবারে না থাকার চেয়ে কানা স্ত্রীও ভাল। আর কোন স্ত্রী না পাওয়ার চেয়ে রাজকন্যাও ভাল। সাধারণ লোকের রাজকন্যা বিয়ে করার মানে তার দাস হওয়া কিন্তু একেবারে স্ত্রী না থাকার চেয়ে রাজকন্যার দাস হওয়াও ভাল।

ঝবুর গাছদ্ কই কুরে।
সদরবো পারা না জুরে।।

ঝোঁপঝাড়ে পাখি ডাকে।	আপনজন ছাড়া জুড়ায় না।
পথৎ পেলাম কামার।	পথে পেলাম কামার।
দা গড়িদে আমার।।	দা গড়ে দে আমার।।

বিজু নৃত্য (চাকমা)

চাকমা নরনারী অত্যন্ত আনন্দপ্রিয়। নাচ ও গান এদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মতো চাকমারা চৈত্র-সংক্রান্তির উৎসব পালন করে থাকে। বছরের শেষে পুরাতন বছরকে বিদায় ও নূতন বছরকে স্বাগত জানাবার রীতি প্রচলিত আছে। বিজু নৃত্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে বাঁশির সুরে সুরে পরিবেশিত হয়। চাকমাদের বর্ষবরণ-উৎসব তিনদিনব্যাপী হয়। বর্ষবরণ উৎসবের সময় চাকমা যুবতীরা দলবদ্ধ হয়ে নৃত্য পরিবেশন করে থাকে।

উপসংহার

বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থে রাজ্যে বসবাসকারী বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রচলিত সব ক'টি নৃত্যধারার পরিচিতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নৃত্যধারা এখনো লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছে — হয়তো বা চর্চার অভাবে বিলুপ্তির গর্ভে নিমজ্জিত। অথচ এই সমস্ত নৃত্যধারা রাজ্যে মিশ্র সংস্কৃতি গঠনে অপরিহার্য উপাদান।

দ্বিতীয়তঃ লোক-নৃত্যধারাকে জনপ্রিয় ও উন্নতমান দিতে হলে নৃত্য-কর্মশালা পরিচালনার মাধ্যমে জাতীয় স্তরে রূপান্তরিত করা দরকার। ত্রিপুরার আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত কতিপয় নৃত্যধারা — যেমন হজাগিরি নৃত্য (কলসী নৃত্য), গড়িয়া নৃত্য, বিজু নৃত্য এবং চের নৃত্যগুলিকে জাতীয় স্তরের নৃত্য ধারারূপে উন্নত করা যায়। তার জন্য প্রয়োজন চিরপ্রচলিত নৃত্যের মুদ্রা ও সাজসজ্জার নবীকরণের কৌশলী পরিকল্পনা। রাজ্যে লৌকিক নৃত্য ও ধ্রুপদী নৃত্যধারার যাঁরা ধারক ও বাহক, তাঁরা এবিষয়ে এগিয়ে এলে ত্রিপুরার নৃত্য-কলা বিকাশ লাভ করতে পারে।

চাকমা রমণীর অলংকার

চাকমা মহিলারা রকমারি অলংকার পরতে ভালবাসে। সোনা ও রূপার উভয় ধরনের অলংকার তারা ব্যবহার করে। হাতে বালা, অনন্ত, গলার হার এবং কানে

ছোটবড় ধরনের মাকড়ি (কানের গহনা) পরে। হস্তিদন্ত নির্মিত বালাও ব্যবহৃত হয়। চাকমা রমণীদের অলংকার সমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১. নাকফুল (নাকের অলংকার), এটি স্বর্ণ অথবা রৌপ্য নির্মিত। নাকফুলের রকমারি নকশা রয়েছে। নামও ভিন্ন ভিন্ন।

২. কানফুল (কানের অলংকার), এটি বঙ্গনারীদের ব্যবহৃত মাকড়ি সমতুল। এদের কানফুল তিন রকম। কাজা ফুল রাজ্জুর ও ঝুমুলি। প্রথম দু'টি দু'অংশে বিভক্ত, তৃতীয়টি কানের উপর অংশে পরা হয়। চতুর্থ ধরনের অলংকার নাদুং নামে পরিচিত।

৩. আলসোরা/অলসোরা (গলার হার)।

৪. চুড়ি, বালা বা কঙ্কণ ধরনের বিভিন্ন রকমের অলংকার। এ ধরনের অলংকার চার রকম। বালা, খাড়ু, শাখা এবং বাখি।

৫. থাতজ্যুর (অনন্ত)।

৬. অঙ্গুটি (আংটি)।

৭. পায়খাড়ু (পায়ের অলংকার)।

৮. মাথার অলংকার।

চাকমাদের বিজু উৎসব

আসামের বিহু, ত্রিপুরার বিষু, বাঙলার চৈত্র-সংক্রান্তির সমগোত্রীয় বর্ষবিদায় উৎসব চাকমাদের বিজু উৎসব। বর্ষবিদায়কে কেন্দ্র করে প্রত্যেক জাতি-উপজাতির সমাজে এই জাতীয় উৎসব পালনের রেওয়াজ প্রচলিত হয়ে আসছে অনাদিকাল থেকে। বিজু উৎসব চাকমাদের সামাজিক উৎসব। প্রকৃতপক্ষে বাঙলার সুবিদিত চৈত্র-সংক্রান্তি নামক বর্ষবিদায় উৎসবেরই সংস্করণ চাকমাদের বিজু উৎসব। তবু বিজু উৎসব বাঙলার চৈত্র-সংক্রান্তির অনুকৃত পর্ব বলে আখ্যা দিতে চাইছি না। কেননা উন্নত-অনুন্নত জাতি ও উপজাতির নিজস্ব সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান রয়ে গেছে। বিজু উৎসবও চাকমাদের নিজস্ব সামাজিক আচরণবিধি। এই উৎসব চাকমা সমাজে সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রতিপালিত হয়ে আসছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিজু উৎসব জাতীয় বর্ষবিদায় উৎসব শুধু ভারতের পূর্বাঞ্চলে পালিত হয় তা নয়— ভারতের পূর্ব-প্রতিবেশী রাষ্ট্র ব্রহ্মদেশ ছাড়িয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানান জায়গায় এ জাতীয় উৎসবের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা ছাড়াও মগদের অন্যতম শাখা বড়ুয়া সম্প্রদায়ও বিজু উৎসব পালন করে থাকে। ব্রহ্মদেশে 'জলউৎসব' নামক একটি আড়ম্বরপূর্ণ যে পার্বণটি

পালিত (Water festival) হয়ে থাকে তা চাকমাদের বিজু উৎসবের সমশ্রেণীর উৎসব। তবে বিজু উৎসবের প্রকৃতি যে একটু ভিন্নতর বা অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তা উৎসবের প্রকৃতি থেকে বোঝা যায়। কেননা বিজু উৎসব নিছক বর্ষবিদায় উৎসব নয়— এই উৎসবে বর্ষবরণের ডালিও সাজানো হয়। তাই বিজু উৎসব দ্বিমুখী উৎসব পার্বণ। একদিকে পুরাতনকে বিদায়, অন্যদিকে নতুনকে স্বাগত জানানো—এই দ্বিবিধ প্রকৃতির বিজু উৎসব চাকমা সমাজে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিজু উৎসব পালিত হয় চারদিন ধরে— পুরাতন বছরের শেষ দু'দিন এবং নূতন বছরের প্রথম দু'দিন। তবে বছরের শেষ দিনটিই বিজুর মূল উৎসব। এই দিনটিকে বলা হয় 'মূলবিজু'।

মূলবিজুর উৎসবের সূচনা হয় আগের দিন থেকে। প্রাক্-মূলবিজুর দিনটিকে 'ফুলবিজু' বলা হয়। এই বিভাজনে মূলত-হিন্দু বাঙালী ও ত্রিপুরী সমাজে পালিত চৈত্র-সংক্রান্তির চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায়।

চাকমাদের বিজু উৎসব পালনের সঙ্গে ত্রিপুরীদের বিষু উৎসব পালনের মিল রয়েছে। ত্রিপুরীরা চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে (বিষু উৎসব) বাল-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী সবাই প্রাতঃকালে স্নান সেরে নূতন পোষাক পরে গুরুজনদের প্রণাম করে আশীর্বাদ লাভের রেওয়াজ রয়েছে। চাকমারা একই নিয়ম পালন করে থাকে। ত্রিপুরীদের মতো চাকমাদেরও এ দিনে গৃহপালিত পশুদের বিশেষ করে গরু ও মহিষকে স্নান করিয়ে বন্য ফুল সংগ্রহ করে মালা গেঁথে পশুর গলায় ও শিং-এ পরিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ পরিলক্ষিত হয়। ঐ দিনে সাধারণতঃ কেউ পশুপাখি বধ করে না।

ফুলবিজুর দিনে অনেকেই নদী বা জলাশয়ের তীরবর্তী স্থানে প্রদীপ জ্বালিয়ে 'গঙ্গামা'কে প্রণাম জানায়। এই পার্বণের ভেতর চাকমাদের সরল ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে নিসর্গ পূজার নিদর্শন ফুটে ওঠে।

বিজু-দিনগুলিতে লোক-সংস্কৃতির উৎসব-অনুষ্ঠানও উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। নিঝুম মধ্যাহ্নকাল মুখর হয়ে ওঠে গিলা খেলা, নাদেং খেলা, বদাবদি (কুস্তি) খেলায়। জ্যোৎস্নারাত ফুটে উঠলে গুদু খেলা ও ফর খেলায় মেতে ওঠে চাকমারা।

মূলবিজুর দিনে শিশুদের খাবার ব্যবস্থা করার রীতি প্রচলিত আছে। ঐ দিনে শিশুরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে নানারকম পিঠা খেয়ে আনন্দলাভ করে। শহর অঞ্চলে সিরাপ, স্কোয়াশ, মিষ্টি, মোয়া, জিলাপি ও বিস্কুট ইত্যাদি দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। ঐ সময় প্রতি বাড়িতে 'পাচন' প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

তবে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিজু উৎসবের প্রকৃতিও বদলে যাচ্ছে। আধুনিক সমাজের সংস্কৃতিমেলা ও শিল্পমেলার অবয়বে বিজু উৎসব আধুনিক রূপ

পরিগ্রহ করেছে— বিশেষত শিক্ষিত চাকমা যুবক-যুবতীগণ— বিজু মেলাকে আকর্ষণীয় করার জন্য প্রাচীন খেলাধুলা ও কল্পতরু নিয়ে বিজু নৃত্য পরিবেশনার পাশাপাশি আধুনিক ভঙ্গিতে বিজু নৃত্য বিজু গীত, কবিতা আবৃত্তি, হস্তশিল্প প্রদর্শনী, নাট্যানুষ্ঠান ইত্যাদি সাংস্কৃতিক উপকরণসমূহকে উপস্থাপিত করে বিজু উৎসবকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। এতে বিজু উৎসবের সাংস্কৃতিক মূল্যায়নের শ্রীবৃদ্ধিও ঘটেছে।

গারো লোকসংস্কৃতি

গারোদের নৃত্য

গারোদের সামাজিক জীবনে নৃত্য ও পানীয় সঙ্গীতের পরিপূরক উপকরণ। এই প্রসঙ্গে বিশ্বখ্যাত নৃবিজ্ঞানী ডক্টর ভেরিয়ার এলুইন বলেছেন—অধিকাংশ উপজাতিদের সমাজে দ্বিবিধ নৃত্যরীতি প্রচলিত। একটি আনুষ্ঠানিক অপরটি বিনোদনমূলক।

আনুষ্ঠানিক (Ceremonial) নৃত্য শুধুমাত্র ধর্মীয় উৎসবে পরিবেশিত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বিনোদনমূলক (recreational) নৃত্য যুবক-যুবতীরা নিজেদের আনন্দ-বিধানের জন্য পরিবেশন করে থাকে। গারো সমাজেও এই দ্বিবিধ নৃত্য প্রচলিত আছে। গারো সমাজে ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। প্রতিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পর সামাজিক অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে। সামাজিক অনুষ্ঠানের শেষে পান-ভোজন, সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। গারো সমাজে প্রচলিত নৃত্যগুলির মধ্যে লোকনৃত্য, রণনৃত্য এবং আরো নানা উৎসব-অনুষ্ঠানে পরিবেশিত নৃত্যগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নেতা নির্বাচন (গানা), পশুবলির বেদীতে, বার্ষিক পূজা-পার্বণে এবং কৃষিকাজে অথবা মৃতব্যক্তির সৎকারে নৃত্য পরিবেশিত হয়ে থাকে। তাছাড়া গৃহপ্রবেশ ও যুবক-আবাস-উদ্বোধন উপলক্ষেও নৃত্য পরিবেশিত হয়ে থাকে।

গারোদের অধিকাংশ নৃত্যভঙ্গিমা পশুপাখির চলন ও ওড়ার ভঙ্গি থেকে অনুকৃত। প্রকৃতির বিভিন্ন ভাবমূর্তিও ফুটিয়ে তোলা হয় নৃত্যের মাধ্যমে।

গারো সমাজে প্রচলিত নৃত্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

গানানৃত্য (নেতা-অভিষেক নৃত্য)

গারো সমাজে নেতা বা প্রধান আনন্দময় নৃত্যের পরিবেশনার মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। প্রথমে নেতাকে আংটি পরানো হয়ে থাকে—আংটিই হচ্ছে নেতৃত্বের

প্রতীক। এই অভিষেক নৃত্যে পুরোহিতের নির্দেশে সমাজের গণ্যমান্য সবাই যোগদান করে থাকে। আংটি পরার পর নেতা সপত্নী নৃত্য পরিবেশন করে থাকে।

রণ নৃত্য

রণনৃত্য দলবদ্ধ নৃত্যবিশেষ। একসঙ্গে কুড়ি থেকে ত্রিশজন লোক একে অপরের পিছনে দাঁড়িয়ে পরস্পরের কোমর ধরে গোল হয়ে এক পায়ের ওপর ভর করে লাফাতে লাফাতে গান করতে থাকে। রণনৃত্যে যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করার জন্য মাদল ও পিতল নির্মিত ঘণ্টা বাজানো হয়। স্ত্রীলোকেরাও এই নৃত্যে যোগদান করে থাকে— তবে পুরুষদের কাছ থেকে অনতিদূরে সারিবদ্ধ হয়ে এক পায়ের ওপর ভর করে দু'বাহু প্রসারিত করে কখনো বা পরপর বাহু দুটি উর্ধ্বে প্রসারিত করে ঘুরে ঘুরে বাদ্যযন্ত্রের ঝংকারের তালে তালে নাচতে থাকে।

সাধারণত প্রতিটি নাচের দলে একজন দলপতি থাকে। দলপতি তরবারি এবং বর্ম হাতে নিয়ে কাই কাই সুর তুলতে থাকে। রণনৃত্যকে গারো ভাষায় গ্রিকা বলা হয়। দলপতিকে গ্রিকগিপা বলা হয়। এই নৃত্যকে নিঃসন্দেহে প্রাচীন যুগের যুদ্ধ-বিগ্রহের স্মৃতির রেশ হিসেবে দর্শকের সামনে শৌর্য-বীর্যের প্রতীক রূপে উপস্থিত করা হয়।

দোক্রু সোয়া নৃত্য

এই নৃত্য একমাত্র নারীদের দ্বারা পরিবেশিত হয়ে থাকে—পুরুষদের জন্য এই নৃত্য নিষিদ্ধ। এই নৃত্যে দুজন স্ত্রীলোক যোগদান করে। কপোত-কপোতীর প্রেম নিবেদন ও খাদ্য গ্রহণ-ভঙ্গিমা এই নৃত্যের মুদ্রার বিশেষত্ব। দুজন স্ত্রীলোক কপোত-কপোতীর মতো দুদিক থেকে নেচে নেচে এসে মুখোমুখী দাঁড়ায়। অতঃপর বাঁ হাত কোমরে রেখে ডান হাত মাটিতে হঠাৎ ছুঁড়ে দেয় ঠিক যেভাবে কপোতরা মাটি থেকে খাবার ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে খেয়ে থাকে। এই সময় পা দুটোকে পাখির পশ্চাদভাগের মতো বাঁকিয়ে রাখা হয়। যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে এই নৃত্য পরিবেশিত হতে পারে।

আমবারে রুরুয়া নৃত্য (কুলগাছ ঝাঁকানোর নৃত্য)

ফলন্ত গাছকে ঝাঁকুনি দিয়ে যেভাবে ফল পাড়ে, সেরকম ভঙ্গিমা এই নৃত্যে প্রদর্শিত হয়। নারীরাই এই নৃত্যে যোগদান করে। দুজনের বেশি এই নৃত্য পরিবেশনায় প্রয়োজন হয় না। নৃত্যের সময় একজন হঠাৎ নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে কম্পমান গাছ থেকে ঝরে পড়া ফলের ভঙ্গিমা নিয়ে নৃত্য করতে থাকে। অপর জন হঠাৎ নৃত্য বন্ধ করে দিয়ে ফল কুড়ানোর ভঙ্গিতে থমকে দাঁড়ায়। এই সময় সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের মহড়া যুগপৎ চলতে থাকে।

কিলপুয়া নৃত্য (কার্পাস রোপণ নৃত্য)

কার্পাস বপন কবতে হলে যেভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে হয়, ঠিক সেভাবে নৃত্যের তালে তালে নৃত্যরতা গারো রমণীরা সামনে ঝুঁকে পড়ার ভঙ্গি করে— মনে হয় মাটিতে গর্ত খুঁড়ে কার্পাস বীজ বপন করে যাচ্ছে। কিলপুয়া নৃত্য চৈত্র-বৈশাখ মাসে পরিবেশিত হয়ে থাকে। নৃত্য পরিবেশনের প্রাক্কালে পশু বলি দিয়ে নৃত্যের সূচনা করা হয়। ফসল বৃদ্ধির দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া মূল উদ্দেশ্য। পুরুষ-নারী নির্বিশেষে এই নৃত্যে যোগদান করে।

সঙ্গীত

উপজাতিদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গীত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাদের জীবন-বীণায় সপ্তসুর বাঁধা। সঙ্গীত ও নৃত্যকলা তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের মূল সুর। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত উপজাতীয় জীবনের এমন কোনো ঘটনা নেই যেখানে সঙ্গীত ও নৃত্যের সংযোজন নেই। সঙ্গীত ও নৃত্য, এ দ্বিবিধ কলাবিদ্যা আদিম সমাজের অনুশীলনীক্ষেত্র থেকে জন্ম নিয়েছিল তাও নয়। বরং বলা যায়, উপজাতীয় জীবনের মৌলিক প্রয়োজনের তাগিদেই সঙ্গীত ও নৃত্যের জন্ম। সঙ্গীতের সুর মূর্ছনায় জীবনের ঐন্দ্রজালিক মোহময়তা বিধৃত। এই যাদু মন্ত্র সঙ্গীতের মাধ্যমে জীবনে প্রতিফলিত হয়। তাই তাদের সঙ্গীত দেবদেবীর স্তুতি, প্রেমমিলনের ব্যাকুলতা অথবা দৈনন্দিন জীবনের আনন্দবেদনারই বহিঃপ্রকাশ। উপজাতীয় সঙ্গীতধারাকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়— যথা ধর্মীয়, সামাজিক এবং রোমান্টিক বা কল্পনারঙীন।

ধর্মীয় সঙ্গীত

জগৎপিতা, দেবদেবী এবং অপদেবতাদের প্রশস্তিমূলক গান, অনাবৃষ্টি, সুফসল, সংক্রামক ব্যাধি রোধ, শত্রুর বিনাশ এবং মৃতব্যক্তির আবাহনমূলক সঙ্গীতসমূহ ধর্মীয় সঙ্গীত পর্যায়ভুক্ত।

সামাজিক সঙ্গীত

জন্ম, বিবাহ ও ফসল কাটা এবং অন্যান্য সামাজিক উৎসবসমূহে পরিবেশিত সঙ্গীত-সমূহ এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

রোমান্টিক সঙ্গীত

প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের জন্য হৃদয়মথিত কামনা-বাসনা, রোমান্টিক সঙ্গীতে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। নরনারীর রোমান্টিক প্রেমসঙ্গীত অনেক সময় আধ্যাত্মিক-রসস্নাত

হয়ে ভগবৎপ্রেমে উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

গারোদের রোমান্টিক সঙ্গীত

দো দো গীতা বিদালিং আমাবা

রাউগিত পিলারি দোঙ্গাবা

সোকমা কিমারং মিতিং আমাসোঙ্গবা

জাপিং গিমবারিং বকগিন দোঙ্গা গোম্বা

কুচিল মন্দল বিবালিম দোঙ্গামোঙ্গবা

রিকগিল ওয়াত্রি বিজাকিম রাজামোঙ্গবা

বঙ্গানুবাদ

যুবতী পক্ষিণীর মতোই তুমি সুন্দরী

নিটোল অলাবু (লাউ) যেন তুমি তন্বী

তোমার বক্ষযুগল কৃশ মনোহর

তোমার উরু গিম্বারি বৃক্ষের মতো উজ্জ্বল।

তোমার ঠোঁট দুটি মন্দল ফুলের মতোই রমণীয়

তোমার চোখের পাতা বাঁশ পাতার মতো নয়নমনোহর।

ধর্মীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে গারোদের গীতি-বৈচিত্র্য বিশেষ লক্ষণীয়। গীতি-বৈচিত্র্য পুরোপুরি আধ্যাত্মিক-রস সম্পৃক্ত। হিন্দুদের বাউল সঙ্গীতে যেমন ভগবানের কাছে সর্বস্ব নিবেদন করার আকুতি অভিব্যক্ত হয়—এমনই একটি গারোদের আত্মনিবেদনমূলক সঙ্গীত নিচে তুলে ধরা হল— বলা বাহুল্য, এই সঙ্গীতের অর্থ পুরোপুরী রূপকার্থে ব্যবহৃত। গানের আক্ষরিক অর্থ প্রয়োগে প্রকৃত মর্ম উদ্ধার করা দুঃসাধ্য। এমনি একটি বাউল গীতিধর্মী গারোসঙ্গীতের একটি নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ—

আঙ্গা বাকুন্দা হিঙ্গা রামাক নুকজা

ভাঙ্গাবন না বীণা আংনে গতি হাংগান

না অজেক কারি আ

গুরু গো ভব পার নে বন্ধু ন

হাঙ্গানী চরণ তরণী

চরণ তরণী হিংনিয়া হাংতে পার গো

হাঙ্গানী চরণ তরণী

পার গাথে নে বন্ধু না হাঙ্গানী

গুরু গো ভব পার নে বন্ধু ন

হাঙ্গানী চরণ তরণী ।

বঙ্গানুবাদ

সম্মুখে অতল পারাবার

তব কৃপা বিনা

কেমনে হইব পার

হে প্রভু ! তুমিই আমার সহায়

তোমার খেয়াতরীই আমার আশা

তুমিই আমার শেষ পারানি

অতল পারাবার পার হব আমি

তুমি হও মোর খেয়াতরীর মাঝি ।

উপরি-উক্ত সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত ভাব আধ্যাত্মিক রসে মণ্ডিত। সঙ্গীতের প্রতিটি পঙ্‌ক্তি আত্মিক উন্নতি এবং আত্ম-সমীক্ষার প্রেরণার প্রবাহে স্পন্দিত। সমুদ্র, খেয়াতরী, সাগর প্রভৃতি শব্দ রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রূপকের সুষম প্রয়োগে উপজাতীয় সঙ্গীত গীতি-মাধুর্যে ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে।

যন্ত্রসঙ্গীত

গারোরা নানারকম বাদ্যযন্ত্র (যন্ত্রসঙ্গীত) বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাজিয়ে থাকে। এই সমস্ত যন্ত্র-সঙ্গীত নিজেরাই তৈরি করে। নৃত্য, সঙ্গীত ও উৎসব-অনুষ্ঠানে যন্ত্রসঙ্গীত অপরিহার্য। তাদের বাদ্যযন্ত্র প্রধানত ঢাক-ঢোল, বাঁশ ও শিং নির্মিত শিঙ্গা, ঘণ্টা ও করতালই উল্লেখযোগ্য। গামবিল নামক গাছ থেকে সাধারণত ঢাক বা মাদল তৈরি হয়ে থাকে। ঢাক বা মাদল শুধুমাত্র নিজেদের ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়। ঢাকের উভয় প্রান্ত গরুর চামড়া দিয়ে ঢাকা হয়।

গারোরা ৪ প্রকার ঢাক বা ঢোল ব্যবহার করে থাকে।

১। দামা ঃ দামার আকার মৃদঙ্গের মতো। লম্বা ও সরু— মাঝখানটা মোটা, দুই প্রান্ত ক্রমশ সরু—দামা কাঠের তৈরি এবং লম্বায় চার থেকে পাঁচ ফুট।

২। ক্রাম ঃ এই যন্ত্রটি দামার চাইতে আকারে বড়। কাঠের তৈরি। উভয় প্রান্ত গরুর চামড়া দিয়ে ঢাকা। ক্রামের আকৃতি মৃদঙ্গের মতো — একদিকে অপেক্ষাকৃত ছোট এবং অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত অনেক বড়। এই যন্ত্র একমাত্র ধর্মীয় উৎসব অথবা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বাজানো হয়। কিন্তু দামা যে কোনো উৎসবে বাজানো হয়। বিশেষ অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে এই যন্ত্র মালিকের বাড়ি থেকে বার করা নিষিদ্ধ— নতুবা মালিকের অমঙ্গল হয় বলে গারোরা বিশ্বাস করে।

৩। নাদিক ঃ কাঠের নির্মিত ক্ষুদ্র আকারের এক রকম ঢাক— এটির ব্যাস ১২ ইঞ্চি এবং ৬ ইঞ্চি গভীর। নাদিক আলাদাভাবে বাজানো হয় না, ক্রাম-এর সহযোগী যন্ত্র হিসেবে বাজানো হয়।

৪। নাগ্রা ঃ এই যন্ত্রটি বৃহৎ আকারের মাটির তৈরি এবং এটিও গরুর চামড়া দিয়ে ঢাকা। এই বাদ্যযন্ত্র নকমা বা প্রধানের বাড়িতে ভোজ-সভায় নিমন্ত্রণ-বার্তা ঘোষণার সময় বাজানো হয়। নকমার বাড়ি থেকে সাধারণত এই বাদ্যযন্ত্র বার করা হয় না। যদি কোনো কারণে নকমার বাড়ি থেকে বের করা হয় মালিকের অমঙ্গল নেমে আসে— গারোরা তাই বিশ্বাস করে।

৫। ঈলংগমা ঃ ঈলংগমা এক প্রকার ছোট আকারের বাঁশের বাঁশি— এতে মাত্র তিনটি মাত্রা বা ছিদ্র রাখা হয়।

৬। বংশী ঃ এটি আরো ছোট আকারের বাঁশের বাঁশি— এতে মাত্র তিনটি ছিদ্র রাখা হয়।

৭। ঈমবিংগি ঃ এক টুকরো পাতলা বাঁশের তৈরি বাঁশি। এই বাঁশির এক প্রান্ত বন্ধ রাখা হয় এবং অপর প্রান্তে মুখ রাখা হয়ে থাকে। বাঁশের ওপরের শক্ত আবরণ ছেঁটে ফেলে ভেতরের সাদা অংশটুকু খুব পাতলা করে রাখা হয়। বাঁশির শেষ প্রান্ত থেকে আধ ইঞ্চি নিচে বর্গাকারে ছিদ্র-মুখ রাখা হয়।

৮। রাং বা ঘন্টা ঃ এই যন্ত্রটি পিতল বা ধাতু নির্মিত চাকতিবিশেষ। এই ঘণ্টা গারোরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। এই যন্ত্র নৃত্য এবং উৎসব-অনুষ্ঠানে বাজানো হয়।

করতাল জাতীয় বাদ্যযন্ত্র

১। ককা ঃ সমতলবাসী হিন্দুদের ব্যবহৃত করতালের সঙ্গে ককার মিল রয়েছে।

২। নেংগিলসি ঃ এই বাদ্যযন্ত্রটি ককার চাইতে আকারে ছোট। এটি দেখতে পিতলের কাপের মতো। এই করতাল অন্যান্য যন্ত্র সংগীতের সুরে বাজানো হয়। পাহাড়ের পাদদেশে

বা সমতলবাসী গারোরা হারমোনিয়াম ব্যবহার করছে। তারা এটি শহরের বাজার থেকে ক্রয় করে। আজকাল পাহাড় অঞ্চলে বসবাসকারী গারোরাও পূজা-পার্বণ উৎসবে হারমোনিয়াম ব্যবহার করে।

ওপরে বর্ণিত সবরকম যন্ত্র সংগীত, নৃত্য এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে ব্যবহৃত হয়। গারো যুবক-যুবতীরা আজকাল গিটার, বেহালা এবং অন্যান্য ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে থাকে।

খেলাধূলা

গারোরা খেলাধূলা ভালবাসে। তাদের জাতীয় খেলাধূলা (Country Games and Sports) সুপ্রাচীন এবং বেশির ভাগই শরীর চর্চা-মল্লক্রীড়া ধরনের। সেগুলোর মধ্যে চম্বল, হানাডিং, সান্না এবং ওয়াপাং সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। চম্বল খেলায় বিশেষ ধরনের শারীরিক কসরৎ ও কলাকৌশলের পরিচয় মেলে। যারা এই খেলা দেখায় তারা একটুকরো কাপড়ের একপ্রান্ত কোমরে বেঁধে অপর প্রান্তে একটি ঢেলা মাটি শক্ত করে পুঁটলি বেঁধে দুহাতে প্রচণ্ড শক্তিতে ঘোরাতে থাকে। এ খেলায় শরীরচর্চা হয় এবং প্রচুর শক্তির দরকার হয়। ওয়াপাং সাল্লা খেলায় একটি আস্ত বাঁশের দুই প্রান্ত দুজন লোক টানাটানি করে। এতেও শরীরচর্চা হয়। হানাদিং সাল্লা খেলায়ও দুজন লোক বাঁশের আড়াআড়ি ধরে টানাটানি করে। ওয়াপাং কালা খেলায় দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী পাথরের চাঁই-এর ওপর আস্ত বাঁশ রেখে দুপ্রান্তে বসে বলপ্রয়োগ করতে থাকে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে যে ওপরে তুলতে পারবে, তাকে জয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। তাছাড়া রয়েছে সু-গোয়া বা ঘিলা খেলা, জাগল কালা খেলা (একে অপরের পিছনে দৌড় দিয়ে ধরার চেষ্টা)। আরও আছে— রয়েছে দীর্ঘ লম্বা উচ্চ লম্বা, পাথর ছোঁড়া, পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে এবং নিচে থেকে ওপরের দৌড় দেওয়া, দড়ি বেয়ে ওঠা, দড়ি টানাটানি প্রভৃতি খেলা গারোদের অত্যন্ত প্রিয়। ইংরেজদের আগমনহেতু গারো পাহাড় অঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুটবল, বাস্কেটবল এবং টেবিল টেনিস প্রভৃতি আধুনিক খেলাধূলার প্রবর্তনের ফলে গারো সমাজের নিজেদের খেলাধূলা প্রায় বিলুপ্ত। বিশেষ করে শহর অঞ্চলে।

সম্বোধনের রীতি

বিবাহিত পুরুষ এবং নারীদের সরাসরি নাম ডাকা গারো সমাজে ভদ্র আচরণ বলে গণ্য হয় না। তাদের নাম ডাকে ডাকলে খানিকটা সম্মান হানি হয় বলে গারোরা মনে করে। তাই গারো সমাজে এমন একটা রীতি প্রচলিত হয় যার ফলে বিবাহিত

পুরুষ ও নারীদের সন্তানদের নামের অন্তে পা(বাবা) এবং মা (মাতা) যুক্ত করে সম্বোধন করতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মানসিং নামে কোন গারো ভদ্রলোকের জাংদু বলে কোনো ছেলে থাকলে, মানসিংকে মানসিং নামে না ডেকে জাংদুপা অর্থাৎ জাংদুর বাবা এবং জাংদুর মা বলে ডাকা হবে।

আবার যাদের নাতি বা নাতনি হয়ে গেছে, তাদের অমুকের বাবা বা অমুকের মা না বলে নাতি-নাতনিদের নামে ডাকা হয় — যদি নাতনির নাম মিনতি হয় তাহলে দাদুকে ডাকা হবে মিনতির দাদু অথবা মিনতির দিদিমা। সন্তানহীন গারো দম্পতিদের ডাকা হয় পুরুষের ভাই-এর নামে, স্ত্রীকে ডাকা হয় দেওরের নামে। অথবা অমুকের কাকা অথবা অমুকের কাকিমা বলেও ডাকা হয়। এভাবে নানাভাবে ডাকার মাধ্যমে ওরা সরাসরি নাম ধরে ডাকার ব্যাপারটিকে এড়িয়ে চলে। গারো সমাজে কদাচিৎ সরাসরি নাম ধরে ডাকা হয়। সরাসরি নাম ধরে ডাকলে গারো সমাজের বড়দের প্রতি অমর্যাদা করা হয় বলে বিবেচিত।

পোষাক/সাজসজ্জা

অন্যান্য উপজাতিদের মতো গারোদের পোষাক সরল ও অনাড়ম্বর। পুরুষ গারোরা শীতকাল ছাড়া অন্য ঋতুতে প্রায় খালি গায়ে থাকে। বর্তমান যুগের কোন উপজাতিই একটুকরো (আদিম পোষাক) কাপড় কোমরে জড়িয়ে ব্যবহার করে না। অপেক্ষাকৃত কম দৈর্ঘ-প্রস্থের কাপড়কে ধুতি মনে করে গারোরা ব্যবহার বা পরিধান করে।

স্ত্রী-গারোদের পোষাক অন্যান্য উপজাতি মহিলাদের মতোই। তারা নিম্ন অংশে লুঙ্গির মতো ঘাগরাজাতীয় এবং ওপর অংশে ব্লাউজ বা চাদর ব্যবহার করে থাকে। পুরুষ-নারী উভয়ই পাগড়ি ব্যবহার করে থাকে। কোমর বন্ধ কাপড়ে পুঁতি অথবা কড়ি গাঁথা থাকে। গারো পুরুষ ও নারী উভয়ই কানের দুল ব্যবহার করে। বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে নাচের পোষাক হিসাবে পুরুষ ও নারী পাখির পালক-খচিত মুকুট ব্যবহার করে। তাছাড়া এরা পিতল ও রূপোর তৈরি বালা পরতে ভালবাসে। গ্রামের মোড়ল বা নক্‌মা (Nokma) লোহার তৈরি ভারি ওজনের মাকড়ি ব্যবহার করে । পুরুষরা সাধারণত বর্শা বা তরবারি নিয়ে চলাফেরা করে। বলাই বাহুল্য, শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত গারোরা আজকাল আদিম রীতিনীতি এবং জাতীয় পোষাক বর্জন করে দিচ্ছে ।

অলংকার

গারোরা অত্যন্ত অলংকারপ্রিয় । নারী-পুরুষ উভয়ে নানা অলংকারে সাজতে ভালবাসে। তাদের অলংকার মূল্যবান না হলেও, অনেক অলংকার দেখতে সুন্দর।

কতকগুলি অলংকার পুরুষ-নারী উভয়ই ব্যবহার করে। আবার কিছু-কিছু অলংকার শুধু মহিলারাই ব্যবহার করে। নিম্নলিখিত অলংকারগুলি নারী-পুরুষ উভয়ই ব্যবহার করে।

১। নাদংবি (Nadongbi)

অলংকারটি তামার তৈরি। পাতলা তামার তার দিয়ে তৈরি একরকম কানের দুলকে নাদংবি বলা হয়। এটির এক ইঞ্চি ব্যাস। একসঙ্গে অনেকগুলি দুল পুরুষ নারী উভয়ই ব্যবহার করে।

২। নাদিরং (Nadirong)

এটিও তামার তৈরি দুল। তবে কানের উপরিভাগে নাদিরং পরা হয়। নাদিরং সাদাসিধা এবং কারুকার্যখচিতও হয়ে থাকে।

৩। নাতাপসি (Natapsi)

এটিও তামার তৈরি অর্ধগোলাকৃতি অলংকারবিশেষ— কানের উপরিভাগে এই অলংকার ব্যবহৃত হয়। নারী-পুরুষ উভয়ই এই অলংকার ব্যবহার করে।

৪। জাকসান (বালা বা কঙ্কন) (Jaksan or Bangles)

ব্রোঞ্জ এবং রূপোর তৈরি বালাকে জাকসান বলা হয়। এটি সমতলবাসী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কেনা। উৎসব-অনুষ্ঠানে ব্রোঞ্জের তৈরি ভারি বালা ব্যবহৃত হয়।

৫। রিপক (হার) (Ripok or Necklace)

গারো নারী-পুরুষ উভয়ই রিপক ব্যবহার করে। হারকে গারো ভাষায় রিপক বলা হয়। গারোরা সাধারণত দুরকম হার '(রিপক)' ব্যবহার করে। প্রথমটি লম্বা ও রক্তিমাভ পাথরের তৈরি নলাকার। দ্বিতীয়টি তামা বা রূপোর তৈরি— বিশেষ অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। হারগুলি বহুমূল্যের এবং ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তি হিসাবে গচ্ছিত রাখা হয়।

৬। জাকসিল (কনুই-এ পরার বালা) (Jaksil or Elbow ring)

এই অলংকার কনুই-এর উপরিভাগে পরা হয়। ধনী গারোরা, যারা গ্রামের মোড়ল পদে অধিষ্ঠিত হয়, তারা সাধারণত এই অলংকার পরে থাকে। এই অংলকার ভারি লোহা, তামা অথবা রূপোর তৈরি। জাকসিল অলংকার কখনো চেপ্টা আবার কখনো বা নলাকার (এক ইঞ্চি আবার আধ ইঞ্চি ব্যাস) হয়ে থাকে।

৭। পেনটা (Penta)

পেনটা অলংকার হাতির দাঁতের তৈরি দেড় ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা আলপিন আকারের। কানের উপরিভাগের অংশটিকে ছিদ্র করে খাড়াভাবে কানে গুঁজে পরা হয়।

৮। গান্দু ও রেকিং (Gando and Reking)

নকশা করা পুরুষের কটিবন্ধ এবং মহিলাদের সায়াকে যথাক্রমে গান্দু এবং রেকিং বলা হয়। শাঁখের মালা দিয়ে 'গান্দু' ও 'রেকিংকে' অলংকৃত করা হয়।

৯। সেংকি (Senki)

এই অলংকার একমাত্র মহিলারাই পরে থাকে। এটি একরকম কোমর-বন্ধনীবিশেষ। শাঁখের মালা খচিত এই কোমরবন্ধনী রেকিং এবং সায়া পরায় আলম্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

১০। পিলনি অথবা সা-চাক-মালদং (Pilni)

এটি একটি অদ্ভুত রকমের মাথার অলংকার, নাচের সময় ব্যবহৃত হয়। এই অলংকারে আট ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা বাঁশের তৈরি চিরুনী জুড়ে দেওয়া হয়। চিরুনীর মাথায় ছ ইঞ্চি পরিমাণ শাঁখের মালাখচিত নীল রংয়ের কাপড় এঁটে দেওয়া হয়। খোঁপায় চিরুনীটি গেঁথে দিলে পিছনের দিকে কাপড়টি পর্দার আকারে ঝুলে পড়ে।

মনে রাখতে হবে, গারো সমাজে শিক্ষার আলো অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমস্ত অলংকার, অঙ্গসজ্জার উপকরণ ক্রমশ যাদুঘর অথবা নাচের ঘরে নির্বাসিত হতে চলেছে।

মগ লোকসংস্কৃতি

উৎসব-অনুষ্ঠান

মগরা খুব উৎসবপ্রিয়। উৎসবের মেজাজের মধ্যে তারা তাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রাকে ভরপুর করে রাখে। নিম্নবর্ণিত উৎসব এবং সামাজিক রীতি-নীতির বহর থেকে তা সহজে অনুমেয়।

নৌকা খেলার উৎসব

আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা-তিথিতে এই উৎসব পালিত হয়ে থাকে। এই উৎসব পালনের মাধ্যমে তারা ভগবান বুদ্ধদেবের প্রতি ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করে থাকে। এই দিনে মগরা নারীপুরুষ দলে দলে বুদ্ধ মন্দিরে গিয়ে প্রণাম জানায়— এবং সন্ধ্যালগ্নে

নদীর তীরে দলে দলে গিয়ে খেলনা নৌকা ভাসায়। নদীর ভাঁটার দিকে খেলনা নৌকা ভাসানো তাদের ধর্মীয় উৎসব। খেলনা নৌকা ভাসানোর সময় গলাবাজি, গান ও হাততালি চলতে থাকে। তাদের মতে বুদ্ধদেব অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতে আলো নিয়ে যাত্রা করেন। কাঠের নির্মিত নৌকাগুলো বিচিত্র রং-বেরংয়ের কাগজ ও অলংকৃত ঝালর দিয়ে সাজানো হয়। নৌকাগুলোর ভেতরে অতি সযত্নে জ্বলন্ত মোম বসিয়ে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

জল উৎসব

মগদের জল উৎসবের সঙ্গে হিন্দুদের হোলী বা দোল উৎসবের মিল রয়েছে। এই উৎসব চৈত্র মাসের শেষে পালিত হয়। কচি ছেলেমেয়ে ও যুবক-যুবতীরা এই উৎসবে মেতে ওঠে। এরা দলে দলে রাস্তায় বেরিয়ে একে অন্যের গায়ে জল ছিটিয়ে দেয়। হিন্দুদের দোল উৎসবে যেভাবে রং মাখামাখির যে মেজাজ, মগদের জল উৎসবেও তা দেখা যায়। জল খেলার সময় আনন্দউচ্ছল ধ্বনি, ছোটাছুটি, আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ চরমে ওঠে। মগ সম্প্রদায়ের লোকজনও পথে বেরিয়ে পড়লে তাদের গায়েও জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এতে কেউ কিছু মনে করে না।

ব্যূহচক্র উৎসব

এই খেলাটি মহাভারতের কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের পুত্র বীর অভিমন্যুকে বধ করবার জন্য কুরুপক্ষের ব্যূহ রচনার কথা মনে করিয়ে দেয়। এই ব্যূহখেলা মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে পালিত হয়। মগদের অত্যন্ত উপভোগ্য এবং আনন্দের এই উৎসব তিন-চার দিন ধরে পালিত হয়। ব্যূহচক্র বাঁশের বেড়া দিয়ে আঁকাবাঁকা গোলক ধাঁধার অভ্যন্তরীণ পথ রচিত হয়। এই চক্রের দুটো মুখ রাখা হয়, একটা প্রবেশ করার, অপরটি বেরিয়ে যাবার। ব্যূহচক্রে একবার প্রবেশ করলে পরিবেষ্টিত সম্পূর্ণ পথ অতিক্রম না করে কেউ বেরুতে পারে না। অভ্যন্তরীণ আঁকাবাঁকা পথে বুদ্ধমূর্তিও রাখা হয়। ব্যূহচক্র পরিক্রমা করার সময় প্রতিটি মূর্তির সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে সকলে ভক্তিভরে প্রণতি জানায়। বুদ্ধমূর্তির বেদীতে মোম জ্বালিয়ে ভগবান বুদ্ধের আশীর্বাদ প্রার্থনা করা যায়। ব্যূহচক্রে প্রবেশ-পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন রাখা হয়— কিন্তু বেরিয়ে আসার পথ আলোকিত করে রাখা হয়। এই উৎসবের দিনগুলিতে নৃত্য পরিবেশনা এবং পুতুল নাচের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

মগ রূপকথা

পুরাকালে ব্রহ্মদেশের নিম্ন অংশে অতীব খেয়ালী এক রাজকন্যা বাস করত। রাজকন্যার একটি অতি আদরের কুকুর ছিল। ঐ কুকুর ছাড়া সে কোথাও যেত না। একদিন কুকুর নিয়ে পথ চলার সময় অত্যন্ত নোংরা মন্তব্য তার কানে ভেসে এল।

কাকে যেন বলতে শোনা গেল— 'রাজকন্যাটি শেষ পর্যন্ত কুকুরটিকেই বিয়ে করে বসবে।' নোংরা মন্তব্য কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটির প্রতি রাজকন্যা অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে তাকে নদীর জলে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। স্রোতে ভেসে গিয়ে কুকুরটি শেষ পর্যন্ত নদীর জলে ভাসমান একটি বটগাছের শাখায় আটকা পড়ে যায় এবং সেখানেই মারা যায়।

কালক্রমে কুকুরটি মগ রাজপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করে। মগ রাজপুত্রটির জন্মগত শিরঃপীড়া ছিল। শিরঃপীড়াটি দুরারোগ্য ছিল। মাথা ঝিম ঝিম করা রোগের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য মগ যুবরাজ সব রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করেও কোন ফল হয়নি। অবশেষে যুবরাজ রাজ্যব্যাপী এই বলে ঘোষণা করে যে, কেউ রোগের প্রতিকার করতে পারলে যথাযোগ্য পরস্কৃত হবে।

সেই ঘোষণার খবর পেয়ে এক জ্যোতিষী মগ রাজার সেই কলংকময় অতীত কাহিনী যুবরাজের গোচরে আনে। সে অপমানকর কাহিনী শুনে প্রথমে যুবরাজ অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে, পরিশেষে অবশ্য প্রতিকারের আশ্বাসবাক্য শুনে শান্ত হয়ে যায়।

প্রতিকারের কাহিনী

জ্যোতিষী-ঘোষণায় বলা হল কুকুরের মাথার করোটি ভাসমান বটশাখা থেকে সরিয়ে দিলে যুবরাজের মাথার ঝিমঝিম রোগ সেরে যাবে। জ্যোতিষীর গণনা শুনেই যুবরাজ সৈন্য-সামন্ত নিয়ে নদীতে ভাসমান বটগাছের অবস্থান নির্ণয় করতে বেরিয়ে পড়ে। দীর্ঘ জলপথ অতিক্রম করে যুবরাজ শেষপর্যন্ত সেই স্থানে গিয়ে উপস্থিত হতে সক্ষম হয়। স্থানটি ছিল দক্ষিণ চীন অঞ্চলে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, নদীর স্রোতে দোলায়মান বটের শাখা থেকে কুকুরের মাথার করোটি সরিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে যুবরাজের শিরঃপীড়া সেরে যায়।

আজন্ম সেই দুরারোগ্য শিরঃপীড়া থেকে মুক্তি পেয়ে অতি উল্লাসে মগ যুবরাজ গৃহের অভিমুখে যাত্রা করে। কিন্তু মজার কথা এই যে, যাত্রা-পথে সে সমুদ্র গর্ভস্থ নাগরাজার কন্যার নজরে পড়ে যায়। মগ যুবরাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নাগকন্যা তার পিতার সাহায্যে মহারাজকে যাদুমন্ত্র বলে সমুদ্রগর্ভে টেনে নিয়ে যায়। ফলে মগ যুবরাজের পক্ষে দেশে ফেরা আর সম্ভব হয়নি।

অতঃপর মগ যুবরাজের পারিষদবর্গ বিষাদগ্রস্ত হয়ে দেশে ফিরে যায়। দেশে ফিরেই যুবরাজের অবর্তমানে যুবরাজ্ঞীকে মগযুবরাজের মন্ত্রী বিয়ে করে সিংহাসনে আরোহণ

করে। মগ যুবরাজের তিন পুত্র ছিল। পিতার অবর্তমানে তিন পুত্র তিন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে রাজত্ব করতে থাকে। জ্যেষ্ঠপুত্র পিতার সিংহাসন লাভ করে। দ্বিতীয় পুত্র পিতার রাজ্য থেকে বেরিয়ে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তর দিকে তিন পারা নামক স্থানে বসবাস করে। মগদের জনশ্রুতি অনুযায়ী এই তিন পারা হচ্ছে ত্রিপুরার প্রাচীন নাম। মগরা মনে করে, মগ-যুবরাজের দ্বিতীয় পুত্র হচ্ছে ত্রিপুরার রাজবংশের পূর্ব পুরুষ। তৃতীয় পুত্র দক্ষিণ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করে। মগরা এও মনে করে থাকে, এই তৃতীয় পুত্রটি হচ্ছে চাকমা উপজাতির পুর্ব পুরুষ।

• টীকা •

দক্ষিণপন্থী বৌদ্ধ — হীনযান বা হীনায়ন ও মহাযান বা মহায়ন এই দুই মার্গে বিশ্বাসী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা। মহাযান বৌদ্ধধর্মের নবতর মার্গ এবং হীনযান হচ্ছে বৌদ্ধধর্মের প্রাচীনতর মার্গ। মহাযান মার্গে বিশ্বাসী বৌদ্ধ উত্তরপন্থী এবং হীনযান মার্গে বিশ্বাসীদের দক্ষিণপন্থী বৌদ্ধ বলা হয়ে থাকে। সাধারণত মহাযানীরা আত্মাবাদী অর্থাৎ অবতারবাদে বিশ্বাসী এবং মূর্তিপূজার বিরোধী। পক্ষান্তরে, হীনযানীরা অনাত্মাবাদী অর্থাৎ এরা অবতারবাদে বিশ্বাস করে না। এরাও মূলতঃ বিগ্রহ-পূজারী নয় কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রভাবে ক্রমশ বিগ্রহ পূজায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। ত্রিপুরায় বসবাসকারী মগ ও চাকমা সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী হীনযানবাদী। হীনযানবাদীদের স্থবিরাবাদী বা থেরোবাদীও বলা হয়।

উল্কি — উল্কি-পরা বা দেওয়া মানুষের এক বিচিত্র খেয়াল বা সখ। উল্কি-পরা একপ্রকার অঙ্গসজ্জা বা অলংকরণ অভিলাষ। তাছাড়া এর পিছনে কিছু পরিমাণ সংস্কার বা বিশ্বাস কাজ করে। ভারতের বিভিন্ন জাতি উপজাতীয় নারী-পুরুষের মধ্যে উল্কি পরার প্রচলন আছে। এটি ত্রিপুরায় বসবাসকারী মগ ও চাকমা উপজাতিদের মধ্যে সবিশেষ লক্ষণীয়। তবে অন্যান্য জনগোষ্ঠী বিশেষ করে ত্রিপুরীদের মধ্যে উল্কি পরার নজির নেই কিন্তু আজকাল কদাচিৎ চোখে পড়ে। বিহারী বা হিন্দুস্থানীদের মধ্যেও উল্কি পরার প্রচলন আছে। মধ্যপ্রদেশের বিশেষ জনগোষ্ঠী বৈগা (Baiga) সমাজে উল্কি-পরার প্রচলন আজো বিদ্যমান। বৈগাদের প্রচলিত বিশ্বাসমতে উল্কি পরা নরনারীদের পরলোকে যাবার পথ প্রশস্ত থাকে। কোনো কোনো উপজাতি বিশ্বাস করে, গায়ে উল্কি পরলে অপদেবতার দুষ্ট প্রভাব ক্ষতি করতে পারে না। আবার কেউ কেউ মনে করে থাকে যে সুন্দরী রমণীদের মুখমণ্ডল উল্কি দিয়ে বিকৃত করলে পর পুরুষের লোলুপ দৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তবে মগ জনজাতিদের মধ্যে উল্কি পরার পিছনে ঐ রকম বিশেষ কোনো সংস্কার নেই। নিছক অঙ্গ-আভরণ হিসেবেই মগরা উল্কি পরে থাকে। মগ

নারীপুরুষ সকলে উল্কি পরে থাকে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাও উল্কি পরে থাকেন। মগ পুরুষরা সাধারণত বাহুতে এবং মগ রমণীরা পৃষ্ঠদেশে উল্কি পরে থাকে। উল্কি পরা-বেশ কষ্টদায়ক। উল্কি পরার জন্য উপজাতীয়রা বাঁশ দিয়ে একরকম সরঞ্জাম তৈরী করে। এই সরঞ্জামে কলমের নিব আকারে বাঁশের কঞ্চি যুক্ত করে দেওয়া হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে গায়ের চামড়া বিদ্ধ করে একপ্রকার গাছের 'রস' প্রলেপ দেওয়া হয়। এই ভাবে দেহের বিভিন্ন অংশকে বিচিত্রিত করাকে উল্কি পরা বলা হয়।

মারমা বা মগ সঙ্গীত

ত্রিপুরা রাজ্যের মগ সম্প্রদায় অধুনা বাংলাদেশ থেকে এসেছিলো সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। প্রকৃতপক্ষে মারমা উপজাতি মগ সম্প্রদায়ের সগোত্রীয়। ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাসকারী মগ সম্প্রদায় এবং চট্টগ্রাম নিবাসী মারমা সম্প্রদায় একই উপজাতি সম্প্রদায়। এদের মাতৃভাষা বর্মী ভাষার উপজাত ভাষা। এদের আদি নিবাস ছিল বর্মার পেগু শহরে। পরবর্তীকালে আরাকানে এসে বসতি স্থাপন করতে থাকে। চট্টগ্রামবাসী মারমাদের প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে। কিন্তু তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় হেতু তা বিলুপ্ত হতে বসেছে।

মারমা সঙ্গীতকে মোটামুটি ৯ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন সাখ্রাং, কাপ্যা, আরোওয়ে, রদ্ধ, রাগাইং, আইং, ত্রঃ, পাংখুং ও তেঃ খ্রাং।

১। **সাখ্রাং** ঃ এটি মারমাদের প্রাচীনতম সঙ্গীত বলে ধারণা করা হয়। এর সুর সকল ক্ষেত্রে একরকম। সাধারণতঃ বিরহমূলক বিষয়কে কেন্দ্র করে এই গান গীত হয়।

২। **কাপ্যা** ঃ কাপ্যা সঙ্গীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর তাল ও সুর অত্যন্ত ধীর। জীবনের সুখ-দুঃখ বিজড়িত স্মৃতিকে কেন্দ্র করে এই গান গাওয়া হয় — মারমা সমাজে এ গানের আদর অত্যন্ত বেশী।

৩। **আরোওয়ে** ঃ মারমা সঙ্গীতের মধ্যে আরোওয়ে দ্রুত ও তাল লয়ে গীত হয়।

৪। **রদ্ধ** ঃ এই গানটি নিঃসঙ্গ ভারাক্রান্ত হৃদয়ের গান। বিষাদের গান হলেও সুর ও ছন্দের বিশিষ্টতার জন্য চিত্তাকর্ষক।

৫। **রাগাইং** ঃ আকাশে মেঘের আনাগোনা থাকা সত্ত্বেও বৃষ্টি না হলে রাগাইং সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়ে থাকে। এদের বিশ্বাস রাগাইং গান গাইলে বৃষ্টি নেমে আসবে। ইদানীং অবশ্য এ গানের প্রচলন ক্রমশঃ বিলুপ্ত প্রায়। স্থানীয় ভাষায় এটাকে 'সাইং'ও বলা হয়।

৬। **আইং** ঃ এই গানটি বিজয় উৎসবে গীত হয়। প্রাচীনকালে যুদ্ধে বিজয়ী সেনাবাহিনীরা

এই গানের প্রচলন করে বলে জানা যায়। বর্তমানে যে কোন প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ায় বিজিত প্রতিদ্বন্দ্বীদের জয়োল্লাসের প্রতীক এই সংগীত। বিজয়ীরা কোরাস গেয়ে আনন্দোৎসবে মেতে ওঠে মারমা সমাজ।

৭। **ত্র ঃ** এই গানটি প্রেমমূলক। পাহাড় অঞ্চলে জুম ক্ষেতে যুবক যুবতীরা তাদের কাজের ফাঁকে এই সঙ্গীতের মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরকে প্রেম নিবেদন করে থাকে।

৮। **পাংখুং ঃ** এই সঙ্গীতের মূল সুর নৃত্যগীতি নাট্যের প্রধান মাধ্যম। সাধারণতঃ পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় কাহিনী বর্ণনার মাধ্যম হলো এই পাংখুং সুর। মারমা জন সমাজের জনপ্রিয় সুর হিসাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর রচিত গীত-এ পাংখুং সংযোজন করা হয়ে থাকে।

৯। **তেঃখ্রাং ঃ** মারমাদের আধুনিক গান বলতে তেঃখ্রাং সঙ্গীত। নানারকম সুর, তাল, লয়-এ এই সঙ্গীত গীত হয়।

মারমা বা মগনৃত্য

মারমা সমাজের সঙ্গীতের শ্রেণীবিভাগ যেমন রয়েছে তেমনি নৃত্যকলারও শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। মোটামুটিভাবে মারমাদের পাঁচ প্রকার নৃত্য প্রচলিত আছে।

১। **ক্যংমুই ঃ** ক্যংমুই নৃত্য মারমাদের আদিমতম নৃত্যকলা বলে পরিগণিত। আদিকালে নৃত্য কলার সৃষ্টির পূর্বে মারমারা ধান ভানার ঢেঁকির শব্দ ও তালের ছন্দ ও গতির মধ্যে সঙ্গীত ও নৃত্যের রূপ আবিষ্কার করে। পুরাকালে এই নৃত্য পরিবেশনকালে অনেকগুলো ঢেঁকির শব্দের সঙ্গে তাল সৃষ্ট নৃত্যে পরিবেশন করার রীতি ছিল — পরবর্তীকালে ঢেঁকির পরিবর্তে বাঁশের মাধ্যমে শব্দ ও তাল সৃষ্টি করে অধিকতর চিত্তাকর্ষক ও গতিময় করে তুলতে দেখা যায়।

২। **সইং ঃ** সইং নৃত্য পরিবেশিত হয় কোন বিখ্যাত ব্যক্তি বা ধর্মীয় নেতা বা রাজার মৃত্যু উৎসবে। মৃতব্যক্তির কফিন বয়ে নিয়ে যাবার সময় শব যাত্রীরা বিভিন্ন নৃত্যদল কাঠি হাতে নিয়ে সইং নৃত্য পরিবেশনার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। এই নৃত্যে ৩২ প্রকার মুদ্রা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৩। **য়ইং ঃ** এই নৃত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য নানারকম দেহ-ভঙ্গিমা প্রদর্শন। য়ইং নৃত্যে হেলেদুলে পরিবেশিত নৃত্য কৌশল দর্শকদের মুগ্ধ করে বলে এর নাম য়ইং। এই নৃত্য একক, দ্বৈত কিংবা সমবেতভাবে পরিবেশিত হতে পারে।

৪। **ছিমুইং ঃ** ছিমুইং আকা বাংলাদেশে প্রদীপ নৃত্য বলে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে।

মূলতঃ এই নৃত্য বিবাহে পার্বণে বর-কনে উভয় পক্ষের পিতামাতা ও গুরুজনদের সম্মানার্থে পরিবেশিত হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে ধর্মীয় পূজা পার্বণেও এ নৃত্য পরিবেশিত হতে থাকে।

৫। **বাইং ঃ** আধুনিক সমাজের নৃত্যকলার অনুকরণে এই নৃত্যের উদ্ভব হয়েছে। এটাকে মারমাদের মুখোশ নৃত্যও বলা যায়। কেননা অনেক সময় বানর, বাঘ কিংবা অন্যান্য জন্তুর মুখোশ ধারণ করে এই নৃত্য পরিবেশিত হয়।

মারমাদের বাদ্যযন্ত্র

বাদ্যযন্ত্র ব্যতিরেকে সঙ্গীত ও নৃত্য কল্পনা করা যায় না। মারমা সমাজের সঙ্গীত নৃত্যে নানা রকম বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এদের বাদ্য প্রধানতঃ ঢোল, বাঁশী, করতাল, পিতলের তৈরি একরকম যন্ত্র, সানাই জাতীয় বাদ্য। তাছাড়া আধুনিক বাদ্যযন্ত্রও মারমারা ব্যবহার করছে।

মারমা উপজাতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকলা বাংলাদেশের বৃহত্তর জাতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বাংলাদেশের সরকার উপজাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে এবং রেডিও বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের পাহাড়িকা অনুষ্ঠান সংযোজনের মাধ্যমে এবং বাংলাদেশ দূরদর্শন উপজাতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকলার প্রচার, অনুশীলন ও বিকাশসাধনে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক সংরক্ষণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন।

চট্টগ্রামের মারমা লোককথা

বিষফল

এক দেশের এক রাজার একটি পোষা টিয়ে ছিলো। তিনি টিয়েটিকে খাঁচাবন্ধ করে বারান্দায় ঝুলিয়ে রাখতেন। রাজার একটা বিশেষ গুণ ছিল যে তিনি পশু পাখীর ভাষা বুঝতে পারতেন। প্রতিদিন ভোর হলেই ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীর দল খাবারের সন্ধানে রাজপ্রাসাদের কাছ দিয়ে উড়ে যেতো। যাবার সময় তারা খাঁচাবদ্ধ টিয়েটিকেও ডেকে যেতো। তাদের সহযাত্রী হবার জন্যে সেও ব্যাকুল হয়ে উঠতো। কিন্তু আবদ্ধ থাকায় যেতে পারতো না। রাজা এ সব কিছুই প্রত্যক্ষ করতেন। পাখিটিকে ছেড়ে দিলে ফিরে আসার নিশ্চয়তা নেই বলে রাজা ছাড়তে চাইতেন না। কিন্তু দিন দিন টিয়েটির ব্যাকুলতা দেখে রাজা আর স্থির থাক্‌তে পারলেন না।

তিনি টিয়েটিকে বললেন— "তোমাকে ছেড়ে দিলে তো আর ফিরে আসবে না। তাই তোমাকে ছেড়ে দেবার ইচ্ছে থাকলেও দিতে পারছিনে।"

টিয়েটি বললো— "আমি অবশ্যই ফিরে আসবো রাজা মশায় ; আপনি কোন ভয় করবেন না।" পাখীর কথায় রাজা তাকে ছেড়ে দিলেন। মনের আনন্দে টিয়েটি সাথীদের সাথে উড়ে চলে গেলো। সারাদিন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ফিরে অনেক কিছুই খেলো। অনেক দূর চলে যাওয়ায় ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেলো তার। রাজপ্রাসাদে পৌঁছে দেখে রাজবাড়ীর সবাই দরজা জানালা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছে।

এদিকে রাজা টিয়ের ফিরে আসার আশা ছেড়ে দিলেন। তাই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তিনিও ঘুমিয়ে পড়লেন। টিয়েটি ফিরে আসার পথে রাজার জন্যে একটি সুমিষ্ট ফল ঠোঁটে করে নিয়ে এসেছিলো। ভেতরে ঢোকার কোন পথ না পেয়ে টিয়েটি প্রাসাদের ছাদেই ঘুমোবার ব্যবস্থা করলো এবং দীর্ঘপথ উড়ে আসায় ক্লান্ত হয়ে কিছুক্ষণ পরেই ঘুমিয়ে পড়লো। গভীর রাতে মিষ্টি ফলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো। গন্ধ পেয়ে এক বিষধর সাপ প্রাসাদের ছাদে উঠে এলো এবং টিয়ের অজান্তে ফলটির রস চুষে নিয়ে তাতে বিষ ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেলো।

পরদিন সকালে টিয়েটিকে দেখে রাজা খুবই খুশী হলেন। তার ঠোঁটে করে আনা ফলটি রাজাকে খেতে দিলো এবং বল্‌লো এ-ফলটি খেলে বয়স্কদের যৌবন প্রাপ্তি ঘটে। রাজা ফলটি খেতে উদ্যত হলে সভাসদবৃন্দ খেতে নিষেধ করেন এবং তা একজন ভৃত্যকে দিয়ে খাইয়ে পরীক্ষা করে দেখতে উপদেশ দিলেন। কেননা পাখীটিকে তো বিশ্বাস করা যায় না। হয়ত কোন বিষফলও হতে পারে। রাজা তাই করলেন। একজন ভৃত্য ডেকে ফলটি খেতে নির্দেশ দিলেন। ফলটি খাবার অল্পক্ষণ পরেই ভৃত্যটি বিষক্রিয়ায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। সবাই অবাক হলো। সভাসদদের উপদেশ শুনে রাজা যে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছেন সে জন্য তিনি তাদের ধন্যবাদ দিলেন এবং টিয়েটিকে তৎক্ষণাৎ মেরে ফেলার আদেশ দিলেন। রাজা আরো নির্দেশ দিলেন ফলের বিচিকে যেন এক সংরক্ষিত এলাকায় বপন করে রাখা হয় যাতে পরবর্তী সময়ে ফল ফললে কেউ খেতে না পারে এবং এর নাম দেয়া হবে বিষবৃক্ষ।

একদিন বীজ অংকুরিত হয়ে ফলেফুলে পূর্ণ হয়ে উঠলো। ফল পেকে ঝরে পড়তে লাগলো। পাখীরা দলে দলে খেতে লাগলো। আশ্চর্য্য কোন পাখীরই মৃত্যু হচ্ছেনা। অথচ রাজার নির্দেশ কোন মানুষই তা খেতে পারবে না। মানুষ খেলে নির্ঘাত তার মৃত্যু। ফলের সুমিষ্ট গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। কিন্তু কেউ খেতে পারছে না। এভাবে দিন যায়। একদিন সে রাজ্যের বুড়ো-বুড়ীতে ভীষণ ঝগড়া এবং মারামারি হয়ে যায়। বুড়ী মনের দুঃখে রাজার বিষবৃক্ষের ফল খেয়ে মরতে চললো। অতি কষ্টে বুড়ী একটি ফল কুড়িয়ে তা খেয়ে ফেললো। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার মৃত্যুর পরিবর্তে বুড়ী এক

সুন্দরী যুবতীতে পরিণত হলো। সে মনের আনন্দে বাড়ীতে ফিরে চললো। ফেরার পথে বুড়োকে পেলো ! বুড়ো যুবতীকে দেখে জিজ্ঞেস করলো— "আমার বুড়ীকে এদিক দিয়ে রাজবাড়ী যেতে দেখেছো ?"

যুবতীটি বুড়োকে চিনতে পারলো। কিন্তু রহস্যটি খুলে না বলে কৌতুক করার জন্যে বুড়োকে বললো— "না, দেখিনিতো ? কি হয়েছে তোমার বুড়ীর ?" বুড়ো বললো— "আর বলো না। একটু ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে, তাই রাগ করে বুড়ী বিষফল খেয়ে মরতে রাজবাড়ীর দিকে ছুটে চলে গেছে ?"

অবশেষে বুড়ী তার রহস্য ফাঁস করে দিলো এবং বুড়োকেও খেয়ে আসতে বললো। বুড়োও বিষফলটি খেলো এবং সেও এক সুন্দর যুবকে পরিণত হলো। কথাটি একদিন রাজার কানে গেলো। বুড়ো বুড়ীকে তলব করা হলো। তারা সাক্ষ্য দিলে সত্যিই বিষফল খেয়ে দু'জনেই যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছে।

রাজা সভাসদদের ডাকলেন। তারা এবারও একটা ভৃত্যকে খাইয়ে পরীক্ষা করতে উপদেশ দিলেন। উপদেশ অনুযায়ী কাজ করা হলো। সত্যিই ফলটি খেয়ে ভৃত্যটির যৌবনপ্রাপ্তি ঘটলো। অতঃপর রাজা-রাণী, সভাসদবৃন্দ সবাই খেলো এবং সবাই যুবক যুবতীতে পরিণত হলো। রাজা-রাণী, সভাসদবৃন্দ সবাই টিয়েটির জন্যে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলো। কিন্তু তখনতো টিয়েটিকে ফিরে পাবার আর কোন উপায় নেই।

প্রবন্ধটি লিখেছেন বাংলাদেশের এম. এন. অঙ, এখানে সেটি পুনর্মুদ্রিত হলো ।

লুসাই লোকসংস্কৃতি

বাদ্যযন্ত্র

লুসাইরা সঙ্গীতপ্রিয়। গান-বাজনা পরিবেশনের মাধ্যমে তারা দৈনন্দিন জীবনকে খুশির আমেজে রাখতে সচেষ্ট থাকে। লুসাইদের ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে রয়েছে ঢাক এবং চেপটা ধরনের একরকম ঘণ্টা। তাছাড়া 'মাউথ অর্গান' এবং বাঁশের তৈরী বেহালা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র লুসাইরা ব্যবহার করে থাকে। চেপটা ধরনের ঘণ্টা বাদ্যযন্ত্রটি বার্মা থেকে আমদানী করা হয়।

লুসাইদের গানের সুর প্রলম্বিত এবং মন্থর তাই একঘেয়ে মনে হয়। কোনো বীর সর্দার মারা গেলে প্রশস্তিমূলক শোক-সঙ্গীত গাওয়া হয় বাদ্যযন্ত্র সহকারে।

নৃত্য

লুসাইরা আমোদপ্রিয়। নৃত্য-সঙ্গীতের মাধ্যমে এরা জীবনকে উপভোগ করে। এদের জীবনবৃত্ত নৃত্য ও সঙ্গীতের সুরে সুরে গাঁথা।

লুসাইদের নৃত্যধারা বৈচিত্র্যময়। ভিন্ন ভিন্ন নৃত্যরীতির মধ্যে তাদের মনের ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। তাদের জনপ্রিয় নৃত্যরূপের মধ্যে চের, খউলাম, সোলাকিয়া, Rallulam, Pawnto এর থাল্‌উগ্লাম নৃত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চের নৃত্য/বাঁশ নৃত্য

চের বা বাঁশ নৃত্য লুসাইদের প্রসিদ্ধ লোকনৃত্য। কারুর অকাল মৃত্যু ঘটলে সেই মৃত ব্যক্তির আত্মাকে অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা করে তাদের কল্পিত স্বর্গের (পিয়ালরাল) দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেবার জন্য এই নৃত্যের প্রয়োজন হয়। চের নৃত্য বা বাঁশ নৃত্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে — দুজন বা চারজন লোক দুই প্রান্তে মুখোমুখি বসে উভয় হাতে সমান লম্বা দুটো বাঁশ ধরে একবার বন্ধ একবার ফাঁক করতে থাকে। যখন বন্ধ করা হয় তখনই সুন্দর শব্দ তরঙ্গ ভেসে উঠে — বারবার বন্ধ ও ফাঁক করার ফলে ছন্দ ও তাল ঝংকৃত হয়। সেই তালে তালে নৃত্যরত যুবক-যুবতীবৃন্দকে দুটো বাঁশের মাঝখানে একবার পা ফেলে একবার বার করতে হয়। বাঁশ দুটো যে মুহূর্তেফাঁক করা হয় — সেই মুহূর্তে পা ফেলে দিয়ে বন্ধ করার পূর্ব মুহূর্তে পা বার করে দেবার যে কৌশল তা ছন্দের তালে তালেই সম্পন্ন হয় — এই নৃত্য অত্যন্ত উপভোগ্য। বংশদণ্ডের শব্দ-তরঙ্গের সঙ্গে নৃত্যছন্দের চপলতা খুবই মনোরম দৃশ্য রচনা করে।

খুয়াল্লাম নৃত্য

খুয়াল্লাম নৃত্য পরিবেশিত হয় মূলতঃ মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়। লুসাইদের বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্‌গতির জন্য সাতটি অনুষ্ঠান না করলে মৃত ব্যক্তি স্বর্গে পৌঁছোতে পারে না। খুয়াল্লাম নৃত্যে পাঁচটি মুদ্রা রয়েছে। যেমন, ১) নামথুয়াং অর্থাৎ সাধারণ পদক্ষেপ, ২) ফেইখাই অর্থাৎ ছন্দের তালে পদ সঞ্চালন, ৩) ভিক্‌ললেন অর্থাৎ আড়াআড়ি নৃত্য, ৪) আরপুইচন্‌থাই অর্থাৎ মুরগীর আঁচড়, ৫) সাইলিয়ানুকল অর্থাৎ হস্তীর পদক্ষেপ বা হাতির হাঁটার অনুকরণ। এই পাঁচটি মুদ্রার নাচের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়। নানারকম সুরের সঙ্গে নাচের ভঙ্গিমাও মিলানো হয়।

সোলাকিয়া নৃত্য

এই নৃত্যও ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি মুদ্রায় পরিবেশিত হয়ে থাকে। মূলতঃ এই নৃত্য

বিজয়সূচক নৃত্য। শিকারীদল বন্য পশুপাখি শিকার করে বাড়ি ফিরলে বিজয় উল্লাসের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে সোলাকিয়া নৃত্য পরিবেশিত হয়ে থাকে। মূলতঃ এই নৃত্যে মিজো রাজ্যের দক্ষিণ অংশে বসবাসকারী 'পাইস' ও 'লেকার্ম' মিজো সম্প্রদায়ের লোকেরাই পরিবেশন করে থাকে ।এই দুই সম্প্রদায়কে বার্মাদেশ থেকে আগত বলে বলা হয়েছে। এই নৃত্যের বিশেষত্ব হচ্ছে নারী-পুরুষ উভয়ই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ডান পা-টিকে নাড়া দিয়ে বাঁ পা-টিকে ঝুঁকিয়ে তালে তালে হাঁটু গাড়ার ভঙ্গিমা করে। এ নৃত্যের সঙ্গে ঢাক ও ভেরী বাজানো হয়। বাজনার তালে তালে নাচের ছন্দ বেশ জমে ওঠে। বর্তমানে এই নৃত্য সারা মিজো রাজ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। পাশ্চাত্যের Locomotion নৃত্যের সাদৃশ্য থাকলেও সোলাকিয়া নৃত্য পুরোপুরি মিজোদের নিজস্ব নৃত্য-রীতি। কেননা সুদুর অতীত থেকে এই নৃত্য প্রচলিত হয়ে আসছে।

পয়াস্তু নৃত্য

পয়াস্তু নৃত্যটি বাচ্চাদের। এরা গান-বাজনা ও খেলার ছলে এই নৃত্য পরিবেশন করে। পয়াস্তু নৃত্যের এখন সর্বজনীন প্রচলন নেই — গ্রামের স্কুলের ছেলে মেয়েরা এই নৃত্য পরিবেশন করে থাকে ।

ত্লাংলাম নৃত্য

এই নৃত্যটি লুসাই সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয়। 'ত্লাংলাম' শব্দের অর্থ জাতীয় নৃত্য বা গণনৃত্য। কথিত আছে, মিজোরামের বায়ানগিন গ্রামের একটি নাচের দল ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এই নৃত্যের প্রচলন বা প্রবর্তন করে। লালঝিকা সাইলো নামে খৃষ্টধর্মের একজন ঘোর বিরোধী ব্যক্তি এই নৃত্যের প্রবর্তক। কেউ কেউ মনে করে তাদের জীবনকে খৃষ্টধর্মের প্রভাব থেকে দূরে রাখার জন্য এই নৃত্যের প্রবর্তন করা হয়েছিল।

সে যাই হোক, আজকাল ত্লাংলাম নৃত্যের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে মিজোদের খুব জনপ্রিয় লোকনৃত্যের রূপ নিয়ে ত্লাংলাম নৃত্য মিজো সমাজে আদৃত হয়ে আছে।

হালাম নৃত্য (হৈ-হক-নৃত্য)

গান-বাজনার প্রবণতা প্রত্যেক উপজাতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। হালামদের মধ্যেও গান-বাজনা, নাচের প্রবণতা দেখা যায়। তবে হালামদের নাচ-গান তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এদের নাচ-গান সাদামাটা গোছের। তাই রাজ্যের সাংস্কৃতিক জগতে এদের অবদান প্রায় শূন্যের কোঠায়। — তবে জুম-ফসল কাটার সময় হালামদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী মলসুমরা ধনের দেবী লক্ষ্মীপুজা করে থাকে। এই পূজা এদের ঐতিহ্যবাহী

পূজা। ত্রিপুরী সমাজে যেমন ফসল পাকলে মাইলুংমা অর্থাৎ ধনের দেবীকে পূজা করা হয় — হালামরাও তেমনি লক্ষ্মীপূজা করে থাকে। তবে নিজেদের পদ্ধতিতে ওরা এ পূজা করে থাকে। এই পূজা উদ্‌যাপনের সময় দেবীকে সন্তুষ্ট করার মানসে মলসুমরা নারীপুরুষ দল বেঁধে গোলাকৃতি হয়ে বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গিমার মাধ্যমে নৃত্য পরিবেশনকে আকর্ষণীয় করে তোলে। এই হৈ-হক্-নৃত্য হালামদের সর্বজনীন জাতীয় নৃত্য বলে পরিগণিত। হৈ-হক্-নৃত্যের বিচিত্র ছন্দ-তাল-লয়ে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে তাদের স্মরণাতীতকালের জাতিগত কৃষ্টির পরিচয়। সুতরাং হৈ-হক্-নৃত্য কম গুরুত্বপূর্ণ হলেও রাজ্যের নৃত্য-কলার পরিমণ্ডলে এর সংযোজন অপরিহার্য।

ফাসিরং এবং বাংগেচর কাহিনী
(লুসাই লোককথা)

পুরাকালে কোন এক সময় এক বিধবা লুসাই রমণী বাস করত। তার এক সুন্দরী কন্যাকে নিয়ে তার সংসার। কন্যার রূপে মোহগ্রস্ত হয়নি এমন খুব কম যুবক গ্রামে বাস করত। দৈবক্রমে একদা এক মনুষ্যরূপী বাঘ এসে হাজির হয়। সে বাঘটি সুন্দরী কন্যাকে দেখে এক ভয়ংকর প্রস্তাব দিয়ে বসে যে সে বিধবা রমণীর জামাতা হতে ইচ্ছুক। প্রস্তাবটি শুনে বিধবা রমণী আতংকে নির্বাক হয়ে পড়ে। এতে বাঘটি রাগান্বিত হয়ে সুন্দরী কন্যাকে মন্ত্র-গুণে এক কদর্য যুবতীতে পরিণত করে দেয়। বৃদ্ধা মহিলা সে দৃশ্য দেখে আক্ষেপ সুরে গ্রামবাসীদের কাছে বলতে লাগল — "দেখ তোমরা সবাই আমার এমন সুন্দরী মেয়ে কেমন কুৎসিত হয়ে গেল। কোন যুবক তার রূপ ফিরাতে পারলে তার হাতে আমি আমার মেয়েকে তুলে দেব। আর যদি কোন মহিলা সে কাজ করতে পারে সে হবে আমার চিরদিনের সই।" বিধবার কথা শুনে মনুষ্যরূপী বাঘটি এক অচেনা মানুষের রূপ ধরে বৃদ্ধার কাছে গিয়ে বলতে লাগল — "শুনুন দিদিমা আমি অনেক দুরবর্তী গ্রাম থেকে এসেছি — আমার-ত এখানে চেনা কেউ নেই— যদি আমাকে আপনার বাড়ীতে কিছুদিন থাকতে অনুমতি দেন তাহলে আমার পরম উপকার হয়।" এক কথাতে বৃদ্ধা রাজী হয়ে গেল। কিছুদিন পর বৃদ্ধার মনমরা ভাব লক্ষ্য করে বাঘটি জিজ্ঞাসা করতে লাগল। এবং এও বলতে লাগল বৃদ্ধার দুঃখের কথা যদি সে জানতে পারে তাহলে তার প্রতিকার করতেও সে প্রস্তুত। বৃদ্ধা সহজে প্রকাশ করতে রাজী হল না — তবু বারবার পীড়াপীড়িতে বৃদ্ধা আসল কথাটি প্রকাশ করতে বাধ্য হয়। অতঃপর কপট বাঘটি তৎক্ষণাৎ মেয়েটিকে আবার পুর্বের রূপে পরিণত করে দেয়। পুর্বশর্ত অনুসারে বৃদ্ধা রমণীটি খুশীমনে মনুষ্যরূপী বাঘের সঙ্গে মেয়েটিকে বিয়ে দিয়ে দেয়। নবদম্পতি বৃদ্ধার বাড়ীতেই সুখে শান্তিতে দিন অতিবাহিত করতে লাগল।

এভাবে দীর্ঘ বছর কেটে গেল — একদিন মানব বাঘটি স্ত্রীকে নিয়ে নিজ বাড়ীতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। বৃদ্ধার অনুমতিক্রমে স্ত্রীকে নিয়ে রওনা হবার পর গ্রামের সীমানার ওপারে পাড়ি দেবার সঙ্গে সঙ্গে মানব-রূপী বাঘটি প্রকৃত বাঘের মূর্তি ধারণ করে। মেয়েটি বাঘের নিজমূর্তি দেখে অনবরত অশ্রুবিসর্জন করতে লাগল। গ্রামের এক বৃদ্ধা মহিলা সে দৃশ্য দেখতে পেয়ে গ্রামবাসীদের গোচরে এনে দেয়। বাঘটি মেয়েকে পিঠে করে পালিয়ে যাবার ভয়ঙ্কর দৃশ্য বর্ণনা করতে লাগল। গ্রামবাসীরা সব জেনে শুনেও কোন প্রতিকারের সিদ্ধান্ত নিতে পারল না — বাঘের হাত থেকে মেয়েকে উদ্ধার করা অত্যন্ত ঝুঁকিবহুল কাজ।

অবশেষে ফাসিরাং এবং বাংগেচর নামে দুইভাই কাহিনীটি জানতে পেরে মেয়ের উদ্ধারের অভিযানে বেরিয়ে পড়ল। হাতে দা এবং বর্শাই তাদের অস্ত্র। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফাসিরাং ভয় পেয়ে যাত্রা থেকে বিরত থাকে — সাহসী কনিষ্ঠ ভ্রাতা একাই দা ও বর্শা নিয়ে বাঘরূপী মানুষের আবাসে গিয়ে আচমকা আক্রমণ করে মেরে ফেলে। মেয়েটিকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয় — অতঃপর বহুদিন সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে।

কলই লোকসংস্কৃতি

আইয়া বিদায়নি রুচাপ্‌মোং

(বিবাহের পর আইয়া বিদায়ের গান)

অ — নখালে গুরুম ওয়ানাদে ওয়াগুরুমইদে

অ — পাসল থাংন।

অ — জান্‌বাই পিরীতি ব বাই নো

কেনা কাগুই মান গলাক্নাও বাই

চিক্‌ন সারেগুা যাগ্‌বাই ভুলি তুই

ধন বাই চুং ভুলি না দোই।।

কিতিং কতাংনি বাইলেং ক্ষং

বাই বা তম্‌া মাই মুংনো ক্ষুই নাই।।

কলাউকে ক্ষুই নাই কিতিং দে ক্ষুই নাই

ভবতুই মাই মুং ন্ ক্ষুই নাই।।

চুংলে ছিলাইয়া হরি বিবি, নাউত্তনি ধর্ম ইচ্ছা,

কিতিং ব্ছাতে মাইতুক পাইয়া

তুখুছা পাইয়ই রি দি ।।

কিতিং বছাতে তুই খ্গুই পাইয়া

লাংগিছা পায়ওই রি দি।

ন্খা কস্মোনি ওয়াতুই

তাওমা — কস্মনি তাও তুই

খা বিছিং বিছিং খা ওয়ান্ সক্ খলাই

চিনি মকল মুকতুই।।

ভাবার্থঃ বিয়ের পর বিদায়ের সময় বিদায়ীরা যে ব্যথা অনুভব করছেন, এখানে এই বিদায়কালীন সঙ্গীতের মাধ্যমে তাই ফুটে উঠেছে। বিদায়ীদের পক্ষ থেকে গাওয়া হচ্ছে যে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে মেঘের গুরু গুরু গর্জন করলেও বৃষ্টি হবে কিহবে না তা যেমন সঠিক ভাবে বোঝা যায় না, তেমনি এই বিদায়ের মুহূর্তে আমাদের বিষণ্ণ হৃদয়ও তোমাদের ছেড়ে যাব কি যাব না ভেবে স্পন্দিত হচ্ছে।

একজন সুদক্ষ সারিন্দা (বাদ্যযন্ত্র) বাদকের হাতে সারিন্দা যেমন মধুর লাগে এবং তার সুর মানুষের হৃদয়ে যেমন দীর্ঘদিন গেঁথে থাকে, তেমনি তোমাদের ভালবাসাও আমাদের হৃদয়ে মধুর স্মৃতি হয়ে গাঁথা থাকবে।

তারপর নববধূকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে যে, গোলাকৃতির কুলা দিয়ে তুমি কি ধানের চাউল এবং কোন ধরণের চাউল ঝাড়াই করবে (অর্থাৎ তোমার কপালে কি আছে) তা আমরা জানি না। একমাত্র সৃষ্টির্তাই (শ্রীহরি ভগবানই) জানেন।

এর পর বরকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে যে, অল্প বয়সের সুষমা মণ্ডিত ছোট এই নববধূকে ভাতের হাঁড়ি তুলতে না পারলে ছোট একটি পাতিল কিনে দেবে এবং কলসী দিয়ে জল তুলতে না পারলে ছোট একটি ঘট (লাংগি) কিনে দেবে।

গায়ক আবার বলছেন যে, আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন হলে যেমন কাল রং এর মোরগের ন্যায় কাল রং ধারণ করে, সেরূপ তোমাদের ছেড়ে যেতে আমাদের হৃদয়ও গভীর কান্নায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

কলই যুবক যুবতীদের প্রণয় গীতিকে বলে "ছিকলারগনি রুছাপ্মুং"। যুবতীরা

এখনও যে সব প্রাচীন প্রণয়গীত গেয়ে থাকে তার একটি নমুনা নীচে দেওয়া হয় ঃ

১ নং গান

অ—মা— অ— মা—মাইতুক কুতুঅ

অ— কাঠি মথাংগো।

অ— খাপাংনো সুবাছে মুথাক্

নখা গুরুম অ, ওয়াতৈ মুথাংগ।

অ—রাজানি দালান —দালান বাই পাকি।

দালান পাকি বা খলাই নাংবাই নাংবাই।

অ—ব-খানদে নাংবাই।

অ—মা — অ—মা —

মাইতুক কুতুঅ, অ কাঠি মথাগো

অ— খাপাংনো — সুবাছে মুথাক্ ।।

(এখানে গায়িকা মাকে সম্বোধন করে বলছে যে ভাতের ডেক্ (ভাত রান্নার পাত্র) -এ আগুন দিলে যখন টগ্‌বগ্ করে ফুটে তখন একমাত্র হাতাই ডেকের ভিতরের টগ্‌বগ্‌কে থামাতে পারে। কিন্তু মনকে কে থামাতে পারে ? আকাশে মেঘ গর্জন করলে বৃষ্টিই এই গর্জনকে থামাতে পারে। কিন্তু মনকে কে থামাতে পারে ? রাজার বাড়ীর পাকা দালানও মনকে থামাতে পারে না। হে মা তুমিই একমাত্র মনকে থামাতে পার।)

কলইদের মধ্যে যে সব প্রাচীন প্রণয়গীত প্রচলিত আছে তার একটি নমুনা নীচে দেওয়া হল।

২নং গান

অ—আব্বাং— আব্বাং — আব্বাং,

আবাং-নো মৈত মানু

কুমার হা তাক্‌মানি হা বারা —

আবাংলে হামানি বারা বা ঐ

মোতাইলে তাক্‌মানি হা বারা

আবাং হা মানি বারা নাদো

ঘাটি তৈই খগমানি তৈইতিলক

তৈইমত আবা মত্‌ম মানি বারা

তৈইসানি তৈই স্রাই-স্রাই

আবাং নোখলাই খা স্রাই-স্রাই।

(এখানে প্রেমিক তার প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করে স্বাগতোক্তি করছে যে, তার প্রেমিকার কথা মনে পড়ছে। মৃৎশিল্পী মাটি দিয়ে যেরূপ সুন্দর সুন্দর কারুকার্য করে, সেরূপ তার প্রেমিকাও দেখতে খুব সুন্দর। মাটি দিয়ে দেবতার (মাতাই) প্রতিমা তৈরী করার পর অবশিষ্ট মাটি দিয়ে মূর্তি তৈরী করলে যেরূপ সুন্দর দেখায় তার প্রেমিকাও সেইরূপ সুন্দরী। ছড়ার জল (ছোট পাহাড়ী নদী) যেমন খুব স্বচ্ছ সেরূপ আমার প্রেমিকাকে দেখলেও আমার মন পরিষ্কার হয়ে যায়।

৩ নং গান

বিভিন্ন প্রকারের প্রেম-প্রীতির গান ছাড়াও দুঃখ ও বেদনার গানেও কলই লোক-সাহিত্য সমৃদ্ধ। তাদের বেদনার গানগুলি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। স্বামী মারা যাওয়ার পর স্ত্রীর হৃদয়ে যে ব্যথা অনুভূত হয়, তারই প্রকাশ পায় তাদের, "বুছাই থুই-মানি দুঃখ খা্‌লই রূছাপমুং" নামক গানগুলিতে ।

হই — অমা — মা — মায়সংগ,

মায়ুংনি আগো জনম নখলাই।

অমা — মায়ুংনি অগো জনম না জাগৈ,

অনা — অবতার ফেরগ মানলিয়া।

অ — মায়সংগ — অ — মায়সংগ —

গড়িয়া পূজার গান

ত্রিপুরার বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর ন্যায় কলইরাও অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে 'গড়িয়া' পূজা করে। এই গড়িয়া পূজার সময় কালে গ্রামগুলি নৃত্যগীতে মুখর হয়ে উঠে। এ ব্যাপারে কলইদের গানের সঙ্গে ত্রিপুরী, নোয়াতিয়া ও রিয়াংদের গানের যথেষ্ট মিল দেখতে পাওয়া যায়। গড়িয়া'র প্রতিকৃতি নিয়ে গ্রামের বিভিন্ন বাড়ীতে গিয়ে কলই যুবকরা দলবেধে গৃহস্থকে জানিয়ে দেয় এই বলে।

আইলামরে — আইলামরে —

গড়িয়া রাজা দেশ বেড়ায়, ঘর গৃহস্থী হজাগ কর।

গড়িয়া রাজা দেশ বেড়ায়, দেশে দেশে বইত চায়।

টিলা টংকর ভাঙ্গিয়া, ছাপ ছড়া শুকাইয়া —

গড়িয়া রাজা ঢোল বাজাইল উজির নাম।

খরগ আইছে — বানাইয়া।

গড়িয়া রাজা বইতে চায় আগুন পানি তৈয়ার কর।

আইলামরে — আইলামরে

গড়িয়া রাজা বইতে চায়

অরে খেরেং বাই

মোরগ পাইলে কাটিয়া দে,

ডিম পাইলে গড়িয়ায় দে

সোনা রূপা বরবরাইয়া

ধানস তা বরবরাইয়া

টাকা পয়সা বান্দিয়া।

তারপর সবাই গোল হয়ে নাচে এবং ভঙ্গিমা করে বলে

ভালরে ভালরে ভাল,

ঠ্যাং তুলিয়া নাচ।

ঢাকের তালে তালে তারা বিভিন্ন প্রকার গান গেয়ে থাকে

মা চাইয়া ব ফাইয়া

মা নুংয়া ব ফাইয়া

অঃ বাঈলে নাইখলায় তংনায়।

ব ন নাই নাছে ফাই অ,

ভালরে ভাল ভাল।

গড়িয়া পূজাকে কেন্দ্র করে কলইদের মধ্যে অনেক হাস্যরসের গানও গাওয়া হয়

ঐ গড়িয়া ঐ

অ গড়িয়া ঐ

চিনি পাড়ানি — সিকলারগ —

সিতত্তয় লোপে পেই

আতুকা বখর লোপে

আতুকা বখর লোপে

আতুকা বখর লোপে

চিনি পাড়ানি সিক্‌লারগলে

সিতত্তর লোপে পেই।।

'গড়িয়া' পূজার নৃত্যগীতকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে 'খাম' (ঢোলক) বাজানোর বিভিন্ন প্রকার তাল বা বোলেরও প্রচলন আছে। নর্তকেরা যখন নাচে তখন 'খাম' এর (ঢোলকের) মধ্যে যে সমস্ত তাল বা বোল ফুটে উঠে সেগুলি হল —

১। লাস —

গান্ কি ঘাঘান ঘিচন্ গান

চন্ গান্ গান্ ঘিচন্ ঘিচন্

ঘিচন্ চুগান ঘিচন্ গান্

চন্ গান্ গান্ ঘিচন্ ঘিচন্

২। তক্‌মা-মুই-ক্রাকমানি —

গানি গানি ঘান্ চন্ চন্

চুগান্ গাগান্ চন্ চন্

গড়িয়া রাউনি রুচাপমোং

(গড়িয়া পূজার বিবিধ গান)

অ— মায়া চৈত্র থাংকা বা

বৈশাখ্ ফাইফি খা বছরসন্ ফিরাউ ফিখা।

অ— খনজ্‌ন থাংকা বা, তিলিয়া ফাইখা

বছর সন ফিরাউ ফিখা।।

অ — মায়, জাক্‌নিছি, দা সড়া

তাউচিং করং বাই তাংগুই চানানি নাং নাই।।

অ— মায়, অ— তিনিলে সালছা ছি।

অ— রঙ্গ তামছা খনালে মাই চু চুছা।।

(উপরোক্ত গানটি গড়িয়া পূজা আরম্ভ হওয়ার দিন থেকে অর্থাৎ বৈশাখ মাসের প্রথম দিন গাওয়া হয়।)

ভাবার্থ ঃ এখানে গড়িয়া দেবতাকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে বৎসরের শেষ ভাগে যেমন 'খনজন' পাখী চলে যায় এবং 'তিলিয়া' পাখী আসে সেরূপ চৈত্রমাস শেষ হওয়ার পর বৈশাখ মাস ফিরে এসেছে। এভাবে বৎসর শেষ হওয়ার পর আবার নূতন বৎসর ঘুরে আসে। আজকের দিনটি খুবই খুশীর দিন, এই এক দিনের জন্যই এত আনন্দ, কিন্তু কালই ভাতের মুচা নিয়ে জুমের কাজে যেতে হবে। আগামীকাল এই দিনটি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ হর্ষ ও বিষাদ চক্রাকারে ঘুরছে।

গড়িয়া বিসর্জনের গান

অ— সাল বোথাং রু রুগ্

মকল কাই রুরুগ্

তিনি তংগু লাক্ না-ধু।।

অ— গোলযুং তান ফাই য়ই।

যাখুরাই বাদি মামা জাক্ তলুই তুইদি।।

যান্ কইলি সং।।

(এই গানটি গেয়ে গড়িয়া বিসর্জন দেওয়া হয়)

ভাবার্থ ঃ এখানে গড়িয়া দেবতাকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে দিন আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে, দিন চলে যাওয়ার পর ক্রমে ক্রমে রাত্রি হয়ে যাচ্ছে, গড়িয়া দেবতার চোখেও ক্রমে ক্রমে ঘুম আসছে। গড়িয়া দেবতা বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। 'গোলযুং ফাং' (এক জাতীয় গাছ) কে কেটে সেতু তৈরী করে গড়িয়া দেবতাকে নিয়ে যাব। হে আমার সঙ্গীগণ, আজ আমাদের গড়িয়া দেবতাকে বিসর্জন দেব।

গড়িয়া বিসর্জনের পরের গান

অ — জালাই সাও চাদি

থেরায় বাচাঁ থুন,

অ — কাঙাল মুই কুথুং মান্ থুন্।

অ — জালাই সাও চাদি

অ — থেরায় বাচা থুন্

অ —   কাঙাল মুই কুথং মান্থুন্।।

(গড়িয়াকে বিসর্জন দেওয়ার পর ফেরার সময় এই গান গাওয়া হয়।)

'জালাই' এ (অপেক্ষাকৃত নীচু এলাকায়) যেমন 'থেরায়' গাছ (এক জাতীয় গাছ যা সাধারণত সমতল ভূমিতেই জন্মে, এই 'থেরায়' গাছ পুড়লে প্রতিবৎসর নূতন করে এই গাছ জন্মে।) পোড়ে দিলে নতুন করে জন্মে সে রূপ গড়িয়া দেবতাকে বিসর্জন দেওয়ার পর নূতন বৎসরকে যেন আবার আমরা নূতন করে পাই।

চুরাই মুথুমানি রুচাপ্মোং

(ঘুম পাড়ানির গান)

অ — হে বাবুলে থুয়ইছে

মাই মা চাও থুয়াই মাই মা চাইয়া বাবু।

হে বাবুলেই ওয়ায়েং ধুক্ নারনাই দুক কুরুই

ধুক নারনাই বেগারী কুরুই বাবুলে

থু — যাদি দ।

বাবুলে ধুক্ নারনাই, ধুক বেগারী কুরুই

বাবুলে থুযাদি দ ।

ভাবার্থ ঃ এখানে শিশুকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে যে, হেবাবুধন তুমি ঘুমালে ভাল ভাল খাবার পাবে, না ঘুমালে পাবে না। তোমার দোলনার দড়ি টানার জন্য কোন লোক নেই, অতএব তুমি তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড় ।

কলই লোকসাহিত্য

কলইদের প্রণয়মূলক গান, ঘুমপাড়ানী গান, গল্প, ধাঁধা, প্রবাদ প্রভৃতি তাদের লোকসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। অন্যান্য জাতি, উপজাতির ন্যায় কলাইরাও তাদের কথবার্তা, হাস্যরসের সময় এই সব লোকসাহিত্যের উপাদানগুলিকে ব্যবহার করে। কিন্তু লোকসাহিত্যের এই উপাদানগুলিকে সংরক্ষণ না করার ফলে এবং এ ব্যাপারে কলই যুবকদের উদাসীনতার ফলে তাদের লোকসাহিত্যের উপাদানগুলি অবলুপ্তির পথে গ্রামের বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মুখে এখনও কিছু ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, গল্প ইত্যাদি শোনা যায়। এখনই এগুলি সংগৃহীত না হলে একদিন হয়ত একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে উৎসাহী সংগ্রাহকদের এখনই এগিয়ে আসা উচিত ।

এখানে উল্লেখ্য যে, কলই লোকসাহিত্যের উপাদানগুলি সামান্য উচ্চারণগত পার্থক্য-ছাড়া ত্রিপুরীদের প্রায় অনুরূপ। এ ব্যাপারে রিয়াংদের সঙ্গেও তাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

নিম্নে কলইদের মধ্যে প্রচলিত নানা ধরনের গল্প, প্রবাদ ও ধাঁধার কিছু নমুনা সংগ্রহ করে দেওয়া হল।

মখরাছানি কেরেং ককতীমা
(বানরের গল্প)

একদিন সাতবোন একসঙ্গে তাদের পুরাতন জুম থেকে বেগুন আনতে গিয়েছিল। জুম থেকে বেগুন নিয়ে আসার সময় রাস্তার পাশে ছোট পাহাড়ী নদীতে স্নান করার জন্য তাদের খুব ইচ্ছা হল। তখন তারা নদীর পাড়ে তাদের কাপড় চোপড় রেখে নদীতে স্নান করতে নামল। তখন একটি বানর পাশের একটি জঙ্গলে ছিল। সে এই সুযোগে ঐ সাতবোনের কাপড় চোপড় নিয়ে গাছের উপরে উঠে পড়ল। এদিকে স্নান শেষ করার পর সাতবোন নদীর তীরে উঠে তাদের কাপড় দেখতে না পেয়ে চারদিকে দেখতে লাগল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই কাপড় সহ বানরকে গাছের ডালে দেখতে পেল। তারা বানরকে তাদের কাপড় ফেরৎ দেওয়ার জন্য অনেক অনুরোধ করল কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। তখন কাপড় না পেয়ে হাত দিয়ে তারা লজ্জা নিবারণ করতে লাগল। বানর তখন তাদের প্রত্যেক বোনকে একহালি (চারটি) করে বেগুন নিয়ে গাছের একধাপ করে উপরে উঠে কাপড় নেওয়ার জন্য বলল। প্রথমে সবচেয়ে বড়বোনকে বেগুনের পরিবর্তে তাদের কাপড় ফেরতদিল। এভাবে বানর ছয়বোনকেই ক্রমান্বয়ে বেগুনের পরিবর্তে তাদের কাপড় ফেরত দিল। কিন্তু সবচেয়ে ছোট বোন যখন তার কাপড় আনতে গাছের কয়েক ধাপ উপরে উঠল তখন বানর তাকে দুই হালি বেগুন নিয়ে আরও দুই ধাপ উপরে উঠার জন্য বলল। এভাবে ছোট বোন কাপড় নেওয়ার জন্য যতই উপরে উঠে বানর তাকে ততই একধাপ করে উপরে উঠার জন্য বলতে লাগল। এভাবে ক্রমে ক্রমে বানর গাছের একেবারে উপরে উঠে গেল এবং ছোট বোনকেও গাছের উপরে তুলে নিল এবং সেখানে তাকে আটক করে রাখল।

এ অবস্থায় পড়ে ছোটবোন তার দিদিদেরকে কাঁদতে কাঁদতে তার দুরবস্থার কথা জানাল। তখন কোন উপায় না দেখে তার বড়বোনরা তাকে ঐ বানরকেই বিয়ে করে তার সঙ্গে সেখানেই থাকার জন্য বলল। ছোটবোন তখন কাঁদতে কাঁদতে অসহায়ের মত সেই বানরকেই বিয়ে করল এবং তার সঙ্গে বাস করতে লাগল। তারপর একসময় ছোট

বোন গর্ভবতী হল। তখন একদিন সে বানরের কাছে টক খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল এবং বন থেকে লটকন গোটা (এক জাতীয় টক ফল) আনার জন্য বলল।

তখন বানর ঐ টকফল আনতে গিয়ে ঐ ফল দেখে খাওয়ার জন্য তার খুব লোভ হল ও সে একমনে টকফল খেতে লাগল এবং বাড়ীতে আনার কথা ভুলে গেল। শেষে সন্ধ্যার সময় ঝুড়িটা দেখে তার স্ত্রীর কথা মনে হল এবং ঝুড়ি ভর্তিকরে টকফলের খোসা নিয়ে বাড়িতে এলো। তার স্ত্রী ঐ খোসাগুলি দেখে বানরকে যথেষ্ট গালাগালি করল। তার কিছুদিনের মধ্যেই বানরের স্ত্রী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল এবং তার নাম রাখল 'তটে'। এর বেশ কিছুদিন পর বানরের স্ত্রী বানরকে টকফল আনার জন্য বললে বানর একটি ঝুড়ি নিয়ে 'নেওড়া' গোটা (টক জাতীয় এক প্রকার ফল) আনার জন্য দূরবর্তী একটি বনে গেল। এই সুযোগে বানরের স্ত্রী তার বাচ্চাটাকে নিয়ে তার বাপের বাড়ী পালিয়ে গেল।

এদিকে সন্ধ্যার সময় বানর নেওড়া গোটা নিয়ে এসে তার স্ত্রী ও আদরের পুত্র তটেকে ডাকতে লাগল। কিন্তু তাদের কোন সাড়া না পেয়ে সে ভয় পেয়ে গেল এবং ঘরের চারদিকে অনুসন্ধান করে তাদের দেখতে না পেয়ে সে মনের দুঃখে একটি খঞ্জরী (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র) হাতে নিয়ে তাদের সন্ধানে গান গেতে গেতে বিভিন্ন জায়গা ঘুরতে লাগল। সে সময় বানর যে গানটি গেয়েছিল তা হল ঃ

দুনিদং দুরোং দুনিদং আনিতটেমা

বিয়াং থাং।

বৌছা তটেনানো ভাতে রুই

নকথাই সুকুই থাং হরতে রুই

দাছা দামারো তুইতে রুই

(হে প্রিয়া — তুমি ও আমার আদরের ছেলে 'তটে' আজ কোথায় ? বাচ্চাটাকে কোলে করে সুন্দর ঝুড়ি নিয়ে আজ তুমি কোথায় গেলে।)

এভাবে বানর গান গেয়ে তার স্ত্রী-পুত্রকে খুঁজতে খুঁজতে বিভিন্ন জায়গা ঘোরার পর একদিন সে তার শ্বশুর বাড়ী এসে হাজির হল। তার শ্বশুর-বাড়ীর লোক তাকে দেখে মারার জন্য তখন দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাদের মাথায় বানরকে মারার জন্য একটি সুন্দর পরিকল্পনা আসল। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা বানরকে কোন কিছু বুঝতে না দিয়ে প্রথমে তাকে ভাল করে খাবার দিল এবং রাত্রিবেলা তাকে একটি ভাঙ্গা মাচায় ঘুমাবার জন্য দিল। মাচার নীচে কুকুর, শূকর ইত্যাদি ছিল এবং সরু

সরু বাঁশের টুকরাকে কেটে মাচার নীচে খাড়া করে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। রাত্রিবেলা খাওয়া দাওয়ার পর বানর তার স্ত্রী ও বাচ্চাকে নিয়ে ঐ মাচায় ঘুমোতে গেল। কিছুক্ষণ ঘুমাবার পর বানরের স্ত্রী তাদের বাচ্চাটা (তটে) নীচে পড়ে যাবে বলে বানরকে একটু সরে ঘুমাবার জন্য বলল। বানরকে সন্ধ্যার সময় প্রচুর মদ খেতে দেওয়া হয়েছিল বলে সে এই ষড়যন্ত্রের কিছুই টের পেল না। তারপর বানর যখন মাচার ভাঙ্গা অংশের কাছাকাছি এলো তখন তার স্ত্রী তাকে আরও একটু সরার জন্য বলল। বানর যখন একটু সরলো তখনই সে নীচের খাড়া করা বাঁশের উপর পড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই শূকর ও কুকুরের কামড়ে বানর মারা গেল। এর পর বানরের স্ত্রী পাড়ায় পাড়ায় বানরের শুকনা মাংস বিক্রি করতে লাগল। কিন্তু তার বাচ্চাটা সবাইকে তার বাবার মাংসের কথা বলে দেওয়ায় বানরের মাংস আর বিক্রি হল না।

রিয়াং লোকসংস্কৃতি

রিয়াং সঙ্গীত

রিয়াংরা অত্যন্ত গীতিপ্রবণ-বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গানবাজনা করা তাদের স্বভাবজাত। যুবক যুবতীদের মন দেওয়া নেওয়ার রোমাঞ্চকর গীতি আলেখ্য নিম্নে দেওয়া হল। এ জাতীয় প্রেম সঙ্গীত রিয়াং সমাজে বহুল পরিমাণে মুখে মুখে প্রচলিত ও গীত হতো অতীতে।

ধান পাকলে আবার পাড়া-পড়শীদের নিয়ে রিয়াংরা ধান কাটতে যান। প্রথমবার ধান কাটাকে বলে 'বেতি কপ্‌রু'। পৌষ ধানের গাছগুলি তখনও ক্ষেতে থেকে যায়। দ্বিতীয়বার যখন ধান কাটা হয় তখন তাকে বলে 'বাদিয়া'।

গীতি দ্বন্দ্ব ঃ জুম পাহারা শুধু একঘেয়ে কাজ নয়, যুবক-যুবতীদের মধুর সরস গীতি-দ্বন্দ্বে নিঃস্তব্ধ বনভূমি মুখরিত হয়ে ওঠে। এর মাধ্যমেই যুবক-যুবতীর মনের আদান-প্রদান হয়ে থাকে এবং ভবিষ্যতের সুখময় দাম্পত্য জীবনের স্বপ্নময় পটভূমিকা রচিত হয়।

চেলা ঃ আদুঅই মোকন্দা তুই ইয়ং য়্যাফা তুইমা
কাছলাই নুং বাইমা হিম খ্লাই, _
থুইঅই খাছকু থাংখামুন্।

নর ঃ মগদামের পাতা ছাড়ালে তা যেমন সুন্দর দেখা যায়, তুমিও সেইরূপ সুন্দর।

তোমার সঙ্গে মিলে হেঁটে আমি মরলেও শান্তি পাব।

বুরুই ঃ তাতাঅই, সাক্‌বুই কক্‌ন সাম্লাই

কাটিনি আথুক দে — কছক তা অংসিদি ।

হে ভাই, তুমি আমাকে সত্য করে বল যে, তুমি যদি আমাকে ভালবাস তবে ঘাটের চিংড়ি মাছের মত পেছন দিকে যেও না।

চেলা ঃ তল্‌বাই ভাতা নুংলে, রংফাইনি গোদালব

আওঅংখ্লে, ইয়ারুং বামছি ওয়াই মাইদা দে ?

নর ঃ তুমি কচি 'বাতা' গাছের মত। আমার কোদাল যদি নতুন হত তবে আমি তা শিকড় সমেত তুলতে পারতাম না কি ?

বুরুই ঃ তুইমানি করুয়া নুংলে,

একরাংনি তগলা আং অংখ্লাই

আইচুক ছিম বাই, ছিবকহা ছিলাইয়া দে ?

নারী ঃ তুমি যদি বর্ষার দিনের কুড়াল পাখী হতে আর আমি যদি ঘরের পাশের মোরগ (রাতা) হতাম তা হলে দু'জনে ভোরে সুরে সুর মিলিয়ে ডাকতে পারতাম না কি ? অর্থাৎ ভোরে কুড়াল এবং মোরগ যেমন সমস্বরে ডাকে, আমি আর তুমি মিলিত হলে আমরাও জীবনের গান সমস্বরে গাইতে পারতাম।

চেলা ঃ সে কামই ছিমি মুই খুংরুং ফাংঅ

তক্ খুহাদে চর কালাইন ?

ওয়াখইয়া নাদুং বাই,

খুম্‌চইয়া আথুংবাই

কাইয়ে বা রেছমই চালাই নাদি।

নর ঃ গাছে-বসা পাখী কুকি-শিকারীর দ্বারা বিদ্ধ হলে যেমন সুন্দর দেখায়, নিশি-রাতে পেচার সুর যেমন মানানসই, কানের দুলের সঙ্গে ফুল পরলে যেমন সুন্দর দেখায়, জুমের লাল ফুল যেমন কানের দুলের সঙ্গে মানানসই, তেমনি তোমার সাথে আমার বিয়ে হলেও মানাবে।

বুরুই ঃ সাক্লুং ছাতি মা হুলাংথুন্।

তুই বিছিং জুতা মা কালাংথুন্।

নারী ঃ হে বন্ধু, তুমি যদি আমাকে ভালবেসেই থাক, তবে ছায়ার মধ্যেও ছাতি মাথায় দিয়ে আর জুতা পায়ে দিয়ে জলেও হাঁটতে হবে। অর্থাৎ বিরক্তিকর কাজও করতে হবে।

চেলা ঃ কপ্রুনি নারা হুগ্রাথুন্ বাঁদিয়া মাইবকতু চক্রাথুন
তক্রুইনি শিকার থাং লাইনি ফন।

নর ঃ জুমের প্রথম ধান কাটা হলে, দ্বিতীয়বার ধান কাটার সময় পর্যন্ত প্রথমবারের ধান শুকিয়ে যায়। সে সময় শিকারী যেমন নিঃশব্দে বন-পথে চলে আমরাও সে রকমভাবে যাব। অর্থাৎ আমরা গোপনে পালিয়ে যাব যদি না বড়রা আমাদের বিয়ে দিতে রাজী না হয়।

চেলা ঃ ওয়ার না ছংঅ নক্ তাংইয়া-খ।
বাখা ওয়ানামা ক্লাইয়া-খ।

নর ঃ মৃত্তিঙ্গা বাঁশ দিয়ে কখনও ঘর তৈরী করিনি, মনেও কোন দিন দুশ্চিন্তার উদয় হয় নি। তুমি আমি যখন মিলেছি তখন কি আর চিন্তা।

বুরুই ঃ ওয়াছ্ ছক চনি দান্ত্ই বাই
গরিয়া ফংন কলম কংবাই
য়াংখুং বুড়া কাব্জ বাই
তক্মা কারিদে ছুইয়া নমি
রবম কলমছে মাইবিখানা —

নারী ঃ পুরানো বাঁশের আগা দিয়ে তৈরী দোয়াত, মরিচ চোঙ্গার মধ্যে গুঁড়া করবার জন্যে যে "গরিয়া ফং" (সরু কাঠিটি) ব্যবহার করা হয় তা দিয়ে কলম তৈরী করে আর ধান রোদে দেওয়ার জন্যে যে চাটাই ব্যবহার করা হয় তাকে কাগজ করে ব্রহ্মা আমাদের কপালে লিখেছেন। সে লেখা আবার মোরগের বাচ্চাগুলি হেঁটে গেলে যেমন পায়ের দাগ পড়ে সেইরকম, তা ভাল কিং মন্দ জানি না। তবু আমাকে সেই ভাবেই চলতে হবে। অর্থাৎ মা-বাবা বিয়ে না দিলেও আমাকে আমার অদৃষ্ট অনুসারে চলতে হবে।

চেলা ঃ ওয়ারনা চক্নি তলাই ফুম বাই,
সেকাং ফরফরি বাই তুইঅ অংথুন্।
ইয়াগুল খাম কারা বাই তুইঅনংথুন্।

নর ঃ আমি মরলে যখন পালংকে করে সামনে পতাকা টাঙিয়ে বাজনা বাজিয়ে নিয়ে যাবে আমি তখনও তোমাকে ছাড়ব না। অর্থাৎ মরলেও দজনেই সমানে মরব. বাঁচলে দুজনেই সমানে বাঁচব।

বুরুই ঃ সত্য থাইছানি পান্দত কাহাম
সত্য বাই পন্দিত অং খ্লে ;
বার তিতনি হর চুংআনু, বার গংগা তুই তংনাইছে।

নারী ঃ তুমি তোমার সত্যে স্থির থাকলে এবং আমি আমার সত্যে স্থির থাকলে বারো তীর্থের (বারো তীর্থ বলতে চতুর্দশ দেবতাকে বুঝায়) যজ্ঞের আগুনের মত আর বারো গঙ্গার জলের মত চিরদিন স্থির থাকব। আমাদের কখনও বিচ্ছেদ হবে না।

চেলা ঃ জান পাতা তরুলতা মা
সত্যবাই পন্দিত অং খ্লে —
তুইঅ কাইব ইয়ারুং ছনাইছে —
হাকুং কাইব বছক হুই নাইয়া।

নর ঃ তুমি আমি সত্য থেকে বিচ্যুত না হলে রাস্না (অর্কিড) জলে লাগালেও তার শেকড় আঁকড়ে থাকবে। আবার উঁচু পাহাড়ে লাগালেও তার আগা শুকিয়ে যাবে না।

বুরুই ঃ ওয়ান্ জুই নগ ওরকে ওরিবামা,
সত্যবাই পন্দিত অংখ্লাই,
মাছে তুইঅ খুম বকখ্লে,
সত্য ধর্ম থির তংনাইছে —

নারী ঃ তোমার মা এবং আমার মা যদি বাঙালীর উঠানের জবাফুল নিয়ে গঙ্গাতে পূজা দেয় তবে আমি এবং তুমি এক হতে পারব।

চেলা ঃ পানথর শালুয়া দেব্লুইঅ
গালা গাছমাই চুইয়া বা
ব-র সরদাই মুই নুক হইছি-ন ?

নর ঃ আমি মাঠের 'শালুক' আর তুমি হলে উঁচু পাহাড় বা টিলাভূমি। তোমার কি করে আমি নাগাল পাব ?

বুরুই ঃ ছছমুই ঘাতি তৈয়ারীঅ,
কাছইতি ফলা রঅনামি,
তাতাঅই —

নারী ঃ হে প্রিয়, পরিষ্কার জলের ঘাটে যেখানে গভীর জল সেখানে তুমি স্নান করতে চাইছ আবার ভয়ও পাচ্ছ; আমি তোমাকে এত করে আশ্বাস দিলাম তাতেও তুমি ভয় পাচ্ছ। তবে কেন তুমি এ কাজে এগিয়ে আসছো ?

চেলা ঃ ছাগর গোম্‌তি তুইবাই ফুঅ,
বাই য়্যারুং থাংহা ক্লাইনমি ;
থুইয়াফ খাছকু থাংনা নাইয়া —

নর ঃ এ পৃথিবীতে আসার সময় তুমি আমি এক নৌকা দিয়েই ভবনদী পার হয়ে এ

পৃথিবীতে এসেছি। তোমার সঙ্গে মিলিত হয়ে আমি মরেও একসঙ্গে ভবনদী পাড়ি দিতে না পারলে আমার শান্তি হবে না।

হজাগিরি নৃত্য

হজাগিরি নৃত্য ত্রিপুরার উপজাতীয়দের শ্রেষ্ঠতম নৃত্যধারা। হজাগিরি বাঙলার কোজাগরী থেকে এসেছে। লক্ষ্মী-পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে হজাগিরি নৃত্য পরিবেশিত হয়। এই নৃত্যকে রিয়াং নৃত্য বলে পত্র-পত্রিকায়, বিশেষ করে তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন বিভাগের পত্র-পত্রিকায় পরিচয় প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু এটা ঠিক নয়। রিয়াং ছাড়াও ত্রিপুরী ও অন্যান্য ককবরকভাষী সমাজেও হজাগিরি নৃত্য প্রচলিত আছে।

রিয়াং সমাজে হজাগিরি নৃত্য অধিক প্রচলিত। কেননা হজাগিরি নৃত্য ছাড়া রিয়াং সমাজে অন্য কোন উল্লেখযোগ্য নৃত্যধারা প্রচলিত নেই — যেমন ত্রিপুরীদের মধ্যে রয়েছে নানাবিধ নৃত্যধারা — গড়িয়া, লেবাং বুমানি, আথুক, রমমানি, মশক বুমানি ইত্যাদি।

ত্রিপুরার উপজাতীয় নৃত্যধারার পরিচয়-প্রসঙ্গে আমার একটি বিশেষ বক্তব্য — তা হচ্ছে, মানব-সমাজে প্রচলিত নৃত্যধারাকে বিভাজিত করে আদিবাসী নৃত্য, লোকনৃত্য এবং ক্লাসিক নৃত্য আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দের (বিশেষ করে উপজাতি) প্রচলিত নৃত্যধারাকে আদিবাসী নৃত্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বর্ণিত হয়েছে বৈচিত্র্যহীন ও বহিঃসংস্কৃতি বলে ও বৃহত্তর সমাজবিচ্ছিন্ন বলে। আদিবাসী নৃত্যের বৈশিষ্ট্য যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে ত্রিপুরার অধিকাংশ নৃত্যধারাকে আদিবাসী নৃত্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না — এগুলিকে অধিকতর উন্নত মানের লোকনৃত্য এবং অর্ধ-ক্লাসিকনৃত্য (হজাগিরি) বলে অভিহিত করা চলে। শুধুমাত্র ব্যাপক চর্চা ও বহির্জগতে এসব নৃত্যের প্রচার নেই বলে এগুলি অজানা পাহাড়ী ফুলের মতো অজানা-জগতে আপন সুরভিতে মাতোয়ারা।

হজাগিরি নৃত্যের পরিবেশনা যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা এর অনবদ্য ছন্দময় নৃত্যশৈলী, রূপশৈলী ও গরিমায় মুগ্ধ হবেন। আর যাঁদের নৃত্যরসের একটু আধটু প্রতীতি জন্মেছে, তাঁরা এই নৃত্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ক্লাসিক অথবা বিদেশী উন্নতমানের ট্যুইস্ট নাচের রূপ প্রত্যক্ষ করবেন।

হজাগিরি নৃত্যের ছন্দমাধুর্য হিসাবে যা উল্লেখযোগ্য, তা হচ্ছে কোমর থেকে পা পর্যন্ত শরীরের অংশটিকে আন্দোলিত করে নৃত্যসহকারে মৃদু পদসঞ্চালন-মুদ্রা।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে অনুধাবন করতে হবে যে, হজাগিরি নৃত্যে উদ্দামতা একেবারে অনুপস্থিত। চোখ মুখ ও হস্তমুদ্রা এই নৃত্যে গৌণ। তবে একথা জোর করে বলা যায় — হজাগিরি নৃত্য পরিবেশনকে যাঁরা সমজদারের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে সক্ষম, তাঁরা বুঝতে পারবেন বা উপলব্ধি করতে পারবেন তথাকথিত ভারতীয় অনুকৃত বিদেশী 'ট্যুইস্ট' নাচের চাইতে রিয়াংদের হজাগিরি নৃত্য অনেক উন্নত মানের। রিয়াং রমণীদের হজাগিরি নৃত্য যে কোনো বিদেশী ট্যুইস্ট নাচিয়েদের শেখাতে পারে — একথা জোর করে বলা যায়। মৃদু পদচালনার সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে নিম্ন অংশকে এমনভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচতে থাকে, যার ফলে কোমরের নিম্নাংশ অপূর্ব হিল্লোলে হিল্লোলিত হয়। কিন্তু যা তাক লাগাবার মতো, তা হচ্ছে উদর অংশ ছাড়া কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত ওপরের অংশ এক চুলও নড়বে না। কোমর থেকে পা পর্যন্ত নিম্নাংশের সঙ্গে মিল রেখে শুধু উদর অংশটাকে সঞ্চালন করার দক্ষতা দর্শকদের অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য করে। উদর ছাড়া কোমরের উর্ধ্বাংশ যে নড়ে না তার প্রমাণ পাওয়া যায় কলসীর ওপর নৃত্য দেখলে। নৃত্যের আসরে সারিবদ্ধভাবে মাটির কলসী বসানো হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে বোতলের মুখে বসিয়ে সেই বোতল মাথায় নিয়ে রিয়াং যুবতী কলসীগুলির ওপরে দাঁড়িয়ে চক্রাকারে নৃত্য করতে থাকে। এবং নৃত্যরতা মেয়েরা কলসী থেকে নেমে আসরকে ঘিরে নাচতে নাচতে আসর থেকে চলে যায়। দৃশ্যটি অত্যন্ত নাটকীয় সন্দেহ নেই। প্রলম্বিত নৃত্য পরিবেশনার সময় বোতল বা বোতলে স্থাপিত প্রদীপ কোনোকালে খসে পড়ে না। এখানেই নাচিয়েদের কৃতিত্ব — তাই হজাগিরি নৃত্যকে ভারসাম্য নৃত্য বলেও আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

রিয়াং রমণীদের এই হজাগিরি নৃত্য প্রত্যক্ষ করলে যে কোন ভাবপ্রবণ দর্শকের মনে হবে, ছায়া সুনিবিড় সবুজ পাহাড় ছুঁয়ে বয়ে চলেছে মৃদু মৃদু মলয় পবন এবং তারই পরশে হিল্লোলিত হচ্ছে তামাম বনানী অঞ্চল। আর নৃত্যচপল পদচালনা দেখলে মনে হবে হিমেল পরশকাতর পাহাড়ী ঝর্নার জল যেন তিরতির করে চয়ে চলেছে আপন ছন্দে।

আদিবাসী নৃত্য হজাগিরির মধ্যে ক্লাসিকাল নৃত্যের আধার

আগেই বলেছি, হজাগিরি নৃত্য আদিবাসী বা উপজাতীয় নৃত্য হয়েও, এই নৃত্য বৈচিত্র্যহীন নয়। তাই বৈচিত্র্যহীন আদিবাসী নৃত্যধারার অপবাদ থেকে রিয়াংদের হজাগিরি নৃত্য আঙ্গিকের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে যদি নব কলেবরে রূপান্তরিত করা যায় এবং যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ পোষাকের উদ্ভাবন করা হয় (যেমনটি করা হয়েছিল মণিপুরী নৃত্যের ক্ষেত্রে), তাহলে হজাগিরি নৃত্য ক্লাসিক নৃত্যের মর্যাদা পেয়ে ভারতের বুকে বিশেষ আসন লাভ করতে পারে। শুধু ভারতে কেন, বহির্ভারতেও অনেক বিদেশী এ নৃত্যচর্চায়

মনোনিবেশ করবেন। কেননা এ নৃত্যের কাঠামোতে উন্নতমানের ট্যুইস্ট নাচের ঢং বা ভঙ্গি প্রকটমান।

দুষ্টু বিড়ালের সাজা

(রিয়াং লোক কথা)

একটি মুরগী। সবে মাত্র ডিম দিয়েছে। মাঝে মাঝে ডিমের ওপর বসে কিছু কিছু তাও দিতে হচ্ছে। কিন্তু তা বলে তো আর সারাক্ষণ ডিমের ওপর বসে থাকলেই চলে না। খাবার-দাবার জোগাড় করতে হয়। এদিক-সেদিকে একটু আধটু ঘোরাফেরাও করতে হয়।

মুরগী একদিন দুপুর বেলা বেরিয়েছে খাবার খেতে এক বন-বিড়ালও বহুদিন ধরে সুযোগ খুঁজছিল কি করে মুরগীকে ধরা যায়। যেই মুরগী খাবার খেতে বেরিয়েছে, আর যায় কোথায়। সুযোগ বুঝে বন-বিড়াল ঝাঁপিয়ে পড়ল মুরগীর ওপর। মুরগীর দফা শেষ! মুরগীকে নিয়ে বন-বিড়াল দুপুরের খাওয়াটা নিশ্চিন্তেই চুকিয়ে দিলে। বেশ খাওয়া হয়েছে। মস্ত একটা ঢেঁকুর দিয়ে বন-বিড়াল স্বগতোক্তি করে উঠল — নাঃ, এবার একটু বিশ্রাম করা যাক। কিন্তু কোথায় ? জুমে একটা খালি টংঘর আছে। সেখানেই যাওয়া যাক। ঘুমটা জমবে ভাল। বন-বিড়াল চাষীদের ফেলে যাওয়া টংঘরে গিয়ে নিশ্চন্তে ঘুম দিলো।

এদিকে দূর থেকে মুরগীর ডিম সবই শুনতে পেলো। মায়ের শোকে তো অধীর হলে চলবে না। আগে মাতৃ-হত্যাকারীর প্রতিশোধ নিতে হবে। তারপর অন্য কথা। মুরগীর ডিমের পাশেই ছিল মুরগীর নাদা বা বিষ্ঠা। ডিম বিষ্ঠাকে ডেকে বলল — অ তক্ষিছা (হে মুরগীর বিষ্ঠা), এস, এস। আমার মাকে তো বন-বিড়াল নিয়ে গিয়েছে। এখন বল বিড়ালকে কি করে সাজা দেওয়া যায়। দুজনে মিলে যুক্তি করলে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। তাদের ছিল এক বন্ধু, নাম তার বাঁশের ছাল। তাকেও ডেকে এনে সব কিছু বললে। বন্ধুর প্রতি সমবেদনা আর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি জানালে বাঁশের ছাল। সে বললে, দেখ, আমার এক সাপ বন্ধু আছে, তাকেও সঙ্গে নিয়ে নি কি বল ? রাজী হল সবাই। তারা মিলে চার বন্ধু হল। সাপের ছিল আর এক বন্ধু। তার নাম ভীমরুল। সাপ বললে, দেখ আমার এক ভীমরুল বন্ধু আছে। তোমরা বস। আমি তাকে ডেকে আনছি, তাহলে কাজটা সহজ হবে। ভীমরুলকে ডেকে আনল সাপ। এবার হল পাঁচজন। ভীমরুল এসে বললে — দেখ, তোমরা কাজটাকে যত সহজ মনে করছ তত সহজ নয়। আমার এক বন্ধু আছে। নাম তার টুকরি বা ওরা (ব্রা)। তাকে আমি নিয়ে আসি গে। দেখি সে কি বলে। টুকরি এসে তাদের দলে যোগ দিলে তাদের শক্তি আরও একটু

বাড়লো। টুকরি বললে — আমার এক বন্ধু আছে। তাকেও নিয়ে নি। তাহলে বেশ হবে। সে বন্ধুটির নাম 'মুংখুং' (লম্বা বড়গাছ)। মুংখুং এসে দলে যোগ দিলে তারা সবাই মিলে হল সাতজন। শক্তিও হল প্রচুর। এবার যাত্রার পালা। কিন্তু পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে কে ? ডিম বললে — আমি তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো। সে কোথায় থাকে আমি জানতে পেরেছি। তোমরা আমার পিছু পিছু এস। এই কথা বলে প্রথম চলতে লাগল ডিম, ডিমের পিছনে মোরগের বিষ্ঠা বা নাদা, তার পেছু বাঁশের ছাল, তার পেছু সাপ, সাপের পিছু ভীমরুল, তার পরে ব্রা এবং সবাইর শেষে মংখুং হাঁটতে লাগল বনের পথে। যেতে যেতে অনেক দূর গিয়ে তারা বন-বিড়াল যে টংঘরের ওপর ঘুমিয়ে ছিল তা দেখা পেল। বেলাও তখন প্রায় যায় যায়। বন-বিড়ালের এবার ঘুম থেকে ওঠার পালা। সেই কোন দুপুরে মুরগীকে খেয়ে যে বন-বিড়াল ঘুমিয়েছে এখনও তার ঘুম ভাঙেনি। ওরা সাতজন তাড়াতাড়ি যুক্তি করে যে যার সুবিধে মত জায়গা নিয়ে নিলে। মুরগীর বিষ্ঠা গিয়ে বসল ঠিক বন-বিড়ালের হাতের কাছে। বাঁশের ছাল গিয়ে দাঁড়াল বেড়ার গা ঘেঁসে। ডিম গিয়ে রইল উনানের ভেতর। ভীমরুল গিয়ে চুপিসাড়ে বসে রইল যে 'তিলক' বা লাউয়ের খোল থেকে বন-বিড়াল জল খাবে তার মধ্যে। সাপ গিয়ে ঠিক দরজার কাছে দাঁড়াল। 'ব্রা' ও রইল সাপের কাছাকাছি দরজার পাশে কোন এক জায়গায়। মুংখুং গিয়ে বসল 'ইয়াখি কোপাংঅ' বা টংঘরে ওঠার সিঁড়ির গোড়ায় যাতে বিড়াল এ পথে আসলেই তাকে খুব করে কষিয়ে দিতে পারে।

এক সময় আড়-পাশ ভেঙ্গে বন-বিড়াল জেগে উঠল। হাতের পাশেই ছিল মোরগের বিষ্ঠা। যেই বিড়াল হাত-পা নাড়িয়েছে অমনি তার হাতে লেগে গেল মুরগীর বিষ্ঠা। দুর্গন্ধে ছেয়ে গেল সারা ঘরটা। বিড়ালের গা ঘিন ঘিন করে উঠল। ঘৃণায় সে হাতখানা বাঁশের কঞ্চিতে গিয়ে ঘষল আর তার সাথে সাথে তিন চার জায়গা দিয়ে হাত খানা কেটে দিল বাঁশের ছাল। রাতও হয়ে এসেছে। অন্ধকারে প্রায় কিছুই দেখা যায় না। বিড়াল ভাবল বেশ কেটে গিয়েছে হয়ত। নাহলে ব্যথাটা এমন উত্তরোত্তর বাড়ছে কেন। আগুনটা জ্বালিয়েই দেখি যাক কতটা কেটেছে। আগুন জ্বালাবার জন্যে উনানের কাছে গিয়ে বিড়াল ফুঁ দিতে লাগল। আর যায় কোথায়। ভীষণ শব্দে ডিমটা চৌচির হয়ে এসে পড়ল তার নাকে-মুখে। আর সঙ্গে সঙ্গে বিড়ালের চোখ দুটি গেল নষ্ট হয়ে। উঃ কি ভয়ানক যন্ত্রণা! চোখটা একটু জল দিয়ে ধুয়ে দেখা যাক কমে কিনা। হাতড়াতে হাতড়াতে তিলকটা তুলে নিল হাতে। যেই জল ঢালতে যাবে অমনি ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ভীমরুল। নাকে-মুখে হুল ফুটিয়ে সমস্ত বিষ ঢেলে দিল ভীমরুল বিড়ালের গায়ে। যন্ত্রণার একশেষ। যে করেই হোক বিড়ালকে এবার টংঘর থেকে নামতে হবে। কোনরকমে আন্দাজের ওপর বিড়াল এগিয়ে গেল দরজার দিকে। সাপ বসে ছিল সেখানে। সেও

বিড়ালের গায়ে বসিয়ে দিলে এক মোক্ষম ছোবল। এবার বিড়াল মরিয়া হয়ে চীৎকার করে উঠল — 'আইয়া, আইয়া, চিবুক্ ছুবখা, চিবুক্ ছুবখা'। গেলাম, গেলাম, সাপে কেটেছে, সাপে কেটেছে। তবু তাকে নামতে হবে যদি প্রাণটা বাঁচাতে হয়। কিন্তু বিড়াল মরে কি বাঁচে ওরা ছেড়ে দেবে কেন ? ব্রা ছিল নামার পথেই। তার শক্ত দেহ দিয়ে সুযোগ বুঝে সেও বসিয়ে দিল এক ঘা। আঘাতের ওপর আঘাতে বিড়াল আর টাল সামলাতে পারলো না। হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ল একেবারে মাটিতে । আর পড়বি তো পড় একেবারে মুংখুংর হাতের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে মুংখুং হানল চরম আঘাত । আর তখুনি দুষ্ট বিড়ালও চিরতরে অক্কা পেল। হাঁ, এ ভাবেই পাপের শাস্তি হয়ে থাকে ।

এবার সাত বন্ধু মিলে বন-বিড়ালকে বেঁধে কাঁধে চড়িয়ে বাড়ী নিয়ে এল। এখন তাদের আনন্দ দেখে কে ।

তৃতীয় অধ্যায়

ত্রিপুরায় বঙ্গীয় সমাজ

ভূমিকা

বর্তমান গ্রন্থের সংগ্রহ ও গ্রন্থনার পরিকল্পনার সূচনাকালে উদ্দেশ্য ছিল অলোচ্য গ্রন্থে বিষয়বস্তু শুধুমাত্রা এ রাজ্যের স্থানীয় কতিপয় প্রাচীন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি-চর্চায় সীমিত রাখা। কিন্তু উদ্দিষ্ট বিষয়বস্তুর গ্রন্থনার সমাপ্তির পর্বে মদীয় অনুজপ্রতিম সংস্কৃতি-রসিক গবেষক অধ্যাপক, ডক্টর জগদীশ গণচৌধুরীর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলাপচারণায় উপলব্ধ হয়ে যায় উদ্দিষ্ট বিষয়াবলীর সঙ্গে আরো কিছু প্রয়োজনীয়-প্রাসঙ্গিক এবং মূল্যবান তথ্যাবলীর সংযোজনে বর্তমান গ্রন্থের বিষয়-গৌরব শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন হবে। একথা স্মরণ রাখতে হবে ত্রিপুরা রাজ্য নানাবর্ণ-নানাধর্ম নানা সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠীর বাসভূমি। একদা এ রাজ্যে তথাকথিত আদি বাসিন্দাদের অধ্যুষিত অঞ্চল হলেও স্বাধীনতা-উত্তর দশক থেকে ত্রিপুরা রাজ্য হিন্দু বাঙ্গালী অধ্যুষিত রাজ্যে পরিণত হয়ে যায় — বর্তমান এ রাজ্যের মোট জনসংখ্যার শতকরা সত্তরভাগ হচ্ছে হিন্দুবাঙ্গালী জনগণ। বাঙ্গালী জাতির পাশাপাশি রয়েছে মণিপুরী সম্প্রদায় — বহিরাগত চা-বাগান শ্রমিক সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাঁও, ভীল, কোল, লেপচা, খাসিয়া প্রভৃতি জনগোষ্ঠী। উপরোক্ত সকল সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠী ত্রিপুরার আদিবাসী ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক। আপাতদৃষ্টিতে এই সমস্ত জনগোষ্ঠী বা সমাজ গোষ্ঠী বহিরাগত হলেও সকল সম্প্রদায়ের জনগণ বহুপর্বে এ রাজ্যে এসে বসবাস করায় বর্তমানে কেউ বহিরাগত বলে চিহ্নিত হওয়া যায় না। ইতিহাসসম্মত ভাবে যারা এ রাজ্যের আদিবাসিন্দা বলে স্বীকৃত তারা সুদূর অতীত কালে অনাদিকালের স্রোতে ভেসে এ রাজ্যে বসতি স্থাপন, তারপর রাজ্য স্থাপন করে ত্রিপুরাকে স্বদেশভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেই ত্রিপুরী জনগোষ্ঠী যদিও আজ অবধি এ রাজ্যের মূল আদিবাসিন্দা বলে স্বীকৃত, একদা এ রাজ্যের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণে ত্রিপুরী জনগোষ্ঠী বর্তমানে সংখ্যালঘু। কিন্তু বর্তমান যুগে মহান ভারতভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পরিচয় প্রসঙ্গে কোন্ জনগোষ্ঠী সংখ্যাগুরু কোন্ জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘু সে হিসাব নিকাশ অপাঙতেয় এবং অপ্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হওয়া একান্ত জরুরী। বর্তমান ত্রিপুরা মিশ্র জনবসতির রাজ্য বিশেষ কোন জাতি বা উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে এ রাজ্যের আদিবাসিন্দা বা মূল বাসিন্দা বলে আখ্যা করা চলে না।

ঐতিহাসিক সিংহাবলোকন

ত্রিপুরা রাজ্যে (পূর্বতন রাজন্য শাসিত পার্বত্য ত্রিপুরা) বঙ্গীয় সমাজ তথা বঙ্গভাষা, বঙ্গসাহিত্য, বঙ্গীয় ধর্ম-কৃষ্টি-সমাজ সমূহের প্রতিষ্ঠা ও আধিপত্যের নেপথ্যে সুদীর্ঘ ও সুপ্রাচীন ইতিহাস অনাদিকাল থেকে বহতা নদীর মত চিরপ্রবহমান। সে ইতিহাস বিষয়ে জ্ঞাত হবার জন্য অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠাবলীতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। প্রাচীন যুগের ত্রিপুর নৃপতিদের ইতিবৃত্ত অধ্যয়ন ও মনোনিবেশ এ ক্ষেত্রে একান্তই প্রাসঙ্গিক। ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্ত ইতিহাস ও কিংবদন্তী এই দ্বিবিধ উপকরণ সমূহে গঠিত। এ প্রসঙ্গ অবশ্য বর্তমান আলোচনা বর্হির্ভূত।

ত্রিপুরা রাজ্যে বঙ্গীয় সমাজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম হেতু হিসাবে পার্বত্য ত্রিপুরা ও সমতল ত্রিপুরার (অধুনা বাংলাদেশ) (কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম(পার্বত্য), সিলেট, চাঁদপুর) ভৌগোলিক সান্নিধ্যকেই আরোপ করা যায়।এ দুটি ভূখণ্ডের পাশাপাশি অবস্থান ভিন্নতর ভাষা ও সংস্কৃতি ও সমাজ হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গ নরনারী এবং ত্রিপুরী নরনারীদের সমাজ সংস্কৃতি ও ভাষার পালাবদল ঘটতে কোন বাধার সৃষ্টি হয়নি বরং পারস্পরিক দেয়ানেয়া বা বিনিময় শোভন সুন্দর অনুষঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

এই অন্তরঙ্গ পালাবদল বহুমুখীন ও সুদূর প্রসারী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই যে পালাবদলের কথা বলা হল এটা একদিনে হয়নি যাদুমন্ত্রের দ্বারা দৈবাৎ ফলশ্রুতিও নয়। যুগ যুগ ধরে — শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী এই পালা বদলের মহড়ার ফলশ্রুতি। কোন সমাজই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না ভিন্ন সমাজের সান্নিধ্য ব্যতিরেকে কোন সমাজই সামগ্রিক উন্নতি সাধন করতে পারে না-একথাটি ধ্রুব সত্য। বিশেষ করে অনুন্নত সমাজ শিল্প সংস্কৃতি ধর্মীয় আচরণে উন্নত সমাজের সান্নিধ্য লাভ করলে আদিরূপ থেকে আধুনিক রূপে উত্তীর্ণ হবার সুযোগ লাভ করে। বর্তমান ত্রিপুরী সমাজে শিল্প-সংস্কৃতি-ধর্মীয় ভাবনার যে আধুনিক রূপ বর্তমান তা নিঃসন্দেহে বঙ্গীয় সমাজ-সান্নিধ্য লাভের ফলশ্রুতি। ত্রিপুরী সমাজ ও বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ এই দ্বিবিধ সমাজ-মানুষের বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে অর্থকরী লেনদেন, দৈনন্দিন জীবন ও জীবিকার তাগিদে পারস্পরিক যোগাযোগ সামাজিক মেলামিশা, ভাবের আদান প্রদান অতপর ধর্মীয় জীবনে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া (interaction) ফলস্বরূপ। ত্রিপুরী সমাজে হিন্দুধর্মের অনুপ্রবেশ। ত্রিপুরী সমাজে হিন্দুধর্মের সনাতনী ধর্মীয় ভাবধারার জন্ম — এই সব ঘটেছে স্বাভাবিক নিয়মে — একের উপর অপরের চাপানো উতোরের ফলশ্রুতি নয়।

ত্রিপুরায় বঙ্গীয় সমাজ গড়ে উঠার নেপথ্যে রয়েছে প্রাচীন ত্রিপুরার নরপতিগণের বিশেষ অবদান। ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত বা রাজমালা পাঠে জানা যায় আজ

থেকে পাঁচশত সাঁইত্রিশ বছর আগে ত্রিপুরার নরপতি রত্নমাণিক্য ত্রিপুর সিংহাসনে আসীন ছিলেন।(১৪৬৪-৮৮ খ্রীঃ)। মহারাজ রত্নমাণিক্য হয়তো উপলব্ধি করেছিলেন অনুন্নত ত্রিপুরী সমাজকে বিশেষ মানে উন্নীত করতে হলে উন্নত মানের বহিঃসংস্কৃতির জনগোষ্ঠীর সাহায্য- সান্নিধ্য অপরিহার্য। তাই ত্রিপুরী সমাজ ও রাজকার্যের উন্নতিবিধান কল্পে কতিপয় বিখ্যাত বঙ্গ সন্তানদের আনয়ন করে তাঁর রাজ্যে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেন। ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত বা রাজমালায় বর্ণিত আছে প্রকৃতপক্ষে ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে হিন্দু এবং মুসলিম সমাজের যোগাযোগের সূত্রপাত রত্নমাণিক্যের আমল থেকে শুরু হয়। প্রসঙ্গক্রমে অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে। রাজমালায় বর্ণিত আছে রত্নমাণিক্য* কোন কারণে পিতার বিরাগভাজন হয়ে পিতার রাজ্য থেকে বিতাড়িত হন। পিতৃরাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হবার পর লক্ষ্যহীয় পথপরিক্রমায় দৈবাৎ 'মালিক' তুঘ্রল খানের রাজ্য লক্ষ্মণাবতীতে (গৌড়) উপনীত হন।

কথিত আছে রত্নমাণিক্য নিজ বুদ্ধিবলে বাংলার শাসক তুঘ্রল খানের অনুগ্রহভাজন হয়ে উঠায় তুঘ্রল খানের সাহায্যে পিতার রাজ্যে অধিকার স্থাপন করতে সক্ষম হন। বাংলার শাসক তুঘ্রল খানের অনুগ্রহ লাভ করার নেপথ্যে একটি লোকপ্রবাদ রয়েছে — একদা রত্নমাণিক্য মহামূল্যবান প্রস্তর (লোকশ্রুতি অনুসারে 'ভেকমণি') তুঘ্রল খানকে উপহার দান করায় বিনিময়ে তুঘ্রল খান স্থল বাহিনীর সহযোগে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করতে সাহায্য করেন।

সুচতুর রত্নমাণিক্য সিংহাসনে আসীন হয়ে তাঁর রাজ্য প্রশাসনকে নবাব-প্রশাসনিক আদলে রূপ দিতে তৎপর হন — এবং সে সুবাদে সামাজিক ও বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজ ত্রিপুর সমাজের নিকটতর হতে থাকে। প্রাচীন ত্রিপুরায় মুসলমান জনসংখ্যার অবস্থিতির মূল কারণ রত্নমাণিক্যের প্রবর্তিত নবাবী কায়দায় রাজ্য প্রশাসনের নবরূপায়ন। একথা স্বীকার করতেই হবে — দেশ বিভাগের ফলে হিন্দু ও মুসলমান নরনারীদের মধ্যে যে সম্প্রীতি ভাঙ্গন ধরেছিল — স্বাধীন ত্রিপুরার রাজাদের প্রজাকুল হিসাবে ত্রিপুরীদের পাশাপাশি হিন্দু ও মুসলমান সমাজের সৌহাদ্যপূর্ণ সহাবস্থান ছিল। ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ হিন্দু ধর্মাবলম্বী হয়েও পরধর্মের প্রতি ভক্তিমান ছিলেন। শুধু ধর্মীয় সহনশীলতার ব্যাপারে নয় সর্বক্ষেত্রে, কি ধর্মে, কি সামাজিক উন্নয়ন রূপান্তর এবং সংস্কৃতির রূপান্তর পর সংস্কৃতি, পরধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে তার

*** রত্ন মাণিক্য ইতিপূর্বে রত্ন ফা নামে পরিচিত ছিলেন। বলা বাহুল্য প্রাক-ঐতিহাসিক যুগের ত্রিপুর রাজারা 'ফা' উপাধি ব্যবহার করতেন। রত্ন মাণিক্যের পিতামহ ত্রিপুরা রাজ মহামাণিক্য 'ফা' উপাধির পরিবর্তে মাণিক্য উপাধি ধারণ করেন। মহামাণিক্যের আমল থেকেই ত্রিপুরার ঐতিহাসিক যুগ শুরু।**

দৃষ্ঠিভঙ্গী উদার ও সুদূর প্রসারী ছিল। তাঁর এহেন উদার এবং প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর ফলশ্রুতি হিসাবে ত্রিপুর সমাজে হিন্দুধর্মের অনুপ্রবেশ এবং বঙ্গীয় হিন্দু সংস্কৃতির অনুসৃতি সবিশেষ লক্ষ্যণীয়। পরম ধার্মিক রত্নমাণিক্য হিন্দু দেবদেবীর অগাধ বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বিষ্ণু, শিব এবং পার্বতীর প্রতি গভীর অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর নির্মিত রাজ-মোহরগুলিতে শিব পার্বতীর নাম অঙ্কিত থাকত। চীনদেশীয় মঙ্গোল জাতির বংশধর হয়েও রত্নমাণিক্য হিন্দু র াজাদের আদর্শে নিজে গড়ে তুলেছিলেন। তাই মঙ্গোল ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিবর্তে সনাতনী হিন্দু ধর্মকে গ্রহন করেছিলেন। এবং সনাতনী হিন্দুধর্মকে ত্রিপুর সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার মানসে তিনি ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ প্রভৃতি নানাবর্ণের হিন্দু নরনারীদের ত্রিপুরা রাজ্যে বসতি স্থাপন করতে অনুমতি দান করেছিলেন। প্রসঙ্গত সবিশেষ উল্লেখ্য যে ত্রিপুরী সমাজের আদিরূপকে (primitive style of the society) নব্যরূপ দান (নবীকরণ) করার মানসে ভিনদেশীয় উন্নত সমাজভুক্ত নরনারীদের তাঁর রাজ্যে আমদানী করতে মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। সে উদ্যোগকে বাস্তবে রূপ দিতেই তিনি গৌড়ের সুলতান বরবক শাহ্কে অনুরোধক্রমে বঙ্গদেশ থেকে চার হাজার বাঙ্গালী পরিবার এ রাজ্যে আনয়ন করত বসতিস্থাপন করান।

রত্নমাণিক্যের ইচ্ছানুসারে এবং বাংলার সুলতানের সহায়তায় প্রাচীন ত্রিপুরার রাজধানী রাঙামাটি (উদয়পুর) এবং তৎসংলগ্ন বিভিন্ন অঞ্চলে (রত্নপুর, যশোপুর এবং হীরাপুর প্রভৃতি স্থানে) নানাবর্ণের হিন্দু পরিবারবর্গকে স্থায়ীভাবে বসবাস করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। রাজমালার প্রণেতার বর্ণনা অনুসারে রাজধানী *রাঙামাটিতে এক হাজার, রত্নপুরে এক হাজার, যশোপুরে পাঁচশত পরিবার এবং অবশিষ্ট পরিবারবর্গকে হীরাপুরে বসতিস্থাপন করতে অনুমতি প্রদান করা হয়। ঐ সমস্ত হিন্দু পরিবার বর্গে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ এবং কুলীন কায়স্থও বর্তমান ছিলেন। এবং খাণ্ডব ঘোষ এবং পণ্ডিত রাজ নামধেয় দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি নিজেদের যোগ্যতার বলে রত্নমাণিক্যের রাজসভায় পরিষদপদে অলংকৃত হতে পেরেছিলেন।

এইতো গেল প্রাচীন ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের আনুকুল্যে এ রাজ্যে বঙ্গীয় সমাজবর্গের আগমনের ইতবৃত্ত।

ত্রিপুরার শেষ স্বাধীন রাজা বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী স্বর্গীয় বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের রাজত্বকালেও বঙ্গীয় সমাজের প্রতি পৃষ্ঠপোষনার ধারা অক্ষুণ্ণ ছিলো। তাঁর আমলে তদানীন্তন পুর্ববঙ্গ (পূর্ব পাকিস্থান) বাসী হিন্দু প্রজাকুল বিপন্ন হয়ে পড়ায়

---

* ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর বহুপূর্বে রাঙামাটি নামে পরিচিত ছিল—পরবর্তীকালে উদয়মাণিক্যের আমলে (১৫৬৭-৭২) উদয়পুর নামে পরিবর্তিত করা হয়।

(বর্ণবিদ্বেষ হেতু) মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুর ঐ সমস্ত বিপন্ন হিন্দুবর্গকে ত্রিপুরা রাজ্যে এনে আশ্রয়দান করেছিলেন। আজকের এই হিংসাহিংসীর দিনে যে স্মৃতি অতিশয় সুখবহ এবং এরাজ্য ছিলো — প্রাচীন যুগের রামরাজ্য। বীরবিক্রমের এই বদান্যতার জন্য স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিপূর্ণ সন্তোষ প্রকাশ করে বীরবিক্রমকে প্রশংসাপূর্বক সবিশেষ আশীর্বাণী প্রেরণ করেছিলেন — অন্তরের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

পরিশিষ্ট

মহারাজ রত্নমাণিক্যের (রাজত্বকাল — ১৪৬৪-৮৮ খৃঃ) পরবর্তী বংশধরগণ বহির্‌ত্রিপুরার হিন্দু মুসলমান পরিবারবর্গকে যে সমস্ত ভূমিদান করেছিলেন তার কিছু নমুনা প্রদত্ত হলো — উল্লেখ্য যে ভূমিদান সংক্রান্ত সনন্দ বা আদেশপত্র পাঠ করলে প্রতিয়মান হয় যে যে ব্যক্তিকে ভূমিদান করা হয়েছে সে ব্যক্তির বংশ পরম্পরা সে ভূমির দখলীসত্ত্ব ভোগ করতে থাকবে। হিন্দু বা মুসলমান পরিবারকে একই নিয়মে ভূমিদান করা হত — উদাহরণ স্বরূপ নীচে উদ্ধৃত করা হল ঃ

নিদর্শন-১ *

বীরচন্দ্র মাণিক্যের পূর্ববর্তীকালে প্রদত্ত সনদ ও দলিলপত্রাদি

ব্রহ্মোত্তর সনন্দ তাম্রপট্ট ঃ মহারাজ কল্যাণমাণিক্য
(ত্রিদল বিল্বপত্রে শ্রী স. এবং ত্য খোদিত)

৭ স্বস্তি - শ্রীশ্রীযুক্ত কল্যাণ মাণিক্যদেব বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদযি রাজানামাদেশোয়ং শ্রীকারকোন বর্গে বিরাজতে হন্যৎ পরং রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগনা নুরনগর মৌজে বাউরখাড় অজ্জঙ্গলাতেশতদ্রোণভূমি ‴প্রীতে শ্রী মুকুন্দ বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যকে দিলাম ইহা আবাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিয়া আশীর্বাদ করিতে রহুক এহি ভূমির মাল খাজনা গয়রহ সমস্ত নিষেধ ইতি শকাব্দ ১৫৭৩ সন ১০৬০ তাং ১৪ মাঘ।

---

* রাজমালা ঃ কৈলাশচন্দ্র সিংহ, পরিশিষ্ট (৫৯২ পৃষ্ঠা)

নিদর্শন -২ *

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য কর্তৃক

ঁত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর পূজক দ্বিজ রত্ননারায়ণকে প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর সনন্দ

বড় ষ্ট্যাম্প মুদ্রিত ৪, রাম সত্য জয়, রাম সত্য, শ্রী রামাজ্ঞা, ৩৪ নং সেহা (পারসী স্বাক্ষর)

জাএ	জমি
সাইলা	
মোং চন্দ্রপুর —	১
খিল পাড়া —	১২
বাসুয়া পাড়া —	১
সোনামুড়া —	১
ডিয়ারা —	১
	১৬
বোরুয়া	
নলগইর হংসধ্বজের	
তোলা —	২
তিন নালিয়া —	১
ছাগল নাইয়া —	১
	২০

বিংশতি দ্রোণ মাত্র।

৭ স্বস্তি — শ্রীশ্রীযুক্ত গোবিন্দমাণিক্য বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয়ি রাজনামাদেশোয়ং শ্রীকারকনবর্গে বিরাজতে হন্যত পরং রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে উদয়পুর মৌজে চন্দ্রপুর পত্ররহ সাইলা ও বোরুয়া তুলাপুরুষ ও মহা অন্নদান বাবত সূর্যগগ্রহণ কালে ঁপ্রীতে বিংশতি দ্রোণ জমি শ্রী দ্বিজ রত্ননারায়ণ পুরুহীতকে ব্রহ্মোত্তর দেওয়া গেল। এহি জমির মাল খাজনা ও ভেট বেগার বীরসিংহাদি সমস্তাঙ্ক নিষেদ। এহি জমি আমল কাবেজ করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে আশীর্বাদ পূর্বক পরমসুখে ভোগ তছরুপ

---

* শ্রী রাজমালা, ৪র্থ লহর (অপ্রকাশিত) পৃঃ ১৩৪-৩৫ দ্রষ্টব্য।

করিতে রহুক। ইতি সন ১০৭০ তেরিখ ২৫ বৈশাখ।

নিদর্শন -৩

ব্রহ্মোত্তর তাম্রপট্ট সনন্দ ঃ মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য

শ্রীরাম সত্য জয় শ্রীরাম সত্য

ষস্তি শ্রীশ্রীযুক্ত গোবিন্দ মাণিক্য দেব বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয়ি দেশোহয়ং শ্রীকারকোনবর্গে বিরাজতে হন্যত রাজধানি হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগনে মেহেরকুল ডিহি বুড়িচোঁ মৌজে হরিপুর হাসিলা দুই কানি জঙ্গলা। দশ কানি এবং বার কানি ভূমি ঁপ্রিতে ব্রহ্মোত্তর শ্রীহরিদেব পণ্ডিতেরে দিল .... নিজ হাত হালে চাষ করিআ সুখে ভোগ করৌক পাঁচা পঞ্চকভেট বেগার ইত্য .... শক ১০৮২ তেং ২০ মাঘ।

সন ১০৮৬ ১ চৈত্র

তাম্রপট্টের পশ্চাৎভাগে খোদিত ঃ

শ্রী সত্য শ্রী বিশ্বাসনারায়ণ

নিদর্শন ৪ *

রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা

ব্রহ্মোত্তর তাম্রপট্ট ঃ মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য

প্রথম পৃষ্ঠায় ঃ বিষ্ণু প্রীতে

৭ স্বস্তি - শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দ মাণিক্য দেব বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয়ী রাজনামাদেশোহয়ং শ্রীকারকোনবর্গে বিরাজতে হন্যৎ রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগনে মেহেরকুল মৌজে শোলনল অজহাসিলা জমা ১*০ আঠার কানি ভূমি শ্রী নরসিংহ শর্ম্মারে ব্রহ্ম উত্তর দিলাম এহার পাঁচা পঞ্চক ভেট বেগার ইত্যাদি মানা সুখে ভোগ করোক ইতি সন ১০৭৭ তেং ১৯ কার্ত্তিক শক ১৫৯৮ সন ১০৮৬ তেং ১৬ চৈত্র।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ঃ

শ্রী সত্য শ্রী বিশ্বাসনারায়ণ

---

* রাজমালা ঃ কৈলাশচন্দ্র সিংহ, পরিশিষ্ট, ৫৯৩ পৃষ্ঠা

নিদর্শন - ৫

চাকলা জমিদারী এলাকায় মনুষ্যবিক্রয় (আত্মবিক্রয়) সম্পর্কিত দলিল
সময় - মহারাজ রত্নমাণিক্য (২য়)
(সম্মুখ পৃষ্ঠা)

৭ স্বস্তি - সময় সুপ্রশস্তালঙ্কৃত সতত বিরাজমান মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রীযুক্ত ওরঙ্গজেব পাদসাহা পাদনামভূ্যদায়িনি রাজ্যে তন্নিযুক্ত নবাব শ্রীযুতইবরাইম খাঁকে বঙ্গাধিকারিণী তৎসম্মত শ্রীযুত রত্নমাণিক্য মহারাজাধিকারে উদয়পুর সরকারান্তর্গত নুরনগর স্যামন্তঘর গ্রামে সপ্তদশাধিক ষোড়ষশত শকাব্দীয়াশ্বিনস্য দ্বিতীয়াংশে শ্রী অনন্তরাম দেয়স্য সভায়ামনেক মুসলমান দ্বিজ সজ্জনাধিষ্ঠিতায়াং শ্রী ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্যস্য সকাশাদ্রাজত চতুমুর্দ্রামাদায় শ্রী সন্তোষ নাপিতেনময়া রা জস্বর্ণান্নোপহত্যা লিখিত বিগুদাতরি স্বেচ্ছয়াত্মা বিক্রিত ইতি —সন ১১০(৪)
শ্রী সন্তোষ নাপিতস্য খতং

(অপর পৃষ্ঠে)

মুসলমান ঃ শ্রী রসিদ খাঁ ১ সাং বিদ্যাকোট
ওলদমাদা খাঁ
শ্রী হিসামদি মুন্সী ১ সাং তথা
শ্রী দুর্ল্লভ (ঃ) ওলদ বদু সাং তথা

দ্বিজ ঃ শ্রী নারায়ণ শর্ম্মা
শ্রী গোপীরমণ দেবশর্ম্মা সাং বিদ্যাকোট
শ্রী জনার্দ্দন শর্ম্মা ১ সাং স্যামন্তঘর
শ্রী রূপনারায়ণ শর্ম্মা সাং তথা

শূদ্র ঃ শ্রী দুর্গাপ্রসাদ দাস সাং সম..
শ্রী জগন্নাথ সাং তিয়ারা

১) ব্রহ্মোত্তর — ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত ভূমি
২) ফকিরান লাখেরাজ — ফকিরকে প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি
৩) আয়মা সনন্দ — মুসলমানদের প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরার মুসলিম সমাজ

সুদুর অতীতকাল থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে মুসলিম জনগোষ্ঠী বসবাস করে আস্ছে। ঠিক কবে কোন্ শতাব্দীতে ত্রিপুরায় এদের আগমন ঘটে তা সন তারিখ বা এজাতীয় কোন প্রমাণ না থাকলেও প্রাচীন ত্রিপুরার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে যে কমপক্ষে কয়েক শতাব্দীর পূর্ব থেকেই মুসলিম জনসমাজ ত্রিপুরায় প্রবেশ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিল।

শুধু মুসলিম জনগোষ্ঠীই নয় বর্তমান ত্রিপুরাবাসীদের সিংহভাগ জনগোষ্ঠীই ত্রিপুরার সন্নিহিত অঞ্চল থেকে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ করেছিল। আদিবাসী বা অধিবাসি যে অভিধায় আখ্যায়িত করি না কেন কমবেশী সকলেই বহিরাগত মানব প্রচরনের সংজ্ঞা অনুযায়ী (migration or movement of human society)। সুতরাং বর্তমান কালে কে এ রাজ্যের আসল অধিবাসী বা আদিবাসী কে বহিরাগত ঐসব অবান্তর প্রশ্ন তোলাই মহামূর্খের পরিচয়। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গ অবান্তর।

সুতরাং মূল বিষয়ে ফিরে আসা যাক। ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র বা ভুখণ্ড পাশাপাশি অবস্থান হেতু এপার ওপার করার যে কোন দেশের যে কোন মানবজাতির মানসিক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় —এর ব্যতিক্রমী নজির কোথাও নেই। সে নিয়মের তাগিতেই প্রাচীনকাল থেকেই স্বাধীন ত্রিপুরায় আগমন ঘটেছে ভিন্ন ধর্মের ভিন্ন বর্ণের মানব গোষ্ঠী সন্নিহিত অঞ্চলসমূহ থেকে। বলা বাহুল্য সে যুগে স্বাধীনত্রিপুরা রাজ্যে ভিন্ন দেশের জনগণের প্রতি রাজ্যে প্রবেশের ক্ষেত্রে এ যুগের রাজনৈতিক বা কুটনৈতিক কোন নিষেধ বা প্রাচীর অনমনীয় ছিল না। তাই অবাধে আসাযাওয়ার পথ মুক্ত ছিল। সন্নিহিত অঞ্চলসমূহ থেকে ভিন্ন জনগেণের এ দেশে আগমন হত মূলতঃ জীবন ও জীবীকার সন্ধানে তাছাড়া সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণও ছিল।

সূচনাতেই বলা হয়েছে এ রাজ্যে মুসলিম জনগোষ্ঠীর আগমন ও বসতিস্থাপন সুরু হয়েছে কয়েকশত বছর পূর্বেই।

রাজমালা[১] পাঠে জানা যায় ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে মুসলিমদের যোগসূত্র সূচিত হয় রত্নমাণিক্যের আমল থেকে। তিনি ১৪৬৪ খ্রীঃ থেকে ১৪৮৮ খ্রীঃ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৪ (চব্বিশ) বছর কাল রাজত্ব করে গেছেন। মুসলিমদের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগের পেছনে একটা চমকপ্রদ কাহিনী রাজমালাতে বিধৃত রয়েছে।

১। রাজমালা (ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত) কৈলাশচন্দ্র সিংহ ৬৯পৃঃ ২য় ভাগ ৩য় অধ্যায়।

কাহিনীটি এইরূপঃ রত্নমাণিক্য (ওরফে রত্নফা[২]) কোন কারণে পিতার বিরাগভাজন হয়ে পড়ায় পিতৃরাজ্য থেকে বিতাড়িত হন। অতপর পথভ্রষ্ট ভবঘুরে রত্নমাণিক্য গৌড়ের প্রাচীন রাজধানী লক্ষ্মণাবতী[৩] নগরে উপনীত হন। সেই সময় লক্ষ্মণাবতীর 'মালিক'[৪] তুগ্রল খান। রত্নমাণিক্যের পরিচয়ে মালিক তুগ্রল প্রীত হয়ে তাঁকে সম্মানীয় অতিথি হিসাবে গ্রহণ করে আশ্রয় প্রদান করেন। কথিত আছে 'মালিক' তুগ্রলের সহায়তায় রত্নমাণিক্য ভ্রাতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে জয়যুক্ত হয়ে ত্রিপুর সিংহাসন করায়ত্ব করেন। রাজ্যভার গ্রহণ করতঃ মুসলমানদের অনুকরণে রাজ্য শাসন প্রণালী প্রবর্তন করেন। রাজমালায় উল্লেখ আছে রত্নমাণিক্য সিংহাসনে আরোহন করেই ত্রিপুর সমাজে উন্নতমানের সংস্কৃতি সংযুক্ত করার মানসে বঙ্গদেশ থেকে চারিহাজার বাঙ্গালী পরিবারকে আনয়ন করেন। রত্নমাণিক্যের সমসাময়িক গৌড়ের সুলতান বরবক শাহ্ রত্নমাণিক্যের অনুরোধক্রমে চারিহাজার বাঙ্গালী পরিবারকে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যে প্রেরণ করেন। তদানীন্তন রাঙ্গামাটি (অধুনা উদয়পুর) রত্নপুর, যশোপুর এবং হীরাপুর এই চারিটি স্থানে ঐ বাঙ্গালী পরিবারবর্গকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য বলে রাখা দরকার রত্নমাণিক্য যে চার হাজার বাঙ্গালী পরিবারবর্গ এ রাজ্যে আনায়ন করেছিলেন তাদের হিন্দু বা মুসলমান জনগোষ্ঠীর উল্লেখ ছিল না।

স্বভাবতই ধরে নেয়া যায় বাংলার নবাব নিঃসন্দেহে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠীকে প্রেরণ করেছেন। তাহলে অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে এ রাজ্যে হিন্দু বর্ণের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদেরও আগমন হয়েছে সেই পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বা শেষের দিকে। সেই কালের বিচারে এ রাজ্যে মুসলিম জনগনের বসবাসের কালসীমা পাঁচশত বছরের অধিক ।

এ রাজ্যে মুসলিম জনগোষ্ঠীর আগমন এবং অবস্থানের হেতু নির্ণয় করতে হলে অতীতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ত্রিপুরার রাজাদের সঙ্গে সন্নিহিত অঞ্চলের মুসলিম শাসকদের যুদ্ধবিগ্রহ কলহবিবাদ নিত্য নিয়ত লেগেই থাকত - উদ্দেশ্য একই ধনরত্ন লুণ্ঠন বা রাজ্যের সীমানা সম্প্রসারণ। রণকৌশলে হারজিত ছিল - কখনো বা ত্রিপুর রাজারা পরাজিত হত — সাময়িক আত্মসমর্পণ আবার নূতন উদ্যমে যুদ্ধ চালিয়ে হৃত রাজ্য উদ্ধার করে মুসলিমদের হটিয়ে দিতে সক্ষম হতেন এবং

২। প্রাচীনকালে ত্রিপুরার রাজারা নামের পরে 'ফা' শব্দটি ব্যবহার করতেন। 'ফা' শব্দটি প্রভু বা রাজা অর্থে ব্যবহৃত হত।

৩। বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী সেই লক্ষ্মণাবতী অধুনা মালদহ জেলায় অবস্থিত।

৪। তদানীন্তন লক্ষ্মণাবতীর শাসকদের উপাধি।

মুসলিম রাজ্যের কিয়দংশে জবর দখল করেও নিতে সক্ষম হতেন। প্রাচীনকালে ত্রিপুর রাজারা বর্তমান বাংলাদেশ অন্তর্গত — শ্রীহট্ট, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চাঁদপুর চট্টগ্রাম দখল করে নিজের রাজ্যের সীমানা বিস্তার করেছিলেন। সুতরাং সেই সুবাদে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠী ত্রিপুর রাজাদের প্রজা হিসাবে গণ্য হত।

ত্রিপুরার নরপতিগণ প্রাচীন ভারতের আদর্শ রাজাদের প্রকৃত রাজধর্ম পালনে ব্রতী ছিলেন। একথা বলেছেন স্বয়ং বিশ্বকবি মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ। আদর্শ রাজার প্রকৃত রাজধর্ম হচ্ছে প্রজাপালন, প্রজাকল্যাণ সাধন, ন্যায়বিচার ও ধর্মীয় সহনশীলতা। উক্ত রাজধর্মের কর্তব্যগুলি ত্রিপুরনরেশবৃন্দ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। ত্রিপুর নরপতিবৃন্দ সনাতন হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মে নিষ্ঠাবান ছিলেন। সেই সঙ্গে পরধর্ম সহিষ্ণুতাও তাঁদের জীবনে ব্রত ছিল। তাই যুগ যুগ ধরে এ রাজ্যে হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ও মুসলিম ধর্মের নরনারী পাশাপাশি বসবাস করে এসেছে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে বিভিন্ন যুগে ত্রিপুর রাজাদের সঙ্গে মুসলিম নবাবদের বিবাদ-বিসংবাদ যুদ্ধ বিগ্রহ প্রায়শই সংঘটিত হলেও মুসলিম জনগণ বা প্রজাদের প্রতি ত্রিপুর রাজাদের অনুগ্রহ বা বাৎসল্য ছিল। সুতরাং রাজা বাদশাহ্‌দের মধ্যে যতই বিবাদ-বিসংবাদ-যুদ্ধবিগ্রহের রেশ থাকুক না কেন প্রজাকুলের জীবন যাত্রায় ঐ সবের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না। আজকের দিনে প্রজাকুলের মধ্যে রাজনীতির প্রভুদের প্রভাব প্রতিপত্তি সে যুগের জন্য সাধারণের জীবনে তেমন কিছু ক্রিয়াশীল ছিল না। তাছাড়া তৎকালে হিন্দু মুসলিমদের মধ্যেও সদ্‌ভাব ছিল — তদুপরি তথাকথিত এরাজ্যের আদিবাসীবৃন্দ সকল শ্রেণীর বহিরাগতদের সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন মনোভাব পোষণ করে চলত। ত্রিপুরার প্রাচীন ও আধুনিককালের ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় রত্নমাণিক্যের আমল থেকে (১৪৬৪-৮৮ খৃঃ) মাণিক্য যুগের শেষ পর্ব অর্থাৎ শেষ স্বাধীন রাজা বীরবিক্রম মাণিক্যের সময়কাল অবধি ত্রিপুরায় বসবাসকারী হিন্দু ও মুসলিম প্রজাগণের মধ্যে মুসলিম প্রজার সংখ্যাই অধিক ছিল।

মুসলিম প্রজাকুলের প্রতি ত্রিপুর রাজাদের বদান্যতার কথা পূর্বেই বলেছি। ত্রিপুরা (পার্বত্য) রাজ্যে মুসলিম প্রজাদের অবাধ আসাযাওয়ার অন্যতম কারণ ছিল মুসলিম অধ্যুষিত ত্রিপুর রাজাদের জমিদারি 'চাকলা রোশনাবাদ'। সমতল জেলা ত্রিপুরা (বর্তমান বাংলাদেশ অন্তর্গত) দীর্ঘকাল ধরে, মহারাজাদের অধিকারভুক্ত থাকার সুবাদে পার্বত্য ত্রিপুরায় মুসলমান প্রজাদের বসতি স্থাপনের কোন অসুবিধা ছিল না। ত্রিপুরা রাজ্যে মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতির প্রসারের অন্যতম কারণ হিসাবে গোবিন্দ মাণিক্যের[৫] নির্মিত

৫। গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্বকাল ১৬৬০-১৬৭৩ খৃঃ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন' নাটক গোবিন্দ মাণিক্যের কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

'সুজা মসজিদ'টি-সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মসজিদটি তৎকালীন চাকলা রোশনাবাদ তথা ত্রিপুরার অন্তর্গত কুমিল্লা শহরের নিকটবর্তী স্থানে গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। রাজমালা পাঠে জানা যায় গোবিন্দমাণিক্যের রাজন্যসুলভ সৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে ভারত সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শুজা (বাংলার সুবাদার) তাঁর নিজ কটিবন্ধ থেকে পারস্য দেশের একটি 'নিমচা' তরবারি এবং একটি মূল্যবান হীরক অঙ্গুরীয় গোবিন্দ মাণিক্যকে উপহার প্রদান করেন। সনটি সম্ভবত ১৬৬০-১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালের ঘটনা। তখন গোবিন্দমাণিক্য কিছুকাল রাজ্যচ্যুত ছিলেন। শুজাও ছিলেন অনুরূপ রাজ্যচ্যুত। পরবর্তীকালে গোবিন্দমাণিক্য ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে পুনরায় রাজ্যে ফিরে এসে সেই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার মানসে শুজা মসজিদটি নির্মাণ করান এবং শুজা নামে একটি গঞ্জ (বাণিজ্য কেন্দ্র) স্থাপন করেন। গোবিন্দ মাণিক্যের পরবর্তীকালের ত্রিপুর রাজারা এই মসজিদটিকে 'ওয়াকফ' সম্পত্তিরূপে গণ্য করে শুজাগঞ্জকে নিস্কর বা 'লাখেরাজ' ভূমি হিসাবে প্রচলন করেন।

আধুনিক যুগের রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরই সর্বপ্রথম ইসলামিক শিক্ষা প্রচলনের প্রতি যত্নবান হন। মহারাজ নিজে উর্দু ভাষায় পারদর্শী। মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়স্তরে উর্দু ও আরবী ভাষার পাঠক্রম চালু করেন। পরবর্তীকালে রাধাকিশোর মাণিক্য ও বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য রাধাকিশোর প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা বহাল রেখেছিলেন। এটাও লক্ষণীয় যে মাণিক্য শাসনের প্রথম দিকেও ত্রিপুরার রাজদরবারে রাজসদন প্রচার ও বিজ্ঞপ্তি জারীর ক্ষেত্রে ফারসী ভাষার বহুল ব্যবহার ছিল। তখনকার দিনে কোন কোন মুদ্রালিপিতেও ফারসী ভাষা ব্যবহার হত। রাজমালায় উল্লেখ রয়েছে কল্যাণমাণিক্যই ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের মধ্যে বাংলা ভাষায় প্রথম তাম্রশাসন চালু করেন। পরবর্তীকালে রাজকার্যে বাংলা ও ইংরেজীর ব্যবহার চালু হয়। তা সত্ত্বেও সরকারী দলিল দস্তাবেজ ব্যবহৃত বাংলার পাশাপাশি ফারসী ও উর্দু ভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

এখানে সবিশেষ উল্লেখ্য যে রাজন্য শাসিত ত্রিপুরায় বসবাসকারী মুসলিম জনগণ প্রাচীনকালে রাজ্যের প্রশাসনিক কাজকর্মে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হবার তেমন সুযোগ না পেলেও ত্রিপুরার শেষ স্বাধীন রাজা বীরবিক্রম মাণিক্যের আমলে কতিপয় শিক্ষিত মুসলিম কাজকার্যে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। বীরবিক্রম মাণিক্য তাঁর মন্ত্রিসভায় জনৈক মৌলভী তাজউদ্দিন আহম্মদ চৌধুরীকে মন্ত্রীপদে এবং মনসী আবদুল আজিজ ও মৌলভী আবদুল মুখির মজুমদারকে রাজসভার প্রিভি কাউন্সিলের পদে নিযুক্ত করেছিলেন।

পরিশিষ্ট

মহারাজ রত্নমাণিক্যের (রাজত্বকাল ১৪৬৪-৮৮ খৃঃ) পরবর্তী বংশধরগণ বহিরত্রিপুরার মুসলিম পরিবারকে যে সমস্ত ভূমিদান করতঃ এ রাজ্যে চিরস্থায়ী করে দিয়েছিলেন নিম্নে প্রদত্ত ভূমিদান সংক্রান্ত সনন্দ বা আদেশপত্র পাঠ করলে হৃদয়ঙ্গম করা সহজতর হবে।

নিদর্শন - ১

বীরচন্দ্র মাণিক্যের পূর্ববর্তীকালে প্রদত্ত সনদ ও দলিলপত্রাদি

আয়মা সনন্দ ঃ মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য

সম্মুখভাগ

শ্রীরাম সত্য জয় শ্রীরাম সত্য

৭ সস্তি শ্রীশ্রীযুতগোবিন্দ মাণিক্যদেব বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয়ি রাজানামদেশো হয়ং শ্রীকারকোনবর্গে বিরাজতে হন্যত রাজধানি হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে মেহেরকুল একদিল কজিরে ৩৩শন আধাহাসিলা আধাজঙ্গলা দেড় দ্রোণ জমি আয়মা দিছিলেন তান মৌতে তান ভাই ও পুত্রদনুসারে মৌজে তেতৈয়াড়া হাসিলাত বারকাণি ভূমি শ্রী কাজি হোসন ও শ্রীসুকুর মাহামদের আয়মা দিলাম নিজ হাতালে চাস করিয়া দোয় করিআ সুখে রহৌক পাঁচাপঞ্চক ভেটবেগার ইত্যাদি মানা ইতি সন ১০৭৭ তেং ১৯ কার্ত্তিক।

পশ্চাৎভাগে —

শ্রীবিশ্বাসনারায়ণ

নিদর্শন - ২

ফকিরান-লাখেরাজ সনন্দ ঃ মহারাজ কল্যাণ ও গোবিন্দমাণিক্য

তাম্রলিপির সম্মুখভাগ শ্রীরাম সত্য জয় শ্রীরাম সত্য

বড়গোস্বায়ির

.... গোবিন্দদেব বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয়ি পাদপদ্মানামা দেশোহয়ং

.... কারকোনবর্গ বিরাজতে হন্যতে রাজধানি হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে মেহের

.... র ফুলপুর অজহাসিলা এক দ্রোণ ভূমি শ্রীখন্দকার আবদুল গনিরে
.... দিলাম ফরমান দৃষ্টে নিজ হাত হালে চাষ করিয়া হরওক্ত নামাজ ও দো ......
.... য়া পরম সুখে ভোগ করৌক ভেট বেগার পঞ্চক ইত্যাদি সকল মানা ইতি
.... ১৫৭৮ সন ১০৬৬ তেরিখ ২৫ বৈশাখ নকল যাব্দা ১৫৮৯ সন ১০৭৭ তেরিখ
৮ মাঘ

পশ্চাৎভাগ -

শ্রীবিশ্বাস নারায়ণ

নিদর্শন - ৩

*** আয়মা সনন্দ ঃ মহারাজ কল্যাণমাণিক্য মঞ্জুরীকৃত এবং গোবিন্দমাণিক্য প্রদত্ত**

৭ স্বস্তি - শ্রীশ্রীযুত কল্যাণ মাণিক্য দেব বিষম সমর বিজয়ী মহা ম(ভগ্ন) পাদপদ্মা নামাদেশোহয়ং শ্রীকারকোন বর্গে বিরাজত হন্যস্তু রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার এলাকে উদয়পুর পং মেহারকুল মৌজে গোবিন্দপুর ও কান্দিরপার কাজি মুমিন ও কাজি মনসুর ও কাজি হুসেন ও কাজিয়লি এহারারে ৫ পাচ দ্রোণ বার কাণি ভূমি আয়মা দিলাম হাসিলা বার কাণি জঙ্গলা ৫ দ্রোণ সেই য়নুসারে তারার পুত্রেরে জান মাহাম্মদ ও শুকুর মাহাম্মদ ও হাসিমে আয়মা দিলাম বাড়ী গড় মাপ এহি বাড়ি জরিপ না করোক এহি ভূমিও লিয়া দোয়া করিয়া সুখ ভোগ করোক পাচাপঞ্চক ভেট বেগার ইত্যাদি সকল মানা ইতি সন যাব্রা ১৫৬৩ সন ১৯৬৯ তেরিজ ৭ মাঘ।

শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দ মাণিক্য-দেবেন দত্তং এবং পাঁচ দ্রোণ বার কাণি দিলাম সন ১০৭৭।

ত্রিপুর রাজপরিবার ও মণিপুরী সমাজ

রাজকুমার কমলজিৎ সিংহ

ভারত উপমহাদেশের একটি প্রাচীন জনপদের নাম 'তিপ্রা' বা 'তুইপ্রা'। এই রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ রাজমালা পাঠে জানা যায় তিপ্রা রাজা তৈদাক্ষিণ মেখলীরাজ কন্যাকে বিবাহ করেন। 'মেখলী' মণিপুরীর অন্য নাম। অসমীয়ারা মণিপুরীকে 'মেখলী' সম্বোধন করে এবং মণিপুরীরা আসামকে 'তেখাও' ও তিপ্রাকে 'তখেন' বলে।

---

* এই নিম্নের দানটি মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের মঞ্জুরীকৃত এবং সনন্দটি তৎপুত্র মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য প্রদত্ত।

রাজমালা লেখক আসামের অনুকরণে বা প্রভাবে মণিপুরীকে 'মেখলী' সম্বোধন করিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীতেও ত্রিপুরায় মেখলী নাম পাওয়া যায়। পুরাতন আগরতলার পূর্ব দক্ষিণে 'মেখলী পাড়া' সদর উত্তরে সিধাই থানাধীন 'মেখলী বাঁধ' উল্লেখনীয়। প্রাগৈতিহাসিক সময় হইতেই তিপ্রা ও মণিপুর রাজপরিবারের বৈবাহিক সূত্রতার কাহিনী থাকিলেও ইতিহাসে ত্রিপুর রাজ রাজধর মাণিক্য (১৭৮৫-১৮০৪ খৃঃ) মেখলী রাজ চিংথংখোম্বার (মহারাজ জয়সিংহ) (১৭৬৩-১৮৯৮ খৃঃ) কন্যা রাজকুমারী হরিশেশ্বরীকে বিবাহ করিয়াছিল বলিয়া লেখা হইয়াছে। মণিপুরের বিভিন্ন হস্তলিখিত 'কুমফিলোল', 'তখেললোল', 'লাইরিকয়েংবম্‌লোল' নামীয় বিভিন্ন পুঁথিতে মরিপুর রাজা পুনশিবা (১৪০৪-১৪৩২খৃঃ) সময় থেকে মণিপুরে তিপ্রাদের (তখেন) বসবাস ও আনাগোনার কথা লেখা হয়েছে।

১৯০১ খৃঃ/১৩১০ ত্রিং সরকারের উদ্যোগে শ্রীঅসিত চৌধুরী কর্তৃক গৃহীত সেন্সাস বিবরণী থেকে জানা যায় — ঐ সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের লোকসংখ্যা ১,৭৩,৩২৫ জন (হিন্দু ১,১৯,১৯২, মুসলমান ৪৫,৩২৩, বৌদ্ধ৫৯৯৯, খৃষ্টান১৩৭, ত্রাণাসিষ্ট ২৬৭৩। মোট জনসংখ্যার মধ্যে মণিপুরী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে — এরাজ্যের হিন্দু ও মুসলমান মণিপুরীগণের সংখ্যা ১৩,২৫৬ জন।

শিক্ষা ও সভ্যতায় ঠাকুর লোকগণের পরেই হিন্দু মণিপুরীর স্থান। ইহারা রাজ্যে প্রাচীন অধিবাসী নহে। মণিপুর রাজ্যের অন্তর্বিপ্লবের সময় লুসাইগণের ও ব্রহ্মদেশীয়দের অত্যাচারকালে অনেকে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া কাছাড় ও শ্রীহট্ট অঞ্চলে পলায়ন করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কতক এরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

মণিপুর ইতিহাস পাঠে জানা যায় — ১৭৬০ খৃঃ মণিপুর রাজ্য থেকে বিতাড়িত রাজপুত্র চিংসাই ত্রিপুররাজ কৃষ্ণ মাণিক্যের আশ্রয়ে কৈলাগড়ে বা কসবায় ছিলেন। কুমিল্লা সংলগ্ন কসবার কৈলাগড় দুর্গ থেকে রাজ্যশাসন পরিচালনা করিতেছিলেন মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য। বিতাড়িত মণিপুর রাজপুত্র চিংসাই হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে ইংরেজের সাহায্য অনুরোধ করিতে কৃষ্ণমাণিক্যের সহযোগিতার অনুরোধ করেন। ভাগ্যের বিড়ম্বনা কৃষ্ণমাণিক্যের বার্তা চট্টগ্রামস্থিত ইংরেজ সমীপে প্রেরণের পূর্বেই মণিপুর রাজা জয়সিংহ ব্রহ্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সাহায্যের জন্য চট্টগ্রামস্থ ইংরাজের নিকট দূত প্রেরণ করেন এবং চুক্তি অনুযায়ী মণিপুর রাজাকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে ইংরেজ অফিসার ভেরিলেষ্ট সৈন্যবাহিনী সহ মণিপুর উ়দ্দেশ্যে যাত্রা করে। পথে কৃষ্ণমাণিক্য কৈলাগড় দুর্গে বিশ্রাম করেন। ঐ সময় হিন্দুদের দোল উৎসব রাজোদ্যোগে ধুমধামের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। হোলী মানে আবির খেলা তৎসহ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কীর্তন, সাত সম্প্রদায়ের চৌদ্দমাদল অনুষ্ঠানে ইংরাজ সাহেব তাতে যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সম্ভবতঃ ঐ উৎসবে

মণিপুর রাজপুত্র চিৎসাই যোগদান করিয়াছিলেন কিন্তু রাষ্ট্রনীতি বা যুদ্ধে সাহায্যের আলোচনা হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। রাজ্য পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ চিৎসাই অন্যত্র আর কোথাওনা গিয়া কসবায় থাকিয়া যান। মণিপুরী আদি ভাষায় লিখিত 'চিংথংখোম্বা গঙ্গা চৎপা' পুস্তক পাঠে জানা যায় মণিপুরাধিপতি জয়সিংহ ১৭৯৮ খৃঃ জলপথে শ্রীহট্ট হইতে আগরতলায় আসিবার পথে হাওড়া নদীতে মোহনায় অবস্থিত মকরা (মোগড়া) বাজারে চিৎসাইয়ের পরিবারের মদনশাই ও অন্যান্যরা মণিপুর রাজাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

ত্রিপুরা রাজা কৃষ্ণমাণিক্য (১৭৪৭-১৭৮৩ খৃঃ) আগরতলায় রাজধানী করার সময় হইতেই রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক ধারার পরিবর্তনের সূচনা হয়। স্বামী মহারাজ কৃষ্ণ-মাণিক্যের মৃত্যুর সহমরণ থেকে বিরত হইয়া মহারাজার কষ্টার্জিত রাজ্য রক্ষার ও পরিচালন ভার বিধবা মহারাণী জাহ্নবী দেবী স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং প্রয়াত মহারাজার অন্তিম ইচ্ছা পূরণে কুমার রাজধরের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্তের প্রস্তাবে ইংরাজের সম্মতি আদায় করিতে সক্ষম হন। অবিবাহিত মহারাজ রাজধর মাণিক্য (১৭৮৫-১৮০৪ খৃঃ) মহারাণী জাহ্নবী দেবীর পরামর্শে মণিপুর রাজকন্যার পাণিগ্রহণের জন্য মণিপুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। অন্যদিকে এই সময়ে মণিপুর মহারাজ জয়সিংহ প্রথম পুত্র লাবণ্য চন্দ্রের উপর রাজ্যের দায়িত্ব অর্পণ করিয়া তিন পুত্র ও তিন কন্যা সহ শতাধিক পরিষদ সহ তীর্থ যাত্রায় ইম্ফল ত্যাগ করেছেন "চিংথং খোম্বা গঙ্গা চ্যপা" গ্রন্থে লেখা হয়েছে — মণিপুরের লামাংদোং (বিষ্ণুপুর) ত্যাগের পর জিরিবামের পথে মণিপুরের পশ্চিম পর্ব্বতে অবস্থিত কুকীর বসতি "মোম্থা" গ্রামে মহারাজার বিশ্রামকালে ত্রিপুরার মহারাজ রাজধর মাণিক্য রাজোচিত উপঢৌকন সহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাজকন্যার সহিত বিবাহের প্রস্তাব নিয়া আলোচনা হয়। প্রস্তাবে সম্মতি জানাইয়া মণিপুর মহারাজ বলেন — যেহেতু তীর্থযাত্রার পথে বিবাহের প্রস্তাব এবং বিবাহের জন্য ইম্ফল প্রত্যাবর্তন সম্ভব নহে তাই নবদ্বীপ যাওয়ার পথে আগরতলায় কন্যাদান সম্পন্ন করা হইবে। মহারাজ রাজধর মাণিক্যের সহিত কুমারী হরিশেশ্বরীর বিবাহ আগরতলায় সম্পন্ন হইল। মণিপুর রাজকন্যা রাজঅন্দরে প্রবেশ করিয়াই শ্রীশ্রী রাধামাধবের বিগ্রহ সেবা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। রাজকন্যার আকাঙ্ক্ষা পূরণে পিতৃদেব মহারাজ শ্রীশ্রী রাধামাধবের বিগ্রহ মণিপুর থেকে আনিয়ে রাজঅন্দরে প্রতিষ্ঠা করেন ও নিত্যসেবা পূজার জন্য ব্রাহ্মণ ও কীর্তনের গায়ক বাদক নিযুক্ত করেন। শ্রীশ্রী রাধামাধবের মন্দির রাজঅন্তঃপুরে নির্মাণ করিলেও ব্রাহ্মণ পূজারী ও অন্যান্য কীর্তনীয়াদের আবাস রাজবাড়ীর পাশেই নির্মাণ করা হয়। তাদের বসতি স্থানের নাম "মেখলী পাড়া" নামে পরিচিতি লাভ করে। ত্রিপুরার রাজ-রানীবৃন্দ দেশের বিভিন্ন স্থানে মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য ও

মহারানী জাহ্নবী দেবীও ইহার ব্যতিক্রম নন। আখাউড়া সন্নিকটে শ্রীশ্রী রাধামাধব মন্দির অন্যতম।

ত্রিপুরার মহারাজবৃন্দ ভক্ত বৈষ্ণব হইলেও রাজঅন্তঃপুরে বিগ্রহ স্থাপন করিয়া পূজারী ব্রাহ্মণ দ্বারা দৈনিক পূজার্চনা করার কথা আমার জানা নাই। রাজকুল দেবতা চৌদ্দদেবতাকেও রাজবাড়ীর বাহিরে চন্তাই দ্বারা পূজিত মন্দিরে পূজার্চ্চনা নির্বাহ করা হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আর্য ভারতের ভাগবত সংস্কৃতির সম্প্রসারণ পূর্ব ভারতের কিরাট ভূমি মণিপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৭৭৬ খৃঃ মণিপুরী মহারাজ জয়সিংহের স্থাপিত শ্রীশ্রী গোবিন্দজীর মন্দিরে নিত্য ভাগবৎ পাঠ ও কীর্তন সহ ধ্রুপদীর সংগীত নৃত্যের চর্চ্চা হয়। এই পরিবেশে লালিত পালিত মণিপুর রাজকন্যার ত্রিপুর রাজান্তপুরে মহারাণী হিসাবে প্রবেশ এবং শ্রীশ্রী রাধামাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সাথে ব্রাহ্মণ দ্বারা ভাগবৎ পাঠ, ধর্মালোচনা, নিত্য সন্ধ্যারতি উপলক্ষে সংকী র্তন, নৃত্যগীত চর্চ্চার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

বিবাহ সূত্রে রাজবংশের সহিত মণিপুরীদের আত্মীয়তার ধারাবাহিকতা পরবর্তী ত্রিপুরার রাজন্যবৃন্দ যথা-কাশী মাণিক্য (১৮২৭-১৯২৯খৃঃ), কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্য (১৮৩০-১৮৪৯, ঈশানচন্দ্র মাণিক্য (১৮৪৯-১৮৬২ খৃঃ), বীরচন্দ্র মাণিক্য (১৮৬২-১৮৯৬ খৃঃ), রাধাকিশোর মাণিক্য (১৮৯৬-১৯০৯ খৃঃ), বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য (১৯০৯-১৯২৩ খৃঃ), বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য (১৯২৩-১৯৪৭ খৃঃ) অবধি ক্রমান্বয়ে মণিপুরী মহিলাবৃন্দকে পাটেশ্বরী মহারানী, রানী হিসাবে গ্রহণ করে রাজপরিবারভুক্ত করিয়াছেন।

লেখক মণিপুরী রাজবংশীয় হইলেও তিপ্রাদেশে জন্ম বিধায় ত্রিপুরা রাজ্য আমার জন্মভূমি। কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্মণ লিখিত "দেশীয় রাজ্য" গ্রন্থের ১০০ পৃষ্ঠায় "মণিপুর চিত্র" অধ্যায়ে লিখেছেন "মণিপুর আমার কুটুম্ব রাজ্য। বহুদিন যাবৎ এ রাজ্য এবং রাজদর্শনের এবং সে রাজ্যের কাহিনী চিত্রিত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিব এই ইচ্ছা ছিল। মণিপুর বলিতে গেলে আমার কুটুম্বিতার তীর্থস্থান কাজেই তীর্থে যাইতে গেলে-রাজেন্দ্র সঙ্গমে/দীন যথা যায় দূরতীর্থ দর্শনে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ দীনবেশে মণিপুরে প্রবেশ করি নাই। কারণ আমি গিয়াছিলাম রাজপারিষদরূপে আমাদের মহারাজের সহিত। মণিপুরাধিপতি একবার রাজ অতিথিরূপে আমাদের রাজ্যে পদার্পণ করেছিলেন সে স্বর্গীয় রাধাকিশোর মাণিক্যের আমলে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় অতিথির প্রাপ্য প্রদর্শন বর্তমান মহারাজ (বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য) মণিপুর যাইয়া আদায় করিয়াছিলেন।

এই উপলক্ষে মণিপুরে কি বৃহৎ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল সে আড়ম্বর সম্বন্ধে উল্লেখ করিবার কোন দরকার নাই কারণ আমি চিত্রকর। চিত্রই সাহিত্যিকদের নিকট দেবার ইচ্ছা। মণিপুর রাজ্যের কাহিনী এবং অনেক কাহিনী যেন স্বপ্ন রাজ্যের কহিনীর মত বোধ হইত তাহা যেন একটা হেপী ভেলী চিত্রই হৃদয়পটে জাগিয়া উঠিত। এখন মণিপুরে সেই সুখময় সাগরও নাই। এখন মণিপুর দেখিলে মনে হয় - সে সুখ সাগর দৈব শুকাইল।

১৯১২ সালে মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর সপারিষদ মণিপুর রাজ্যে গিয়েছিলেন তাহা কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্মণ লিখেছেন। মহারাজ পারিষদবর্গে আমার স্বর্গীয় পিতা রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রাজকুমার বুদ্ধিমন্তের আদি নাম "অঙৌম্না" নামেই সকলের কাছে পরিচিত। অঙৌম্না কারুশিল্পের সৃজনশীলতা, সংগীত ও নৃত্যশিল্পে বিশেষ প্রতিভার জন্য মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর অঙৌম্নাকে বুদ্ধিমন্ত নামে ভূষিত করেন।

হাওড়া নদীর পূর্বপাড়ে পঞ্চাশ ফুটোর্ধ ইষ্টক নির্মিত স্মৃতি ফুবা বা মঠ দেখা যায়। ইহা স্থানীয় বয়স্ক মণিপুরীদের কাছে তেখাওলৈমার ফুরা বা মঠ নামে পরিচিত। অনুসন্ধানে আরও জানা যায় মহারাণী রত্নমালা কস্টিকপাথরে নির্মিত বংশীধারী কৃষ্ণ বিগ্রহ উল্লিখিত মন্দিরে স্থাপন করেন এবং বিগ্রহের নাম "কালাচাঁদ" নামে পূজিত মহারাণীর মৃত্যুর পর ত্রিপুর রাজপুরুষরা মণিপুরী ব্রাহ্মণ দ্বারা রাজঅন্দরে পূজিত শ্রীশ্রী রাধামাধবের মন্দিরে আনিয়া পূজার ভার নূতন হাবেলীতে শ্রীশ্রী রাধামাধব স্থানান্তরের সময় "কালাচাঁদ" ও স্নানান্তর করা হয় এবং কালাচাঁদের পূজার জন্য টাকার সংস্থান রাখা হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ব্রহ্মদেশীয়দের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত পূর্বভারত বিশেষ করে মণিপুর রাজ্য ব্রহ্মদেশীদের শাসনে চলে যায়। শাসক রাজপুরুষরা বিতাড়িত, হেপীভেলী জনশূন্য। মণিপুরের ইতিহাসে চহি তরেৎ খুন্তাকপা (১৮১৯-১৯২৬ খ্রীঃ) 'সেভেন ইয়ার্স ডিভাস্টেশন' নামে খ্যাত। এ সময়ে হাজার হাজার মণিপুরবাসী স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পার্শ্ববর্তী কাছাড়, শ্রীহট্টে আশ্রয় লইয়াছিল। মণিপুর রাজপুত্রবৃন্দ গম্ভীর সিংহ, চৌরাজ্য, মার্জিৎ ও মধুচন্দ্র সিংহ সহ অধিকাংশই রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় কাছাড়ে ক্যাম্প করে থাকেন এবং নিকট আত্মীয় ত্রিপুর রাজ্যের সাথে যোগাযোগ রাখেন।

ত্রিপুর বংশাবলী পাঠে জানা যায় কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের অন্যতম রাজকন্যা উর্মিলা ত্রিপুরায় আশ্রিত মণিপুর রাজবংশীয় কুমার দুলজিতের সহিত বিবাহ হয়। মণিপুর রাজপুত্র ত্রিপুর রাজ-জামাতার সম্মান লাভ করার ফলে রাজপরিবারের সাথে সম্পর্ক

আরও দৃঢ়তর হয়। রাজধর মাণিক্যের পরবর্তী মাণিক্যবৃন্দ বহু মণিপুরী-ললনার পাণি গ্রহণের ফলে রাজ অন্তঃপুরে মণিপুরী সংগীত নৃত্য চর্চা বৃদ্ধি পায়।

শুরু করেছিলাম ১৯০১ সালের সেন্সাস বিবরণীতে বর্ণিত ত্রিপুরার ১,৭৩,৩২৫ লোকের বসতি অর্থাৎ মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের প্রজাবৃন্দের ও রাজপরিবারের কথা দিয়ে। উল্লিখিত লোকসংখ্যার মধ্যে রাজপরিবার ও ঠাকুরলোক ক্ষত্রীয়বংশোদ্ভুত ১২৫৬ জন এবং মণিপুরী ১৩,২৫৬ জন। দেখা যায় সমস্ত ত্রিপুরীই রাজপরিবার ভুক্ত নয়, আবার এই ১৩,২৫৬ জন মণিপুরী সবাই রাজকুল ভুক্ত নয়। মহারাজ কৃষ্ণকিশোর ১৮৪৪সালে নূতন হাবেলীকে রাজধানী ঘোষণা করিলেও বাস্তবে বীরচন্দ্র পুরাতন আগরতলা হইতে রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। নূতন হাবেলী আগরতলার রাজধানী ঘোষণার অর্থ হইল অফিস, আদালত, শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মিলনের স্থান।

পার্বতীয় গ্রামীণ ত্রিপুরায় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য ১৯৭১ সালে প্রথম নগর সভ্যতার সূচনা করেন। .... এর .... রিপোর্টে ত্রিপুরার পোলিটিকেল এজেন্টের রিপোর্ট উদ্ধৃতি দিয়া লিখিয়াছেন ....

রাজধানীকে নগর ঘোষণায় নগরবাসী (ভদ্রলোক) দিগকে প্রাসাদ সংস্কৃতি চর্চায় যুক্ত করা হয়েছে। মহারাজার আত্মীয়দিগকে (মণিপুরী সহ) ঠাকুরলোক শ্রেণী বিভাগ করিয়া নগরের আভিজাত্য সমাজ সৃষ্টি করা হয়েছে। এবং রাজ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে আগরতলা নগরবাসী শিশুদের বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করেন বিদ্যালয়ে মহারাজ কুমার, কুমার বাহাদুর, ঠাকুরলোক, মণিপুরী, ত্রিপুরা, লস্কর ও পার্বত্য প্রজাদের বিনা বেতনে বিদ্যালয় শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে "ছায়াদ্রা' নূতন রাজধানীতে রানী পূর্ণকলার মসতির দ্বারা নূতন হাবেলীতে জনবসতির সূচনা হয়। পরবর্তী কালে সম্ভবত ১৮৪৪ সালে বর্তমান রাজবাড়ীর স্থানে ছনের গৃহ নির্মাণ করিয়া কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য নিজগৃহ রাজবাড়ীতে বাস করিতে আরম্ভ করেন।

মন্দির ভিত্তিক গঠিত মণিপুরী সমাজের জীবন আচারে দ্রুপদীর সংস্কৃতি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এই কারনেই অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন মণিপুরী সমাজ মণিপুরীর ধ্রুপদীয় সংস্কৃতি ত্রিপুর রাজ অন্তপুর সংস্কৃতিতে পরিণত হইলেও মণিপুরী সমাজে রূপান্তরিত হয়নি। কারণ মদ্যপান ও মাংসাহার মণিপুরী সমাজ বর্জন করিয়াছে।

১৯০৯ সালে সপারিষদ ভক্তচূড়ামণি স্যার চূড়াচাঁদ আগরতলায় আসিয়াই রাধাকিশোর মাণিক্যের মাতা মহারানী রাজেশ্বরী দেবী কর্তৃক স্থাপিত মণিপুর রাজ বংশের

কুলদেবতা "পাখংবা"র পূজার্চনা উপলক্ষে "লাই হারাওবা" লোক উৎসব (লোকনৃত্য) উদ্‌যাপন করেন। তখন পাকা মন্দির হয় নাই। ছোট টিনের চৌচালা মন্দির। রাধাকিশোর মাণিক্যের অন্যতম মহারাণী রত্নমঞ্জরী পাকা মন্দির নির্মাণ করেন ১৯১৬ খ্রীঃ। ধলেশ্বরের মহারাণী রাজেশ্বরীর টিনের মণ্ডপে মণিপুরী সমাজ মহারাজ চূড়াচাঁদকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। তিনি মণিপুরী বিদ্যার্থীদের থাকার জন্য (ছাত্রাবাস) ৫০০ টাকা দান করেন মণিপুর মহারাজার অভ্যর্থনায় রাজকোষ থেকে অন্যূন পঞ্চাশ হাজারের অধিক ব্যায়িত হয়েছিল বলে জানা যায়। এ সনের শেষের দিকে রাধাকিশোর মাণিক্যের মৃত্যুর পর যুবরাজ বীরেন্দ্র কিশোরের রাজ্যাভিষেক যোগদানের জন্য মহারাজ চূড়াচাঁদের দ্বিতীয়বার আগরতলায় আগমন ঘটে।

মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য কুটুম্বিতা ছাড়াও মণিপুরী সমাজের সাথে অন্তরঙ্গ হইয়া যান এবং মণিপুরী সমাজের বিভিন্ন কর্মধারায় জড়াইয়া পড়েন। মন্দির কেন্দ্রীক সমাজ ব্যবস্থায় উপযুক্ত শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গুরুত্ব অনুভব করিয়া তিনি এক আদেশ জারি করেন। ১৩০৮ ত্রিপুরাব্দের ২৭শে কার্ত্তিক — রাধাকিশোর মাণিক্যের ২০ নং আদেশে শ্রীযুক্ত মীনেশ্বর সর্বভৌমকে এ রাজ্যবাসী মণিপুরী জাতিদেগের উপর পাতিপত্র ও বিধি ব্যবস্থার দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং বলা যে তাহার ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইবে। এই আদেশ মণিপুরীদের মধ্যে প্রচার করা হয়। পরবর্তীকালে সমাজের নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে প্রচারিত এক আদেশে ১৩১৫ ত্রিং ১২ই অগ্রহায়ণ - অর্ডার নং ২৩ বলা হয় প্রাগুপ্ত সমাজের নেতাগণকে অনুজ্ঞা করা যাইতেছে যে তাহারা কোনও বিষয়ের পঞ্চায়েতী মীমাংসা করিবার অথবা কোনও শাস্ত্রীয় অনুশাসন সঙ্গতবিধি ব্যবস্থা প্রদান করিবার পূর্বে তাহা এপক্ষ সদনে সবিস্তার লিখিত .... দাখিল করিতে হইবে। (মূল কপি)

সম্ভবতঃ মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য আগরতলার রাজ অন্তঃপুরে মহারাণীগণকে অন্তরীন না রাখিয়া প্রজাদের সুখ দুঃখের অংশীদার এবং নিজ নিজ সম্পদ সৃষ্টির সুযোগ দানের জন্য রাণী মহারানীকে ভূমি তাল্লুকী বন্দোবস্ত দিতে আরম্ভ করেন এবং পরবর্তী মহারাজারাও তা অনুসরণ করেন। নিজেদের সম্পদ সৃষ্টির সঙ্গে মণিপুরী বসতি গ্রামে গ্রামে দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর দিয়া ঠাকুর মন্দির স্থাপন ও ধর্ম, সংস্কৃতি রক্ষায় সাহায্য করিয়া সমাজকে পরিপুষ্ট করেন। সদরের অধিকাংশ স্থানের সঙ্গে মহারানীদের নাম বিজড়িত। বিশালগড়ের রাজেশ্বরীপুর (মহারানী রাজেশ্বরী) ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় কমপ্লেক্স সূর্যমনি নগর (রানী সূর্যমনি) সাথেই রাণীর খামার (রানী কলাবতী) প্রভাপুর (রানী প্রভাবতী, অরুন্ধতি নগর (রানী অরুন্ধুতী মহারাজ বীরবিক্রমের মাতা) সিধান থানার অন্তর্গত তারানগর (দীনবন্ধু ঠাকুরের কন্যা যার ৩০০ দ্রোণ তালুকের আয়ে গঠিত

তারাসুন্দরী ট্রাস্ট ফান্ড হইতে দুঃস্থ বিধবা মহিলাদের মাসিক সাহায্য দেওয়া হয়)। মহারাণী তুলসীবতীর তাল্লুক একদা রাণীগঞ্জ নামে খ্যাত বর্তমানে রাণীরবাজার নগর পঞ্চায়েতে উন্নীত হইয়াছে। এই তালুকের সংগৃহীত অর্থে মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যয় নির্বাহিত হত। এবং নারী শিক্ষার উৎসাহের জন্য ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে বিনা ব্যয়ে বালিকাদের শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হত।

আগরতলা পৌর এলাকায় আসাম-আগরতলা রাস্তার উত্তর পাশে বনমালীপুরের মঠ চৌমহনী নামে অবস্থিত শত ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট 'মঠ' স্থাপন করেন মহারানী মনমোহিনীর নিজস্ব ভূমিতে। শতবর্ষোত্তীর্ণ পুরাতন মঠে সংস্কৃতে শিলা লিপি পাঠে জানা যায় — "ত্রিপুরেশ্বরী মনমোহিনী দেবী ১৩০২ ত্রিপুরাব্দের বৈশাখ মাসে পিতার স্মৃতিতে মঠ উৎসর্গ করা হইল। জীতেন্দ্রীয় ক্ষমাবান ক্ষত্রিয় কুলোৎপন্ন কীর্ত্তিধ্বজ ১৩০১ ত্রিপুরাব্দের ১০ই আষাঢ় প্রয়াণে পিতার শ্মশান স্থানে মঠ স্থাপিত হয়।"

মহারাজার জাতিকুটুম্বদিগকে "তালুক" বন্দোবস্তের ন্যায় মণিপুরী কুটুম্বদেরকেও ঠাকুর, কবরা, নারায়ণ, দেববর্মা উপাধির সহিত ছোট বড় "তাল্লুকী" বন্দোবস্ত দিয়া রাজ্যে মণিপুরী আধিপত্যের সুযোগ দেওয়া হয়। আগরতলার পূর্ব দক্ষিণে যোগেন্দ্রনগর (পাণ্ড নবম্ যোগেন্দ্র ঠাকুরের তাল্লুক) বর্তমানে কলেজটিলা (পাণ্ডনবম্ রসমোহন ঠাকুরের তাল্লুক) ধর্মনগরের ৬০০ দ্রোণ ধর্মপুর (ধর্মজিৎ রাজকুমারের তাল্লুক) কামেশ্বর গ্রাম (কামেশ্বর চৌধুরীর তাল্লুক)।

রাজধানী আগরতলা ও পাশ্ববর্তী এলাকায় মণিপুরী বসতির বৃদ্ধিতে জনসংখ্যা বৃহৎ সমাজে পরিণত হয়। মণিপুরী গ্রামের স্বনির্ভর সংগঠনের নাম 'খুন' বা 'খুল' সমাজের মণ্ডপ ভিত্তিক সংগঠনে 'খুনের' — দীক্ষাগুরু ব্রাম্মণ ও পুরোহিত ব্রাম্মণ, মাইবা, মাইবী বা বৈদ্য, জ্যোতিষী (পাঞ্জী), গায়ক, বাদক, অনিবার্য তৎসহ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক যুবক অবশ্যই কীর্তনের অংশীদারী হইতে হইবে। প্রাগুক্তের একটির অভাবে খুনের মর্যাদা পায় না। এইরূপ 'খুনের' সদস্যদের সম্মতিক্রমে "খুনলাকপা" (সর্দার গাওবুড়া) নেতা নির্বাচিত হয়। গ্রামের খুনের সংখ্যা বৃদ্ধিতে পুরোহিত ও খুনলাকটার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে সামাজিক নানা বিষয়ে বিভিন্ন পুরোহিত ও নেতার মতবিরোধও বৃদ্ধি পায়।

ত্রিপুরার রাজন্যবৃন্দ হিন্দু হইলেও মণিপুর মহারাজার হিন্দু বৈষ্ণব সমাজের আচার, ব্যবহার ও কর্মধারায় যে সম্পূর্ণ পৃথক ইহা জ্ঞানী সংস্কৃতিসম্পন্ন রাধাকিশোর মাণিক্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছেন ও ত্রিপুরী হিন্দু হইয়াও মণিপুরী সমাজে অনুরক্ত, শ্রদ্ধাশীলতার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মহারানী তুলসীবতীর গর্ভজাত রাধাকিশোর মাণিক্যের পুত্র রাজকুমার বীরেন্দ্র কিশোর ছিলেন জাতশিল্পী। তিনিই একমাত্র রাজা

কুটুম্ব রাজ্য মণিপুরে গিয়াছিলেন। এবং মণিপুর রাজপরিবারের সঙ্গে মণিপুরী সমাজের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। মণিপুরী ধ্রুপদীয় সংস্কৃতির মৃদঙ্গ বাদন শিক্ষা গ্রহণ করিয়া মণিপুরী সমাজে আদৃত ও গভীরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন। বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের সময় হইতেই নৃত্যগীতের মন্দিরা, করতালও ব্যয় বহুল রাসের পোষাক (পোৎলোই) রাজবাড়ীতে অধিক পরিমানে প্রবেশ করে ও গ্রামেও প্রসার লাভকরে।

রাধাকিশোরের স্থাপিত রাজবাড়ীর সাথে মণিপুরী সমাজের সম্পর্ক সূত্র ধরে বিভিন্ন বিষয়ে সমাজে ন্যায় বিচারের জন্য মণিপুরী নেতৃবৃন্দ বীরেন্দ্র কিশোরের দরবারে উপস্থিত হন। বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য রাজোচিতভাবে ভ্রাতা মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর (প্রাইভেট সেক্রেটারী) মহারাজ কুমার নবদ্বীপ বাহাদুর (রাজমন্ত্রী), কর্ণেল মহিম ঠাকুর, উজীর গোপীকৃষ্ণ সমীপে সরকারীভাবে বিচারের ভার ন্যস্ত করেন। মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরের অনুমোদন ক্রমে মন্ত্রী অফিস হইতে বিচারের আদেশ প্রচার করা হয়, অতঃপর কোন পক্ষ বা ব্যক্তি বিশেষের অনুষ্ঠিত শাস্ত্রীয় বা সামাজিক কার্য্য অপরের মত বিরুদ্ধ হইলে তাহা নিয়া কোনরূপ দলাদলি বা বিবাদ না করিয়া অথবা উক্ত কার্যের প্রতিবন্ধকতা না করিয়া মহারাজ মাণিক্যের সাক্ষাৎ গোচর করিয়া মীমাংসা করিবে। এই আদেশের বিপরিত আচরণ করিলে রাজাজ্ঞা অবজ্ঞার জন্য বিহিত শাস্তির আদেশ দেওয়া যাইবে। ১৭/৮/১৩১৯ ত্রিং (মূল আদেশের কপি)।

চন্দ্রবংশীয় ত্রিপুরী সমাজের রাজ-অন্তঃপুরে মণিপুর দুহিতাকে রাজরাণীর স্থান দিয়া মণিপুরী সংস্কৃতি গ্রহণ ও আত্মস্থ করিলেও স্বশাসিত মণিপুরী সমাজের উপর রাজ আধিপত্য সমাজের ক্ষতিকর মনে করিয়া বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য এক আদেশে মণিপুরী জাতীর "সমাজপতি" পদ সৃষ্টি করেন এবং রাজকুমার বুদ্ধিমন্তকে সমাজপতি পদে নিযুক্ত করেন।

মণিপুরী জাতির সমাজপতি নিয়োগ

সমাজপতি নিযুক্তির ফলে রাজ্য সরকার তথা রাজ দরবারে মণিপুরী প্রতিনিধিত্বের স্বীকৃতি লাভ করিল। সমাজপতির মাধ্যমে মণিপুরী জ্যোতিষী, মণিপুরী বৈদ্য (মাইবা) পদের সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং রাজ্যের বিভিন্ন উৎসবে মণিপুরী নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানের দায়িত্বে থাকে । মণিপুরী মাইবা দুই প্রকারের ১) বন্যলতা-পাতা দ্বারা তৈরী ঔষধ (আয়ুর্বেদ) দ্বারা চিকিৎসাকারী (কবিরাজ বা বৈদ্য), ২) মাইবা অর্থাৎ নাড়ী বিশেষজ্ঞ অসুস্থ ব্যক্তির শীরের অভ্যন্তরস্থ নাড়ী পরীক্ষা করিয়া তন্ত্র, মন্ত্র ও তান্ত্রিকমূলক আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া পূজা পার্বণের মাধ্যমে চিকিৎসা করা। দ্বিতীয় প্রকারের মাইবারাই

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মণিপুরী সমাজে অপরিহার্য।

সমাজপতি রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত কর্তৃক বিশালগড়ের কর্ণসিংহ ঠাকুর সমীপে লিখিত তারিখ বিহীন এক পত্রে (মণিপুরী ভাষায় লেখা) জানা যায় মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর প্রায় অর্ধমাস যাবৎ শয্যাশায়ী, মহারাজার ইচ্ছা আপনাকে একবার দেখানো রাজার অনুমতিক্রমে ঠাকুর সাহেবকে পত্রপাঠ আগরতলায় আসিবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। (মূল চিঠি) ঐ সময়ে আগরতলার ধলেশ্বর নিবাসী পাখোয়াজ বাদল দুন্দুল সিংহবে মণিপুরী মাইবা ও বিনোদ সিংহকে কবিরাজ হিসাবে রাজবাড়ীর স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

ফ্রিডম্ ফাইটার মণিপুরের লাইখুরাম খগেন্দ্রজিৎ সিংহের প্রকাশিত জীবনী গ্রন্থ পাঠে জানা যায় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের অন্যতম মহারানী রত্নমঞ্জরীর স্নায়ুঘটিত মনোব্যাধিজনিত রোগ চিকিৎসা মণিপুরী প্রথায় করার জন্য মহারানী ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্য নবদ্বীপস্থিত লাইখুরাম খগেন্দ্রজীৎ সিংহকে আগরতলায় নিয়ে আসেন। জ্যোতিষী এবং মণিপুরী প্রথায় চিকিৎসার (মাইবা) সেবা ও যত্নে মহারানী রোগমুক্তি লাভ করেন। পরবর্তীকালে খগেন্দ্রজিৎকে মহারানীর প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসাবে নিযুক্ত করেন এবং আগরতলার বনমালীপুরে লাইনিংথৌ পখংবা মন্দিরের পার্শ্বে স্ত্রী-পুত্র পরিবার সহ থাকিবার বন্দোবস্ত করেন। মহারানী খগেন্দ্রজিতের গুণে মুগ্ধ হইয়া "জ্যোতিষ রত্নকর" উপাধিসহ রূপার মেডেল প্রদান করেন।

১৯০১ সালে মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের কৈলাসহর পরিভ্রমণকালে যুবরাজ বীরেন্দ্র কিশোরও অনুগমন করেন। কৈলাসহরে অনুষ্ঠিত রাজদরবারে কুকী প্রধানকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং কুকীবসতি এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। সেই সময় যুবরাজ বীরেন্দ্র কিশোরের কুকী ভাষায় পরিচিতি ঘটে। মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের সময় ১৮৯১ খৃঃ রাজ সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে আগরতলার বা বিদ্যালয়ে এক বৎসরের ট্রেনিং নিতে হইবে। শিক্ষকদের মধ্যে ত্রিপুরী ২ মণিপুরী ২ বাঙ্গালী ২ এবং কুকী ২ শিক্ষক হওয়া আবশ্যক।

মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরের সময় ১৯১৬ খৃঃ কৈলাসহর উকিল শ্রী ব্রজেন্দ্র গোপাল সিংহের সম্পাদনায় "মণিপুরী ও কুকী" ভাষা শিক্ষার সহজ উপায় বই প্রকাশিত হয়। ত্রিপুরা সরকারের ১৫ই চৈত্র ১৩২৯ ত্রিং/১৯১৯ খৃঃ মেমো-২ প্রকাশিত পুলিশ ডিপার্টমেন্টেল পরীক্ষার বিবরণীতে বলা হইয়াছে।

বাঙ্গালী বা হিন্দুস্থানী কার্যকারীগণ মধ্যে ত্রিপুরী ভাষায় ও মণিপুরী ভাষায় যাহারা পারদর্শিতার সহিত পাশ করিতে পারিবেন তাহাদিগকে ২৫ বা তন্মূল্যের কোন জিনিষ

পুরস্কার দেওয়া হইবে, যাহাদের মাতৃভাষা মণিপুরী বা ত্রিপুরী তাহাদের পক্ষে এই প্রযোজ্য হইবে না।

৪র্থ বিষয় (মৌলিক) ১) ত্রিপুরা ভাষা (Optional) ২) মণিপুরী ভাষা (Optional) শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্য গুরু রাজকুমার বুদ্ধিমন্তকে পাঠাইয়া আশ্রমবাসীদের নৃত্যশিক্ষার সুযোগ দানে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ১৯শে মাঘ ১৩২৬ (১৯১৯ খৃঃ) চিঠিতে মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরকে ধন্যবাদ জানাইয়া তাঁত শিল্পের জন্য বুদ্ধিমন্তের স্ত্রীকে শান্তিনিকেতনে পাঠাইবার অনুরোধ করেন।

মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের মৃত্যুর পর বীরবিক্রমের অভিষেক আড়ম্বরে ধুমধামের সহিত হিন্দু শাস্ত্র মতে ২৯/১/১৯২৮ খৃঃ (১৫ মাঘ ১৩৩৭ ত্রিং) সম্পন্ন হয়। অভিষেকে মণিপুরী কীর্তন ও নৃত্যানুষ্ঠান মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যকে অভিভূত করে ও সংস্কৃতি সম্পন্ন মণিপুরী সমাজ উন্নয়নের ভাবনায় অলিখিত বিধিনির্ভর সমাজপতি পরিচালিত সমাজকে সাজাইবার ব্যবস্থা করেন। মণিপুরী সমাজ সম্প্রদায়ের বিধি ও নিয়মাবলী রচনা করা হয় ও মহারাজার অনুমোদন লাভ করে। মহারাজার ২৩/৩/৩৯ ত্রিং ১৯২৯ খৃঃ তারিখের আদেশে ৯ সদস্য বিশিষ্ট "লৈপাক কেন্দ্রীয় সভার" সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন।

লৈপাক কেন্দ্রীয় সভা

১) রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত সিংহ, সমাজপতি ২) শ্রী কুমুদ বন্ধু সিংহ ঠাকুর, সহকারী সমাজপতি, ৩) শ্রী কামিনী কুমার সিংহ, কর্মকর্তা, ৪) শ্রী নীল সিংহ, ৫) শ্রী দুন্দুল সিংহ, ৬) শ্রী রাধামাধব শর্মা, ৭) শ্রী সুবল চন্দ্র সিংহ, ৮) শ্রী গোকুল চাঁদ সিংহ ৯) শ্রী নবীন চন্দ্র সিংহ।

মণিপুরী সমাজ ও সম্প্রদায় সংক্রান্ত নিয়মাবলীর (সংশোধিত ও পরিবর্ধিত) সন ১৩৪১ ত্রিং। এই নিয়মাবলীর ১ নং আদেশে বলা হইয়াছে মণিপুরী পারিবারিক, সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক যাবতীয় ব্যাপারের বিচার মীমাংসাদিকার্য কেবল মণিপুরীদের দ্বারা সম্পন্ন হইবে।

মহারাজার অনুমোদিত এই নিয়মাবলীর কথা শাসনের কর্মকর্তা অবহিত তাই সামাজিকও নারীঘটিত ব্যাপারের নালিশ থানা কর্তৃপক্ষ অভিযোগ গ্রহণ না করে সমাজপতির নিকট প্রেরণ করেন।

মণিপুরী সমাজ সংগঠনের মূল ভিত্তি "খুন" পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রতি খুনের সদস্যদের অনুশাসনের জন্য রচিত বিধিতে তিনটি স্তর করা হইয়াছে। প্রাথমিক

স্তর স্থানীয় ''খুন'' দ্বিতীয় স্তর পার্শ্ববর্তী দুই বা ততোধিক খুনের সম্মিলিত 'লোপাক' ও তৃতীয় স্তর লৈপাক কেন্দ্রীয় সভা ও যেখানে সর্ব ঊর্ধে রাজ্যের মহারাজ।

গ্রামের মণিপুরী খুন সংগঠনকে গ্রাম পঞ্চায়েত বলা যায়। গ্রামীণ ভারতকে স্বরাজ নামীয় মহাত্মা গান্ধীর স্বপ্ন দর্শনের বহু পূর্বেই বনে জঙ্গলে অবস্থিত অসংখ্য গণনায় স্বল্পসংখ্যক মণিপুরী গ্রাম স্বরাজ জীবন শুরু করিয়াছে। খাদ্যে ও বস্ত্রে স্বাবলম্বন সমাজ জীবনে একে-অন্যের সহযোগীর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া এক বৃহৎ পরিবারের নাম খুন বা পঞ্চায়েত। মণিপুরী সমাজ বিধি রচনায় স্বরাজ ভাবনা প্রতিফলিত হইয়াছে। সংস্কৃতি কেন্দ্র 'মণ্ডপ' ও বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র ''বিদ্যালয়' দায়িত্ব খুন বা পঞ্চায়েতে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। স্কুল ঘর ও মণ্ডপ ঘর নির্মাণের প্রয়োজনীয় ছন, বাঁশ ও কাঠ, পালা বিনা মাশুলে সংগ্রহ করা সরকারী অনুমোদিত।

১৯৬৩ সনে মণিপুর মহারাজ স্যার চুড়াচাঁদের সভাপতিত্বে কাছাড়ে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় 'নিখিল হিন্দু মণিপুরী মহাসভার সম্মেলনে' বঙ্গদেশ, মণিপুর, আসাম, ব্রহ্মদেশ ও ত্রিপুরার প্রায় ৪০০ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে গৃহীত প্রস্তাব মণিপুরী জাতি গুরুত্বের সহিত গ্রহণ করে। ত্রিপুরার মণিপুরী কেন্দ্রীয় সভার কর্মকর্তা শ্রী কামিনীকুমার সিংহ মহাশয়ের ১৭/১২/১৩৪৬ ত্রিং তারিখে প্রচারিত বিবৃতিতে শিলচর কাছাড়ের সম্মেলনে গৃহীত ১১ নং প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সভার সমর্থনের কথা বলা হইয়াছে।

১৯৪৭ ইং ১৭ই মে (২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭ ত্রিং) রাত্রি ৮.৪০ মিঃ মহারাজ বীরবিক্রমের মহাপ্রয়াণ ঘটে। ১৮ই মে বীরবিক্রমের শবদেহ লইয়া বিশাল শোকযাত্রা বাহির হয় যার পুরোভাগে ছিল মণিপুরী কীর্তনের স্থান।

মহারাজ বীরবিক্রমের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে মণিপুর মহারাজ বোধচন্দ্র স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং বিখ্যাত নট সংকীর্ত্তন শিল্পী ওঝা নাতুম ও বাদক ওঝা আপাবীর নট সংকীর্ত্তন পালা সঙ্গে নিয়ে আসেন। বীরবিক্রমের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে মণিপুরী সমাজের আবাল বৃদ্ধ বনিতা কোন আমন্ত্রণের অপেক্ষা না করে মহারাজার পারলৌকিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত সংকীর্ত্তনের রসাস্বাদন করেন।

মণিপুরের ''চৈথারোল কুম্বাবা'' পাঠে আরও জানা যায় ত্রিপুরার মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববর্মা বাহাদুর কে সি এস আই প্রয়াণে ইংশোক ১৯৪৭ মে মাসের ১৯ ও ২০ মণিপুরে অফিস এবং বিদ্যালয় ছুটি ঘোষণা করা হয়। মণিপুর মহারাজ সংকীর্ত্তন পালা সহ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগদান করেন। অনুরূপভাবে ১৯৪১ সালে মণিপুরেশ্বর মহারাজ নৃপচুড়ামণি চুড়াচাঁদ সিংহ বাহাদুর কে. সি. এস. আই. সি. বি. ই-র শ্রাদ্ধানুষ্ঠানেও ত্রিপুরার রাজপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। লেখকের জানা মতে — ত্রিপুরা থেকে মহারাজকুমার হেমন্তকিশোর দেববর্মা, রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত, নিংথৌখোংজম, চন্দ্রহাস সিংহ, মহারাজ

কুমার যতীন্দ্র (ছুটুবী কর্তা) কুমার হরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা মহারাজার পক্ষে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

১৯৫৫ সালে মণিপুর মহারাজ বোধচন্দ্রের পারলৌকিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে মাতা মহারানী প্রভাবতীর আদেশে ত্রিপুর রাজপক্ষে মহারাজকুমার বংকিম দেববর্মা, কুমার হরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা এবং চণ্ডাবম্ নবীন সিংহ ঠাকুর প্রমুখরা উপস্থিত ছিলেন।

মহারাজ বীরবিক্রমের মৃত্যুতে রাজভক্ত মণিপুরী সমাজ অভিভাবক হীনতায় দিশেহারা হইয়া পড়ে। রাজঅন্দর সূত্রের খবরে জানা যায় - রাজনীতি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বীরবিক্রম মৃত্যুর পূর্বে রাণী মহারানীদের বলেছেন — আমিই সর্বশেষ রাজা পরবর্তী কেহ আর রাজত্ব করিবে না।

ইংরেজ চলিয়া গেল। ভারত স্বাধীন হইল ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ ইং আর স্বাধীন ত্রিপুরা ভারতভুক্ত হইল ১৫ই অক্টোবর ১৯৪৯ ইং। রাজা-প্রজা সম্পর্কের বিলুপ্তি ঘটল। ত্রিপুরার রাজভক্ত মণিপুরী সমাজকে সাংবিধানিক ভক্তে পরিণত করিতে ১৯৪৫ সালে স্থাপিত "ত্রিপুরা ষ্টেট মণিপুরী শিক্ষা সমিতি" গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনের সহিত সমাজের খাদ্য ও বস্ত্র স্বাবলম্বনে উদ্বোধিত করিতে চেষ্টা চালায়। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা পাঠের সাথে রাজনীতির নব্যপাঠে সাম্প্রদায়িক দলাদলি সৃষ্টি হয় এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মণিপুরী শিক্ষা সমিতি যে কতগুলি বিষয়ের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে তাহার মধ্যে ছিল ঃ

১। বিদ্যালয়ে মহারাজকুমার, কুমার বাহাদুরগণ, ঠাকুরলোক মণিপুরী, ত্রিপুরা, লস্কর ও পার্বত্য প্রজাদের ফ্রি এডুকেশন ছিল। নব ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার মণিপুরীকে বাদ দিয়াছেন। মণিপুরীদেরকে পূর্বের মত ফ্রি এডুকেশন দেওয়া ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া।

২। আগরতলা, খোয়াই ও কৈলাশহরে বন্ধ মণিপুরী ছাত্র বোর্ডিং চালু করা।

৩। বস্ত্র স্বাবলম্বনের উদ্দেশ্যে মণিপুরী পরিবারের তাঁত শিল্পীদের উপযুক্ত সাহায্য দেওয়া। ৪। মণিপুরী সংস্কৃতির সংগীত নৃত্যকে রাজ্যিক মর্য্যাদা দিয়ে নৃত্য গীত চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করা।

এই নব্য পাঠে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দলাদলিতে রাজ অন্দরের রানী-মহারানীরাও জড়াইয়া পড়েন। মণিপুরী সমাজ ব্যবস্থায় ত্রিপুরা রাজাদের কোনও স্বীকৃত ভূমিকা নাই অথচ এই সমাজ রাজপরিবারভুক্ত। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাসভূমিতে রাজপরিবারভুক্ত মণিপুরী সমাজে সৃষ্ট দলাদলিতে বিশৃঙ্খলজনিত অশান্তির খবরে রিজেন্ট মাতা মহারাণী শ্রীমতী কাঞ্চনপ্রভা দেবী উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া শিলং-এর ত্রিপুর রাজভবন থেকে ১৩ই বৈশাখ ১৩৫৮ ত্রিং প্রচারিত বিবৃতিতে মণিপুরী সমাজে শান্তি বিধানের জন্য আবেদন করেন।

ত্রিপুরা ক্যাসেল, শিলং

১৩ই বৈশাখ ১৩৫৮ ত্রিপুরাব্দ

ত্রিপুরা রাজ্যস্থ মণিপুরী সম্প্রদায়ের প্রতি বর্তমান সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে যেরূপ বিশৃঙ্খল ও অশান্তি সৃষ্টি হইয়া জনসাধারণের ধন প্রাণ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহা বোধ করি সংবাদপত্র মারফতে আপনারা সকলে অবগত আছেন। এই যুগ সন্ধিক্ষণে আমাদের সকলের একতাবদ্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ কয়েক মাস যাবত আপনাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি হইয়া অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছে। আমার ইচ্ছা আপনারা সকলে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ভুলিয়া পুনরায় পূর্বের ন্যায় এক সমাজভুক্ত হইয়া স্বজাতীয় উন্নতি ও দেশের মঙ্গল বিধানের চেষ্টা করুন।

আমি আশা করি আমার এই সদিচ্ছা আপনারা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন।

ইতি

K. P. Debi

রিজেন্ট মহারাণী

ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের সঙ্গে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কুটুম্বিতার সূত্র ধরে রাজপ্রাসাদকে মণিপুরীদের যে সম্পর্কের শুরু তা পরবর্তীকালে সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য শাখা প্রশাখায় বিস্তার লাভ করে ফলে ফুলে শোণিত হইয়া উঠে। আস্তে আস্তে নানা কারণে মণিপুরীদের সামাজিক ব্যবস্থা নির্ণয় ও পরিচালন সূত্র নির্ধারণেও নিজেদের ভূমিকাকে প্রসারিত করেন। এইভাবে দেখা যায় মণিপুরীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে রাজপ্রাসাদের এক অতি নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। এবং তা যতদিন প্রাসাদ জীবন সক্রিয় ছিল ততদিন জীবন্ত ছিল।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ

নীলকান্ত সিংহ

উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরা। এখানে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে অন্যতম হল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী। এদের মাতৃভাষা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী। এই জনগোষ্ঠীর লোকেরা মূলতঃ হিন্দু ধর্মাবলম্বী। অন্য কোন ধর্মের প্রভাব এই সমাজে নেই। এই জনগোষ্ঠীর মুল বাসভূমি ছিল মণিপুর। আজ থেকে প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে এই জনগোষ্ঠীর মানুষ অসম, বাংলাদেশ হয়ে ত্রিপুরায় আসে। কৃষিকাজ

হল এদের প্রধান জীবিকা। সংগীত, নৃত্য এবং সংস্কৃতি মূলতঃ হিন্দু ধর্মের উপর নির্ভর করেই প্রতিষ্ঠিত। শান্তিপ্রিয়, সহজ সরল এবং অতিথি পরায়ণ এই জনগোষ্ঠী ত্রিপুরার এক ব্যতিক্রমধর্মী অন্য সমাজ।

বর্তমানে পশ্চিম ত্রিপুরা, ধলাই এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় এই জনগোষ্ঠীর বেশীরভাগ লোক বসবাস করছেন। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় খোয়াই, কল্যাণপুর, আগরতলা, লালসিংমুড়া, গোপীনগর এবং কলকলিয়ায় এই জনবসতি দেখা যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, কলকলিয়া অঞ্চলে বসবাসকারী বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা মণিপুর থেকে সরাসরি এই অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। ধলাই জেলায় কমলপুর, হালাহালি, চাপকাপ, আভাঙ্গা, জামথুম, দেবীছড়ায় এই জনগোষ্ঠীর লোক সুদীর্ঘকাল যাবৎ বসবাস করে আসছেন। এই জেলায় কমলপুরে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের অন্যতম ব্যক্তিত্ব বিমল সিংহ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ত্রিপুরার মন্ত্রীপরিষদে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে ছিলেন। উত্তর ত্রিপুরায় কৈলাসহরে, ডলুগাঁও, ফটিকরায়, কাঞ্চনবাড়ী এবং ধর্মনগরের রাজবাড়ী, পদ্মপুর, শনিছড়া, জয়নগর, ভাগ্যপুর এলাকায় দীর্ঘকাল যাবৎ এই সমাজের লোকেরা বসবাস করে আসছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বী হলেও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা চৈতন্যদেবের অনুসারী। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের গ্রামগুলিতে মন্দির এবং নাট মণ্ডপের উপস্থিতি লক্ষণীয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের পূজা পার্বণ ছাড়া অন্য কোন দেবদেবীর পূজা এই সমাজে দেখা যায় না। রাসলীলা, রাখোয়াল, হোলি, জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা, দুর্গাপূজা (বিশেষভাবে বাসন্তি পূজা) লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজা ছাড়াও চৈত্র সংক্রান্তির 'চৈরও', রথযাত্রার সময় দশদিন 'জয়দেব', 'খোপাখুসি' এবং লক্ষ্মী পূজার পর একমাস ব্যাপি 'লেরিকর নিয়ম' অর্থাৎ মহাভারত পাঠ উল্লেখ করার মতো সামাজিক অনুষ্ঠান। গ্রামে কোন কোন সময় 'ত্রিনাথ' অর্থাৎ মহাদেব পূজার সামান্য প্রচলনও আছে। এছাড়া দেখা যায় নিজস্ব গৃহ দেবতা 'আপকপা'র পূজা।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের সংস্কৃতি মূলতঃ ধর্মীয় বাতাবরণের উপর নির্ভরশীল। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ধর্মীয় সংগীতের মাধ্যমে আচার অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। সেজন্য প্রতিটি গ্রামে মন্দিরে পূজা পার্বণ সম্পাদনের জন্য ব্রাহ্মণ আবশ্যিক তেমনি সংগীতের জন্য 'ঈশালপা' এবং মৃদঙ্গ বাদনের জন্য 'ডাকুলা' আবশ্যিক। ধর্মীয় প্রভাব বেশী থাকার ফলে বাধ্যতামূলক সামাজিক অনুষ্ঠান মণ্ডপে পালন করাটাও সংস্কৃতির অঙ্গ। সামাজিক শৃঙ্খলা এই সমাজের প্রধান সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। রাধা-কৃষ্ণ, জগন্নাথ, চৈতন্যকেন্দ্রীক সংগীত নৃত্য সংস্কৃতির অপর উল্লেখযোগ্য দিক। রাসলীলা (বসন্ত এবং শারদ) এবং শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার উপর রচিত 'রাখোয়াল' বা রাখাল রাস উল্লেখ করার মতো এবং পৃথিবী বিখ্যাত। তাছাড়া আছে 'সাত সম্প্রদায়' মৃদঙ্গ বাদনের বিশেষ

নৃত্য 'পুংচেল' দেখার মতো নৃত্য।

এই জনগোষ্ঠীর লোকেদের প্রধান খাদ্য ভাত। 'পালটই', 'ইরলপা', 'ক্ষার', 'চামফুত' এবং 'চিনচু' নিজস্ব ঘরানার খাদ্য। মদ, মাংস এবং নেশাজাতীয় দ্রব্য খাওয়া বা পান করা এদের নিকট এক সামাজিক অপবাদ। এ সম্পর্কে সমাজে কঠোর নিয়ম প্রচলিত আছে। ছাগল, মোরগ, হাঁস গৃহে প্রতিপালন করাও নিষিদ্ধ।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজে মহিলা এবং পুরুষের অধিকার সমান সমান। কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা পুরুষদের চাইতে অধিক। বিয়ের সময় কন্যাকে যৌতুক প্রদানের নিয়ম থাকলেও বাধ্যতামূলক পণ নেওয়া সমাজে ঘৃণার চোখে দেখা হয়। শিক্ষিতের হার জাতীয় গড়ের চাইতে বেশী বললেও অত্যুক্তি হবে না।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের অর্থনীতি অন্যান্য সমাজের ন্যায় মূলতঃ কৃষি নির্ভর। এই জনগোষ্ঠীর মানুষের নিকট কৃষিভূমি এককালে যা ছিল বর্তমানে তার এক দশমাংশও নেই। ভূমি হস্তান্তর হতে হতে বর্তমানে প্রান্তিক চাষী এবং বর্গাচাষীর সংখ্যাই বেশী। আর সামান্য সংখ্যক আছেন সরকারী চাকুরে। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ব্যবসা বিমুখ এই জনগোষ্ঠীর অর্থনীতি খুবই দুর্বল।

রাজ প্রাসাদে মণিপুরী নৃত্যগীতের চর্চা

জিতেন্দ্রজিৎ সিংহ

ত্রিপুরার একটি অতি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী হচ্ছে মণিপুরীগণ। কিন্তু তাঁদের নাচগান এবং সংস্কৃতি চর্চার একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল এরাজ্যে মহারাজাদের সময়ে। ত্রিপুরায় বসবাসকারী মণিপুরীদের নৃত্যগীত চর্চা দু'ভাবে হতো। এক, রাজপ্রাসাদকে কেন্দ্র করে, আর দুই ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে মণিপুরী অধ্যুষিত স্থানগুলিতে নিজেদের মন্দির-মণ্ডপে, বিভিন্ন পালা-পার্বণে। মণিপুরী অধ্যুষিত স্থান হচ্ছে — আগরতলাকে বাদ দিলে, খোয়াই, কমলপুর, কৈলাশহর ও ধর্মনগর।

রাজপ্রাসাদ কেন্দ্রিক মণিপুরী নৃত্যগীত চর্চার শুরু হয় মহারাজ-মহারাণীদের উৎসাহে। সেই শুরুর শুরু ইতিহাসের কোন পথ বেয়ে আমরা আরম্ভ করতে পারি — মহারাজ ২য় রাজধর মাণিক্য (১৭৮৫-১৮০৪ খৃঃ) থেকে। মহারাজ রাজধর মাণিক্য ভাগ্যচন্দ্রের এক কন্যা 'মজাইবেমা' হরিশ্বেশ্বরীকে বিয়ে করেন ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের দিকে। ভাগ্যচন্দ্র (১৭৫৯-৬১, ১৭৬৩-১৭৯৮) মণিপুরের বিখ্যাত নৃপতি। তাঁর ঋষিকল্প জীবনের জন্য তাঁকে রাজর্ষি বলা হয়। রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র মণিপুরে ব্যাপকভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের

প্রচলন করেন — যার প্রভাব দুই শতাব্দী পরেও, আজও মণিপুরীদের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে বিরাজমান। বিখ্যাত মণিপুরী রাসনৃত্যের প্রবর্তক তিনি। এই রাসনৃত্যের শ্রীমদ্ভাগবত ভিত্তিক ভাবরূপ, বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলীদের ব্যপক ব্যবহার, পোষাক পরিকল্পনা, সবই তিনি করেছিলেন। রাসনৃত্য — মণিপুরী ক্লাসিকেল নৃত্যশৈলীর একটি প্রকাশ মাত্র। কিন্তু তবু মণিপুরী রাসনৃত্য কলাজগতে এত প্রভাবশালী এবং সুপরিচিত যে আজ অনেকের কাছে রাস ও মণিপুরী সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মণিপুরী নট-সংকীর্তনের স্রষ্টাও তিনি। সেই ভাগ্যচন্দ্র তীর্থযাত্রা পথে আগরতলায় এসে রাজধর মাণিক্যের নিকট কন্যাদান করেন, সঙ্গে রাধামাধবের বিগ্রহও রাজবাড়ীতে দিয়ে যান, হয়তো কন্যার নিত্যপূজার জন্য। মণিপুরের গোবিন্দজীকে উপলক্ষ করে রাসযাত্রার শুরু। গোবিন্দজী বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতাও ভাগ্যচন্দ্র। সেই গোবিন্দজীর মতই, আগরতলার শ্রী শ্রী রাধামাধব। সুতরাং এই রাধামাধবের বিগ্রহকে নিয়ে প্রতি বছর কার্তিক মাসে পূর্ণিমার রজনীতে রাস উৎসবের শুরু। মণিপুরের রাজকুমারীর সঙ্গে তাঁর কিছু সঙ্গী সাথীও আগরতলাতে রয়ে যান — পুরাতন আগরতলাতে। তাঁরাই সেই নৃত্যের কুশীলব — বাদক, গায়ক, গায়িকা, ও নর্তকী বৃন্দ। এ রাজ্যে রাজপ্রাসাদ কেন্দ্রিক মণিপুরী নৃত্যগীতের চর্চার আনুষ্ঠানিক শুরু সেই থেকেই। কথা প্রসঙ্গে বলা যায় হরিশ্বেরীর সঙ্গী -সাথীদের দিয়েই এরাজ্যে মণিপুরীদের বসবাসের শুরু। ব্যাপারটি অবশ্য বর্তমান আগরতলায় উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের ভিত্তিস্থাপনের (১৮৯৯ খৃঃ) প্রায় একশ বছর আগেকার কথা। সেই একশ বছরে রাজধানী পরিবর্তিত হয়েছে, নতুন হাবেলি বা বর্তমান আগরতলাতে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছে। রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়েছে।

মহারাজ রাজধর মাণিক্যের পরও আরও অনেক মহারাজ মণিপুরী কন্যাদের পাণি গ্রহণ করেছেন, বৈবাহিক সুত্রে, আত্মীয় কুটুম্ব হিসাবে আরও বহু মণিপুরী পরিবারের অভিবাসন হয়েছে নতুন শহর আগরতলায়। মহারাজ কাশীচন্দ্র মাণিক্য (১৮২৬-২৯ খৃঃ), কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য (১৮৩০-৪৯), ঈশানচন্দ্র মাণিক্য (১৮৫০-৬২), বীরচন্দ্র মাণিক্য (১৮৬২-৯৬) রাধাকিশোর মাণিক্য (১৮৯৬-১৯০৯), বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য (১৯০৯-১৯২৩), বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য (১৯২৩-১৯৪৭), এঁদের সকলেই এক বা একাধিক মণিপুরী কন্যা মহিষী অর্থাৎ রাজপত্নী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা রাজপ্রাসাদে, রাজঅন্তপুরে, মণিপুরী নৃত্যগীত, কলা ও সংস্কৃতি, বয়ন শিল্প, মণিপুরী ভাষা, এমনকি মণিপুরী খাদ্যাভ্যাস এবং রন্ধন প্রণালীও নিয়ে আসেন। বৈষ্ণব আরাধনার অঙ্গ হিসাবে তুলসীবৃক্ষের রোপন এবং রাজঅন্তঃপুরে রাধামাধব ও অন্যান্য দেব দেবীর বিগ্রহ স্থাপন করে, মন্দির নির্মাণ করে পূজা-অর্চনার ব্যবস্থাও তারা শুরু করেন। নাচ গান তাঁরা কম বেশী জানতেন, কারণ মণিপুরী জীবনযাত্রায় নাচগান কেবল আলাদা জিনিস নয়, আবার শুধু অবসর বিনোদনের জন্য চর্চার বিষয়ও নয়। নাচগান মণিপুরী আধ্যাত্মসাধনার, ভক্তি

সাধনার, জীবন চর্চার, বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের একটি আবশ্যক অঙ্গ। সুতরাং ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদে মণিপুরী নৃত্যগীত চর্চা চলেছে অনেক দিন। এই মহিষীগণ আবার নিজ নিজ পিতৃগৃহে — আগরতলার বিভিন্ন পাড়ায় নাটমণ্ডপ প্রতিষ্ঠা করেছেন, পুরোহিত নিয়োগ করেছেন, দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি ব্যবস্থা করেছেন। নাচ গানের মত মন্দির ও মণ্ডপ মণিপুরী সমাজ জীবনের একটি আবশ্যিক অঙ্গ। আর সেই মন্দির মণ্ডপে যে নৃত্যগীতের চর্চা হয়েছে তাকে অবলম্বন করে অনেক মণিপুরী গায়ক, বাদক, নর্তক, নর্তকী উঠে এসেছেন রাজপ্রাসাদে মণিপুরী সংগীত, নৃত্যের ওঝা বা গুরু হিসাবে।

ত্রিপুরার মহারাজগণ সংগীত; নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, ফটোগ্রাফী, ভাস্কর্য এবং সাহিত্যের রসবেত্তা, উৎসাহদাতা এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নিজেরাও এইসবের চর্চা করতেন, গান লিখতেন, কবিতা লিখতেন, সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অনায়াস বিজ্ঞতায় বিচরণ করতেন। অনেক পটুত্বের সঙ্গে গাইতেন, বাজাতেন। সুতরাং মণিপুরী নৃত্যগীত তাঁদের রসিক মনের স্পর্শে নব নব প্রকাশ ভঙ্গিমায় উদ্ভাষিত হয়ে উঠেছিল। কর্ণেল মহিমচন্দ্র তাঁর 'দেশীয় রাজ্য' বইয়ে ঝুলন স্মৃতি বর্ণনায় মহারাজ বীরচন্দ্র কিভাবে ঝুলন চর্চায় একরাত কাটিয়েছিলেন সে কথা লিখেছেন। সেদিন রাজা বীরচন্দ্র ও ভাবুক বীরচন্দ্র এক হয়ে গিয়েছিলেন। মহিমচন্দ্র লিখেছেন ঃ ভাদরের চাঁদের জ্যোৎস্না পুলকিত রাত্রিতে যে দুটি ঘটনা একসঙ্গে ঘটিতে পারে এ কথা পূর্বে মনে করি নাই। ভাবে গদ গদ ভাবুকের ভাব এবং রাজ্যের জন্য কঠোর কর্ত্তব্য পালন এই দুইটি বীরচন্দ্রের জীবনে অতি আশ্চর্যভাবে এক হইয়া গিয়াছিল।

রাজপ্রাসাদে ঝুলন উৎসব এবং বীরচন্দ্রের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে এই জন্য যে এই রাজ্যে মণিপুরী নৃত্যগীত চর্চায় বীরচন্দ্রের আমলে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত এক জায়গায় লিখেছেন ঃ

ত্রিপুরায় মহারাজ বীরচন্দ্রের সময় হতে বীরেন্দ্রকিশোরের যুগ পর্যন্ত সময়টাকে ত্রিপুরার মণিপুরী নৃত্যগীতাদি এবং সংস্কৃতি বিকাশের সুবর্ণ যুগ বলা চলে।

আর ঝুলন উৎসবের কথা প্রসঙ্গে বলা যায় ঝুলন রাস বলে মণিপুরী রাস নৃত্যের একটি প্রকরণ এখন চলছে, তার উৎপত্তি ত্রিপুরাতেই। এমনিতে মণিপুরী রাসনৃত্য ৪ প্রকারের — মহারাস যা কার্তিক পূর্ণিমায় হয়ে থাকে, কুঞ্জরাস যা আশ্বিনের পূর্ণিমায় হয়ে থাকে, বসন্ত রাস যা চৈত্র পূর্ণিমায় হয়ে থাকে। এগুলি রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র প্রচলন করে গিয়েছিলেন। আর নিত্যরাস যা পরবর্তীকালে প্রচলন করেছিলেন মণিপুরের মহারাজ চন্দ্রকীর্তি (১৮৩৪-১৮৪৪) কিন্তু এগুলি ছাড়াও ত্রিপুরাতে চলে ঝুলন রাস নামে আর একটি রাস। মহারাজ বীরচন্দ্রের সময়ও ঝুলন রাস রাজপ্রাসাদে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৭৫-৭৬ এর দিকে রাজবাড়ীতে অনুষ্ঠিত ঝুলন রাসের ফটো তার প্রমাণ।

রাধাকিশোর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা প্রবাসী মণিপুরের সিংহাসন চ্যুত রাজা দেবেন্দ্র সিংহের কন্যা রত্নমঞ্জরীকে বিয়ে করেন রাধা কিশোর (মণিপুরীদের কাছে রত্নমঞ্জুরী, ঢাকা লৈমা বা কামোক্‌লৈ নামে পরিচিতা)। এই বিয়ে হয় ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদে। কথিত আছে বিয়ের আগে শ্রী শ্রী রাধা মাধবের সম্মুখে রত্নমঞ্জরী রাস নৃত্যের প্রধান নৃত্যাঙ্গনা হিসাবে নৃত্য নিবেদন করেছিলেন। মহারাণী রত্নমঞ্জরী মহারাজ রাধাকিশোরের প্রধান মহিষী। আর এক মহিষী তুলসীবতী। তিনিও মণিপুরী কন্যা।

মহারাজ রাধা কিশোরের সময়ে রাজপ্রাসাদে মণিপুরী নৃত্যগীত, সংস্কৃতি চর্চা একটি বিধিবদ্ধ সরকারী ব্যবস্থার রূপ নেয়। এবং তা তদারকির জন্য নিযুক্ত হন একজন মন্ত্রী। সেই মন্ত্রী মহোদয়কে কার্যে অবহেলার (?) জন্য কিভাবে পদ থেকে 'অবসর' দেওয়া হয় তার নিদর্শন পাওয়া যাবে তৎকালীন এক রাজ আদেশে ঃ

শ্রী হরি

R. K. Deb Barman

মেমো নং ৬৩

জানা যায় বিগত দোল ও রাস যাত্রাদি উপলক্ষে রাজ সম্প্রদায়ের উপযুক্ত সংখ্যক যথারীতি উপস্থিত হইয়া কীর্তনাদি করে নাই এবং ঠেকা পক্ষে উক্ত সম্প্রদায়ের যে কয়েকজন কীর্তনে যোগ দিয়াছিল তাহারাও নানা প্রকার বাহেনা করিয়া কীর্তনের কার্য প্রচলিত প্রথানুসারে সম্পন্ন করিয়াছিলেন না। এতৎসম্বন্ধে বিহিত করার জন্য — এই সম্প্রদায়ের ভারপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত নরধ্বজ ঠাকুরকে লিখিত রূপে জানান হইয়াছে। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। প্রত্যুত উক্ত ঠাকুর কর্তৃক আজ পর্যন্ত এ বিষয়ের কোন প্রতিকার করাওপ্রকাশ পায় না। এমতাবস্থায় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের পরিবর্তন ও নিবর্তন ব্যতীত রাজ সম্প্রদায়ের কীর্তনাদি কার্য সুসম্পন্ন হওয়ার কারণ দেখা যায় না। অতএব শ্রীযুক্ত নরধ্বজ আদেশ ঠাকুরকে উল্লিখিত ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের হইতে পদ অবসর ক্রমে উক্ত ঠাকুরের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছিল তদ্রুপ ক্ষমতা অনুসারে উক্ত সম্প্রদায়ের কীর্তনাদি কার্য্যের পরিচালনার ভার অদ্য হইতে শ্রীযুক্ত যুগল কিশোর ও শ্রীযুক্ত রসমোহন ঠাকুরের প্রতি ন্যস্ত করা যায়। যাহাতে কীর্তনাদি যথারীতি সম্পন্ন হয় তৎপ্রতি উক্ত ঠাকুরদ্বয়ের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই আদেশের প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ নিকট প্রেরিত হয়। ইতি, সন ১৩০৭ ত্রিং ১৫ই আশ্বিন।

নরধ্বজ ঠাকুর ত্রিপুরার একজন মন্ত্রী ছিলেন। ঘটনাটি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের। এতে স্পষ্ট যে মণিপুরী নৃত্যগীতকে কিরকম নিষ্ঠার সঙ্গে মহারাজগণ গ্রহণ করেছিলেন। এখানে যে রাজসম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে মহারাজের 'নিংথেম

পালা’ নামের রাজকীয় কীর্তন সম্প্রদায়। মণিপুরীতে ‘নিংথেম’ কথাটি রাজকুল দ্যোতক। মণিপুরের মহারাজদের নিজস্ব কীর্তন সম্প্রদায় আছে যা ‘নিংথেম পালা’ নামে পরিচিত। ত্রিপুরাতেও সেইরকম নিংথেম পালা ছিল মহারাজাদের। এই নিংথেম পালার জন্য রাজসরকারের বাজেট বরাদ্দ ছিল। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের মহারাজ বীরবিক্রমের সময়ের বাজেটে দেখা যায় এই নিংথেম পালার কয়েকজন বাদক/ গায়কের নামে টাকার ব্যবস্থা ঃ

নিংথেম পালা

গোকুল চাঁদ সিংহ	১২ টাকা (বাদক)
রতন সিংহ	৫ টাকা (গায়ক)

লক্ষ্মী নারায়ণ সেবা আরতি ইত্যাদি

গোকুল সিংহ	৬ টাকা
রজনী সিংহ	৬ টাকা
তন্দন সিংহ	৬ টাকা

বীরেন্দ্র কিশোর ঃ এই নিংথেম পালা বা মণিপুরী কীর্তনের রাজসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল মহারাজ রাধাকিশোরের সময়ে। যুবরাজ বীরেন্দ্র কিশোর ও পিতার মত নিজস্ব কীর্তন দল গড়তে চাইলেন। তিনি বিধিবদ্ধভাবে মণিপুরী মৃদঙ্গ বাজাতে শিখেছিলেন। শোনা যায় মহারাজ রাধাকিশোর নাকি তাঁকে নিবৃত্ত করেছিলেন মণিপুরী কীর্তনের জন্য যে শিক্ষা দীক্ষা প্রথা প্রকরণ মানা দরকার তা শক্তি বীরেন্দ্র কিশোরের পক্ষে যথাযথ পালন সম্ভব নাও হতে পারে, অপরাধ হতে পারে এই বলে।

কিন্তু মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর মহাধূমেল কীর্তন করেছিলেন। মহাধূমেল হচ্ছে একটি বিশেষ প্রকারের নটসংকীর্তন। এখানে থাকে ১৪ জন মৃদঙ্গ বাদক (১৪ মাদল) আর ব্যবহৃত হয় ১৪টি ‘সঞ্চার’ তাল। সেই মহাধূমেল অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাধানগর মণ্ডপে। মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর চৌদ্দ মাদলের একজন মৃদঙ্গ বাদক ছিলেন। চৌদ্দ মাদলের ইতিহাস বলে, চৈতন্যদেব যখন দাক্ষিণাত্য থেকে পুরীতে এলেন তখন রথযাত্রা দর্শন ও তাঁকে দেখার জন্য বহু ভক্তের সমাগম হয়। এই ভক্ত সম্প্রদায় সাত ভাগে বিভক্ত হয়ে কীর্তন করেন। বৈষ্ণব মান্যতা অনুসারে তাদের বলা হয় সাত সম্প্রদায়। প্রতি সম্প্রদায়ে দু’জন করে মোট চৌদ্দজন বাদক। এঁরা বাজান চৌদ্দটি মৃদঙ্গ বা চৌদ্দটি মাদল। মহারাজ রাধাকিশোরের আমলেও মহাধুমেল অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে বীরেন্দ্র কিশোরের সেই মহাধুমেল যে সাড়া জাগিয়েছিল তার মতন নয়। কারণ বোধ হয় বীরেন্দ্র

কিশোরের মহাধুমেলে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা মণিপুরী নৃত্যগীতের জগতের বিখ্যাত সব ওঝা বা গুরু। ওঝা থাংকোকপা, ওঝা শম্বান তুবানবা, চাওবাহন মৈ চম্বা, ওঝা হাওবা, ওঝা যোগেন্দ্র, ময়েংবম পাতন, সারাংবম রতন, অহৈবম ফোব্রা, ওঝা শিবজয়, ঙাংবম ইবেতম্বী প্রভৃতি। এবং স্বখ্যা নিতাইপদস্না (জিতেন্দ্রজিৎ রাজকুমার)।

শেষোক্ত ওঝা নিতাইপদস্নার কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। তিনি মণিপুরের রাজবংশ জাত। জন্ম মণিপুরে। কিন্তু বিশেষ রাজনৈতিক কারণে তিনি মণিপুরের বাইরে বাইরেই — ডিব্রুগড়, শিবসাগর, জোড়হাট, শ্রীহট্ট, ঢাকা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে অনেক বছর কাটান, আগরতলাতেও থাকেন। ঐ সব অঞ্চলের বহু নৃত্য ও সংগীতে শিল্পী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। মণিপুরের রাজ্যপাট তিনি পাননি। কিন্তু মণিপুরী সংস্কৃতির জগতে তাঁর সময়ে একচ্ছত্রাধিপতি ছিলেন তিনি। ত্রিপুরার মণিপুরী নৃত্যগীতের জগতে তিনি নতুন হাওয়া বইয়ে দেন। তিনি এখানকার মণিপুরীদের বাংলার বিখ্যাত কীর্তন ঢং মনোহর শাহীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এখানে উল্লেখ্য মণিপুরী নট-সংকীর্তনে, রাসে যে সব গান ব্যবহার করা হয় তার অধিকাংশ বৈষ্ণব মহাজনগণ রচিত পদাবলী থেকে নেওয়া। বাংলা ও মণিপুরী সুরের মিশ্রণে কীর্তন একটি অপরূপ শোভা ধারণ করে। মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর তাঁর সঙ্গীত প্রতিভার জন্য তাঁকে একটি সুবর্ণ পদক প্রদান করেছিলেন। রাজকুমার কমলজিৎসিংহ তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর এবং নিতাইপদস্না, এই দুই শিল্পীর মিলন ত্রিপুরার মণিপুরী সংস্কৃতি এবং নৃত্য-গীতে নতুন রূপের সৃষ্টি করেছিল। বলা যায় মণিপুরী নৃত্যের প্রয়োগে নৃত্য-নাট্য-রূপের বিকাশ এভাবেই হয়েছিল।

এই নিতাইপদ স্না আগরতলায় যে শিষ্য সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন বা যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিল তাঁরা পরবর্তী কালে ত্রিপুরার বাইরে, ভারতের নানা স্থানে, যারমধ্যে শান্তিনিকেতনও পড়ে, মণিপুরী নৃত্যের প্রসার, প্রচারও জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর এক খ্যাতিমান শিষ্য হচ্ছেন পাঙমবম ঠাকুর নবকুমার সিংহ। ঠাকুর নবকুমার সিংহ শান্তিনিকেতন, বোম্বাই, দিল্লীতে বহুদিন খ্যাতির সঙ্গে নৃত্য-শিক্ষা দান করেছিলেন, রবীন্দ্র সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নৃত্য প্রদর্শন উপলক্ষে বিদেশ ভ্রমণও করেছিলেন।

মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরের সময় রাজ প্রাসাদে, রাজবাড়ীতে বহু নৃত্যগীতের আয়োজন হয়েছে। একবার হল নুপী করতাল অর্থাৎ মহিলাদের করতাল হাতে নৃত্য। মহারাজের কন্যাগণ এতে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে মৃদঙ্গ বাদকরা পরলেন টর্চের

বাম্বের মালা — মাথায়, পাগড়িতে৷ তাদের হাতের মধ্য দিয়ে ব্যাটারীর সংযোগ দেওয়া হল। মৃদঙ্গের বুলির সাথে সাথে জ্বলে জ্বলে উঠল বাতি৷ এই নৃত্য হয়েছিল আবার প্রতিযোগিতামূলক, মহারাজ এবং বড় মাতা মহারাণীর দলের মধ্যে। কোকিলপ্রিয় তাল। মহারাজ নিজে বাজাচ্ছেন মৃদঙ্গ, পেছনে জুড়ি রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত সিংহ। মহারাণীর দলে আছেন স্নাখ্যা নিতাই পাদম্না, পোঙন বম ঠাকুর নবকুমার সিংহ, তোজ্জম ঠাকুর কুমুদ বন্ধু সিংহ প্রভৃতি ওস্তাদগণ।

ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদে বসন্ত উৎসব বিখ্যাত। ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দের দিকের বসন্ত উৎসবের একটি রাজকীয় নিমন্ত্রণ পত্রে বলা হচ্ছে ঃ

রাজলাঞ্ছন

আগামী ৮/৯/১০/১১/১২ ই মাঘ তারিখে সংগীয় প্রোগ্রেম অনুসারে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে বসন্তোৎসব হইবে। তদুপলক্ষে আপনাকে নিমন্ত্রণ করা যাইতেছে ।

ইতি —
সন ১৩৩২ ত্রিং ২রা মাঘ
শ্রী ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা
কার্যাধ্যক্ষ

১। এতদুপলক্ষে পরিচ্ছদ বসন্ত রং-এর চিহ্ন ধারণ করা বাঞ্ছনীয়।

২। ১১ই মাঘ উদ্যান সম্মেলনে যোগদানকালে অনুগ্রহ পূর্বক এই কার্ড আনিবেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন ত্রিপুরায় আসেন প্রথমবার, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে (১৩০৬) তখন "কবির শুভাগমন উপলক্ষে শহরের উপকন্ঠস্থ পুরাণ কুঞ্জবনের শৈলশিখরে কবির সম্মানে বসন্তোৎসবের ও মণিপুরী নৃত্যাদির মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান আয়োজিত হইল" (দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা)। সেই অনুষ্ঠানের বর্ণনা সত্যরঞ্জন বসু এই গ্রন্থেই তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন (ত্রিপুরায় রবীন্দ্র স্মৃতি)ঃ

ত্রিপুরার আদিবাসীদের টংঘরের নমুনায় সম্বর্ধনা মঞ্চ তৈরী হইল। .... মঞ্চের উপর হইতে নজরে পড়ে চারিদিকে উচ্চ নীচ পাহাড়গুলি থরে থরে ঢেউ খেলিয়া দূর দিগন্তে মিলাইয়া গিয়াছে — আকাশের নীল চন্দ্রতাপ দিগন্তরেখাকে চুম্বন করিয়া ঋতু উৎসবকে আরও কমনীয় করিয়া তুলিয়াছে। এই প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনকে আরও সম্বর্ধিত করিয়াছে দলে দলে নৃত্যগীতরত মণিপুরী শিল্পীবৃন্দ। নগ্নগাত্র, পরিধানে বাসন্তী রং-এর কাপড়, লম্বমান বাসন্তী চাদর গলায়, মাথায় বাসন্তী রং-এর পাগড়ী, খোল, মন্দিরা করতালের সমতালে পদবিক্ষেপ ও দেহভঙ্গিমা - দীর্ঘলয়ে কীর্তনের সুর এক মোহময়

আবেশ রচনা করিতেছিল। দর্শক যাহারা তাহারাও স্ত্রী পুরুষ সেই বাসন্তী রং এর পরিচ্ছদে ভূষিত। এই পরিবেশের মধ্যে কবি ও রাজা মঞ্চোপরি ফরাস বিছানায় আসীন। কালোপযোগী নৃত্যগীত ও পুষ্প সজ্জার উপহার রাজা প্রজার সমব্যবহার — কবির মনকে এক অভুতপূর্ব আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া দিল।

এই প্রথম মণিপুরী নৃত্যের সুষমা রবীন্দ্রনাথকে মোহিত করে। পরবর্তীকালে হয়তো আরও কয়েকবার মণিপুরী নৃত্য দেখায় তা বৃদ্ধি পায়। এবং শান্তি নিকেতনে মণিপুরী নৃত্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য শান্তিনিকেতনে প্রথম নৃত্য শিক্ষক হিসাবে পাঠান রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত সিংহকে। মণিপুরী নৃত্যের জগৎজুড়ে প্রচার সেভাবেই শুরু হয়। পরবর্তীকালে আরও অনেক মণিপুরী নৃত্যগুরু পর পর শান্তিনিকেতনে গেছেন — পাঙনবম ঠাকুর নবকুমার সিংহ, রাজকুমার চন্দ্রজিৎ সিংহ, থোঙাম বসন্ত সিংহ, সিলেট থেকে নীলেশ্বর মুখার্জী প্রভৃতি ।

বীরবিক্রম ঃ

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ আগষ্ট মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর পরলোক গমন করেন, রাজত্ব লাভ করেন তাঁর পুত্র বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য। রাজসভা, রাজপ্রাসাদ, রাজবাড়ীতে মণিপুরী নৃত্যগীতের চর্চার ধারা বজায় থাকে। শুধু তাই নয়, রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণ ছড়িয়ে রাজ পরিবারের সদস্য, পরিজন ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। মণিপুরী কীর্তন রাজবাড়ীর মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানসমূহের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ বীরবিক্রম যখন রাজত্ব লাভ করেন তখন তাঁর বয়স ১৫ বৎসর মাত্র। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ২৯ জানুয়ারী বীরবিক্রমের শাস্ত্রীয় অভিষেক সম্পন্ন হয়। এই অভিষেক উৎসবের অনুষ্ঠান লিপিতে বলা হচ্ছে কিভাবে উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ থেকে অভিষেক শোভাযাত্রা মহারাজকে নিয়ে অভিষেক মণ্ডপে যাবে। (বর্তমান তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের উত্তর দিক সংলগ্ন ছাত্রীদের হোষ্টেল)

অনুষ্ঠান লিপির অংশবিশেষ ঃ

রাজলাঞ্ছন

His Highness The Maharaja Manikya Bahadur's
Abhishek Ceremony
29th Januaruy 1928-15th Magh 1337 T.E.
(Local Time To Observed)
9-30 A. M.
Departure from Ujjayanta Palace............
8-45 A. M.

His Highness The Maharaja Manikya Bahadur will perform the Jatra Ceremony of departure for the pandal at 8.45 A. M. The Pravu Goswamis will bless His Highness at the Jatra Mandap Gate

9 AM

2. His Highness will leave the Ujjayanta Palace for the Pandal at 9 A. M.
3. A salute of 13 guns will be fired as Highness gets into choudal.
4. The following procession will be formed in the order noted below :
   a) Ganesh Elephant - with kapi Dhavaja and Damama.
   b) Manipuri Kirtan
   c) Laxmi Narayan Debata etc.

সেই উপলক্ষে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে অনুষ্ঠিত হল মণিপুরী রাসনৃত্য দেশী-বিদেশী অতিথি ও দর্শকদের সামনে। মহারাজ বীরবিক্রম কিশোরের আমলে রাজপ্রাসাদের ভিতরে, রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে পশ্চিমে ও উত্তরে বহু নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হয়েছে। শোনা যায় রাজ-অন্দরে তিনটি স্টেজ বা মঞ্চ ছিল। এই মঞ্চগুলিতেও অনেক সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজ অন্তঃপুর চারিকাগণও তাতে অংশগ্রহণ করেছেন। ১৩৪৪ ত্রিপুরাব্দে (১৯২৪ খৃঃ) সেইভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'বিপ্রলব্ধা' মণিপুরী নৃত্যের মাধ্যমে। সেখানে গীত গানগুলির যে সংকলন পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল তার পরিচয় লিপিতে আছে

শ্রী শ্রীমতি বড় মহারাণী মহাদেবীর

উৎসাহে

প্রথম গায়িকা।

মহারাজ কুমারী শ্রীল শ্রীমতী ইলা দেবী প্রণীত

বিপ্রলব্ধা

রাজধানী আগরতলা।

সন ১৩৪৪ ত্রিপুরাব্দ

এই সব নৃত্য প্রতিযোগিতায় শুধু নৃত্যের পারদর্শিতা প্রদর্শনই নয়, সাজসজ্জা, পোষাক, বিভিন্ন যান্ত্রিক কৌশল ইত্যাদিরও ব্যবহার হয়েছে। একবার বীরবিক্রম নর্তকীদের হাতে দিলেন কাগজের তৈরী লাল পদ্ম, ভিতরে বসান হল টর্চ লাইট, যা নাচের সময় লাল আলো বিস্ফোরণ করত। বড় মাতা মহারাণী বোম্বাই থেকে রূপোর টপ তৈরী করিয়া আনলেন, যার ভিতরে টর্চের বাল্ব ঢুকিয়ে দেওয়া হল, ব্যাটারী সংযোগে তা জ্বলে জ্বলে উঠত, ছড়াত মুক্তার দ্যুতি।

ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করে মহারাজ বীরবিক্রম আগরতলায় ফিরে এলেন। সঙ্গে এলেন কয়েকজন 'সাহেব গাইড'। তা উপলক্ষ করে রাজপ্রাসাদে খবাক ঈশৈ-এর আয়োজন করলেন মহারাজ। মণিপুরী নর্তকগণ শুধু হাতেই সেই নর্তন শুরু করলেন। মাঝখানে কোমর বন্ধ (খ্‌বাংবেৎ) থেকে করতাল বেড়িয়ে এল হঠাৎ, করতাল নৃত্য, করতালের ঝনৎকারে, মৃদঙ্গের গুরুগম্ভীর 'মেঘ গর্জনের' মত আওয়াজে, এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের সূচনা হল। বিমূঢ় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন দর্শকগণ।

১৯৪৭ খৃঃ ১৭মে (২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ ত্রিং) মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য পরলোক গমন করলেন। তাঁর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে মণিপুরের মহারাজ বুধচন্দ্র সিংহ এলেন আগরতলায়। সঙ্গে এল তার 'নিথেম পালা' — বাছাই করা একদল নটসংকীর্তন গায়ক। মণিপুরের মহারাজগণ যখনই ত্রিপুরায় এসেছেন সঙ্গে এনেছেন নৃত্য ও সঙ্গীত শিল্পীদের দল। অনেকটা আজকালকার সংস্কৃতি বিনিময়ের মত । মহারাজ চূড়াচাঁদ (১৮৯১-১৯৪১) যখন প্রথমবারের মত ত্রিপুরায় আসেন (১৫ জানুয়ারী ১৯০৯ খৃঃ) মহারাজ রাধাকিশোরের সময়, সঙ্গে এনেছিলেন কীর্তনের দল, এবং মণিপুরের বিখ্যাত শগোল কাংজৈ (পোলো)থাংতা এবং মফ্‌নার (কুস্তি) দল। তৎকালীন খোস বাগান মাঠে হয়েছিল সেগুলির প্রদর্শনী। শ্রাদ্ধে মণিপুরী নট-সংকীর্তনের জন্য এক বিরাট প্যাণ্ডেল তৈরী হল উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের উত্তরদিকের খোলা প্রাঙ্গণে। হাজার হাজার দর্শক, শ্রোতা, 'ভাবক' সমাবেশ। মণিপুর থেকে আগত প্রবাদ প্রতিম গায়ক ওঝা নাতুম ধরলেন গান, মেঘমল্লার রাগে। প্রধান মৃদঙ্গ বাদক মণিপুরের আর এক বিখ্যাত মৃদঙ্গ বাদক ওঝা সমদেন। মণিপুরীদের ক্রিয়াকর্মে সাধারণতঃ অংশগ্রহণ করে ৯ জন বা ১১ জন 'পালা' বা গায়ক। সেদিন কীর্তন মণ্ডলীতে দাঁড়ালেন ৬৪ জন। মহারাজ বুধচন্দ্র নিজেও মৃদঙ্গ বাজালেন।

সেদিন নাকি নির্মল মেঘ মুক্ত আকাশে হঠাৎ মেঘের সঞ্চার এবং প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হয়। ঝড় আর বৃষ্টির দাপটে প্যাণ্ডেল ভেঙ্গেপড়ল। অনেক কষ্টে কীর্তনের ঘট রক্ষা করে, প্যালেসের ভিতরে তা স্থাপন করে কীর্তন শেষ করা হল যথাবিহিত ভাবে।

মেঘমল্লার জন্যই কিনা সেদিনকার অনেক দর্শককে বলতে শোনা গেছে।

মহারাজ বীরবিক্রম কিশোরের পর রাজপ্রাসাদে আস্তে আস্তে এই ধরনের উৎসব অনুষ্ঠান কমে যেতে থাকে। তবু মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরের প্রধান মহিষী বড়মাতা মহারাণী প্রভাবতী দেবী কিছুকাল এগুলি ধরে রাখেন। কালের প্রভাবে, উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে রাজপ্রাসাদে মণিপুরী নৃত্যগীতের চর্চা এখন ইতিহাস। শুধু অনেকের মনে অতীত দিনের সুখ স্মৃতি হয়ে আছে।

তবে রাজপ্রাসাদের এইসব নৃত্যগীতের চর্চা তার প্রভাব ফেলেছিল প্রাসাদের বাইরেও, শুধু মণিপুরীদের মধ্যে নয়, অন্যান্যদের মধ্যেও। রাজ-অন্তঃপুর এবং বাইরে, রাজকন্যা, রাজপুত্র, রাজার আত্মীয়স্বজন, অভিজাত পরিবারবর্গদের পুত্র, কন্যা, গৃহিণীদের মধ্যেও। তাই দেখি স্বামী বিজয়ানন্দের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে মণিপুরী রাসলীলার অনুষ্ঠান হচ্ছে ঈশানঠাকুরের বাড়িতে-৪ অগ্রহায়ণ ১৩৬৩ ত্রিং (১৯৫৩ খৃঃ)। পরিচালিকা মহারাজ কুমারী উজ্জ্বলা দেবী। নৃত্যশিল্পী কুমারী সর্বশ্রী রাজেশ্বরী দেবী (বিবি), ঝরনা দেবী, মণিকা দেবী (মুনু), প্রীতি দেবী(চুনু), সঞ্চিতা দেবী, শুক্লা দেবী, দেবিকা দেবী, মণিমালা দেবী, পদ্মিনী দেবী, কুহেলী দেবী, চন্দ্রমুখী দেবী — এঁরা কেউই মণিপুরী নন। মৃদঙ্গ বাদক রাজকুমার সুরেন্দ্রজিৎ সিংহ, রমন সিংহ। শ্রীরাম মঞ্চ সজ্জায় মহারাজ কুমার সহদেব বিক্রম কিশোর দেববর্মা বাহাদুর, শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীরাণা অনন্তজং বাহাদুর।

মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরের এক পুত্র মহারাজ কুমার হেমন্ত কিশোর দেববর্মা, যিনি একসময় মহকুমা শাসক ও অন্যান্য পদাধিকারী ছিলেন প্রথাসিদ্ধভাবে মণিপুরী মৃদঙ্গ বাদন শিখেন। খোয়াইতে তিনি 'গৌর ধুমেল' আয়োজন করেন, আর মণিপুরের প্রখ্যাত ওঝা যদুনাথ কৃত দ্বাদশ রাজমেন সংকলন করে, 'তাল, লয়, মাত্রা ও ছন্দ নির্দেশ পূর্বক যাহাতে নূতন শিক্ষার্থীগণ সহজেই দ্বাদশ রাজমেন আয়ত্ব করিতে পারেন এবং যাহাতে দ্বাদশ রাজমেনের আদর্শ অবিকৃত থাকে সেই উদ্দেশ্যে 'মৃদঙ্গ লহরী' নামে এক পুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন তাঁরই অন্যতম মৃদঙ্গাচার্য ধর্মনগর নিবাসী ফানজেবিম গোলাপ সিংহ। মণিপুরী মৃদঙ্গ শাস্ত্রে এই গ্রন্থ একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

রাজপ্রাসাদে নৃত্যগীত চর্চার প্রভাব আগরতলার মণিপুরী মণ্ডপগুলিতে যেসব নৃত্যানুষ্ঠান, সংগীতানুষ্ঠান হয়েছে তার উপরও পড়েছে।

তাছাড়া আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও অনেকে মণিপুরী নৃত্য শিখতে উৎসাহিত হয়েছেন মণিপুরী না হয়েও। উল্লেখ করা যায় ত্রিপুরার এক বিখ্যাত সন্তানের কথা যিনি রাজ আমলে আধুনিক ত্রিপুরার রূপকারদের মধ্যে একজন ছিলেন, সেই ঠাকুর

শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মার কথা, যিনি অন্তরঙ্গমহলে রেণু সাহেব নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী পদ্মাদেবী প্রাইভেট নাচ শিখতেন আগরতলার একজন প্রখ্যাত নৃত্য শিক্ষক রাজকুমার সুরেন্দ্রজিৎ সিংহের কাছে। ত্রিপুরার ইতিহাসে প্রাইভেট নাচ শেখার এটিই সম্ভবতঃ প্রথম উদাহরণ। বলা যায় এই মহিলা রাজপ্রাসাদে তৎকালীন নৃত্যগীতের আবহাওয়া থেকে মণিপুরী নৃত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদের সঙ্গে ত্রিপুরায় মণিপুরী নৃত্যগীতের চর্চার ইতিহাস জুড়লে সেই ইতিহাস শতবর্ষ পেরিয়ে গেছে। শতাব্দী অতিক্রান্ত সেই নৃত্যগীত যা অতীত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে নব নব সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন দিগন্তের সূচনা করতে পারত তা আজ এই রাজ্যে জরাগ্রস্ত, ম্রিয়মান। প্রায় লুপ্ত হওয়ার পথে। শুধু মণিপুরীদের সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে আবশ্যিক কর্তব্যের দায়ে দায়সারা জীবন কাটাচ্ছে। এই অবস্থা অবশ্য শুধু মণিপুরী নৃত্যের ক্ষেত্রেই নয়, ক্লাসিকেল নৃত্যগীত চর্চা, যার জন্য ত্রিপুরা একসময় বিশিষ্ট ছিল, আজ লুপ্ত হওয়ার মুখে। হয়তো এটা বিশ্বজনীন ব্যাপার। কিন্তু ছোট জায়গা ত্রিপুরায়, একটি ক্ষুদ্র অনুপস্থিতিও বিরাট শূন্যতার বোধ জাগায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

এই প্রবন্ধ রচনায় আমি বইপত্রের সাহায্য তো পেয়েছিই, যার তালিকা নীচে দেওয়া হল, কিন্তু এমন অনেক ঘটনা আছে, বিষয় আছে যার নিদর্শন পুঁথিপত্রে এখনও লেখা হয়নি। সেগুলি বেঁচে আছে শুধু কিছুজনের স্মৃতিতে। সেরকম অনেক সময় উদ্ধারে আমাকে সাহায্য করেছেন মহারাজ কুমার সহদেব বিক্রম কিশোর দেববর্মা এবং রাজকুমার কমলজিৎ সিংহ।

বইপত্র ঃ

১। দেশীয় রাজ্য, স্বর্গীয় কর্ণেল মহিম চন্দ্র ঠাকুর (দেববর্মা), ত্রিপুরা ষ্টেট ট্রাইবেল কালচারেল ইনষ্টিটিউট এণ্ড মিউজিয়াম। ত্রিপুরা সরকারের সংরক্ষণ, আগরতলা, ১৯৬৬ ইং।

২। রাজকুমার কমলজিৎ সিংহ সম্পাদিত 'মরূপ' পত্রিকার বার্ষিক শারদ সংকলন, 'শরৎ কী ঈচেল' ১৯৭৭, ১৯৭৯, ১৯৮০ খৃঃ, মরূপ কার্যালয়, আগরতলা (মণিপুরী ভাষায়)।

৩। রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা ১৩৬৮, ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী সমিতি, আগরতলা, ১৯৮৭ খৃঃ।

৪। ত্রিপুরার ইতিহাস, ডঃ জগদীশ গণচৌধুরী, ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতি,

আগরতলা, ত্রিপুরা, ২০০০ খৃঃ।

৫। Manipuri Performing Arts.: A Vaishnavite Approach, E. Nilkanta Singh, article in Manipur Past and Present vol. II, New Delhi.

৬। বিপ্রলব্ধা, মহারাজ কুমারী শ্রীল শ্রীমতী ইলা দেবী, আগরতলা ১৩৪৪ ত্রিং।

৭। সুরের ঝর্না তলে ত্রিপুরা, দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত 'ত্রিপুরা প্রসঙ্গ' পুস্তকে প্রকাশিত প্রবন্ধ, জন সংযোগ ও পর্যটন অধিকার, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা ১৯৭৫।

৮। মৃদঙ্গ লহরী — দ্বাদশ রাজমেন, শ্রীল শ্রীযুতহেমন্তকিশোর দেববর্মন, আগরতলা, ১৩৫২ ত্রিং।

ত্রিপুরার মন্দির শৈলী

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী

কোন স্থানের গৃহ নির্মাণ- শৈলী সে স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান, উদ্ভিজ্জ সংস্থান ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। উত্তর-পূর্ব ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম, মেঘালয়, আসাম প্রভৃতি বৃষ্টিবহুল অঞ্চলের অরণ্যে প্রচুর পরিমাণে ছন, বাঁশ, বেত, কাঠ প্রভৃতি জন্মে। স্বাভাবিকভাবেই এই অঞ্চলের জনসাধারণ এসব বনজবস্তু গৃহ নির্মাণে ব্যবহার করে। প্রচুর বারিপাতের জন্য ঘরের ছাদগুলি সমতল না করে তীর্যকভাবে তৈরী করা হয় যাতে খুব দ্রুত বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়তে পারে। ঘরের ছাদ ঘরের চারকোণে পোতা চারটি খুঁটির উপর থাকে। খুঁটিগুলিকে স্থানীয় ভাষায় 'পালা' বলে। চারটি পালার মাথায় দুই জোড়া বাঁশ পারস্পরিক সমান্তরালভাবে 'বেত' দিয়ে বাঁধা থাকে । এই সমান্তরাল বাঁশগুলিকে 'পাইর' বলে। পাইরের সঙ্গে মুলী বাঁশের তৈরী চালার কাঠামো বেত দিয়ে বাঁধা থাকে । চালার কাঠামো ছন দিয়ে ঢাকা হয়। রকম ভেদ অনুসারে চালাগুলি দু-চালা, চৌচালা বা আটচালা নামে অভিহিত হয়। দুই বা চার চারটি চালা তীর্যকভাবে পাইরের ভিত্তির উপর বসানো হয়। ঘর বিশেষে পালার সংখ্যা বেড়ে যায়। সাধারণতঃ শাল, জারুল জাতীয় শক্ত কাঠ দিয়ে পালা তৈরী করা হয়। ঘরের দেয়ালগুলিকে 'বেড়া' বলে। মুলী বাঁশ ছেঁচে তলতা বা "তরজা" তৈরী করা হয়। তরজাগুলি পাশাপাশি সাজিয়ে বা আড়াআড়ি বুনে বেড়া তৈরী করা হয়। বুননের জন্য বিভিন্ন প্রকার ডিজাইন ব্যবহার করা হয়। যেমন- 'দুধারা', 'তেধারা' বাইন। 'বাইন' হল বুননের কথ্যরূপ। বেড়াগুলি 'পালার' সঙ্গে 'বেত' দিয়ে বাঁধা থাকে । বেড়াগুলিকে মজবুত করার জন্য প্রায় সমান দূরত্বে বেড়ার দুইপাশে বাঁশের টুকরা দিয়ে বাঁধা হয়। এই সমদূরত্বে অবস্থিত বাঁশের টুকরাগুলিকে বলে 'খাপ'। 'খাপ' বেড়ার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং বেড়াগুলিকে শক্ত ও মজবুত করে। ঘরের মেঝে মাটি দিয়ে তৈরী। মেঝেকে বলে 'ভিটি'। সমতল অঞ্চলে সব ঘর বাড়ী 'ভিটির' উপর তৈরী করা হয়। কেবলমাত্র পাহাড় অঞ্চলে আদিবাসীরা ভিটির পরিবর্তে টংঘর মাচার উপর তৈরী করেন।

এই গৃহনির্মাণ-শৈলী সমতল পূর্ববঙ্গ, আসাম, মিজোরাম, মেঘালয় প্রভৃতি রাজ্যে অনুসরণ করা হয়। ধনী গরীব নির্বিশেষে সকলেই উক্ত কাঁচামাল গৃহ নির্মাণে ব্যবহার করেন। এই অঞ্চল ভূমিকম্প প্রধান বলে গৃহ নির্মাণে ইটের ব্যবহার কিছুকাল আগেও তেমন বেশী প্রচলিত ছিল না। ধনীর গৃহের সঙ্গে গরীবের গৃহের পার্থক্য হল ঘরের সংখ্যা আর ঘর তৈরীতে বাঁশ, ছন প্রভৃতি উপাদানের শিল্পরুচিসম্মত ব্যবহারে। ত্রিপুরার

রাজাদের অন্দরমহলের বাড়ীও বাঁশ-ছনে তৈরী ছিল বলে ত্রিপুরা বুরঞ্জীর সাক্ষ্যে জানা যায়। মন্দির শৈলী আলোচনা কালে বাঁশ ছনের তৈরী গৃহ নির্মাণ পদ্ধতির আলোচনা আপাতঃ দৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও পরবর্তী আলোচনাতে দেখা যাবে যে ত্রিপুরার মন্দিরগুলি ত্রিপুরার গৃহনির্মাণ-শৈলীরই একটু উন্নত সংস্করণ। গৃহ নির্মাণ বিষয়ক কথ্য পরিভাষা (term) মন্দিরশৈলীতেও ব্যবহৃত হবে।

সমতল বঙ্গদেশেও মন্দির নির্মাণ-শৈলীতে বাঁশ বেতের কাজ প্রাধান্য পেয়েছিল সম্ভবতঃ পাথরের অভাবে। পরবর্তীকালে পাথরের অভাব পাতলা ইট দিয়ে মেটান হয়।[২০] চালার মত করে তৈরী মন্দির বঙ্গীয় রীতি বলে পরিচিতি লাভ করে। মুসলমান আমলে এই রীতির সঙ্গে দিল্লী ঘরানা যুক্ত হয়ে একটি বিশেষ স্থাপত্যধারা বিকাশ লাভ করে, কারণ চালার দ্রুত জল নিষ্কাশনের ক্ষমতা সবাই উপলব্ধি করে। এর ফলে প্রায় সমস্ত মন্দিরে এই রীতি অনুসরণ করা হয়। [২১] দো-চালা বা এক-চালা পদ্ধতি সাধারণ লোকদের বাসগৃহ নির্মাণ পদ্ধতি থেকে উদ্ভুত হয়েছে। এক বাংলার ছাদও বাঁকানো। দুইটি দোচালা পাশাপাশি স্থাপন করলে " জোড় বাংলা" নামে অভিহিত করা হত। এক বাংলা এখন আর দেখা যায় না। কিন্তু বঙ্গীয় রীতি অর্থাৎ ঈষৎ বাঁকান ছাদ পরবর্তী মোগল স্থাপত্য রীতিতে বিশেষ করে দিল্লী, গুজরাট ও রাজস্থানের মন্দির শৈলীতে বিশেষ প্রভাব ফেলে। ত্রিপুরাতে বাংলা ধরনের মন্দির দেখা যায় না।

চালা ধরনের মধ্যে চারচালা বাড়ী এখন বঙ্গদেশে দেখা যায়। আসাম, ত্রিপুরা, উড়িষ্যাতেও এই পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। ছাদের গোলাকার চালাকৃতি ধরণ দেখে চারচালা মন্দির চেনা যায় — "Curved cornice is one of the distinctive characteristics of the Muslim building in Bengal, and this form may originally be traced to construction in bamboos or timber, a popular building medium in Bengal from the earliest days. The hut shaped super structure over the roof and in juxtaposition with the semicircular dome, is also characteristically Bengali."[২২]

এখন যদিও চারচালা ধরণ বঙ্গদেশে অপ্রচলিত তবু বেশ কয়েকটি চূড়া বা রত্নসহ মন্দির রয়েছে। এই চূড়া বা রত্নগুলি বিভিন্ন ধরণের, যেমন সাধারণ অষ্টকোণী বা ষড়কোণী। চারচালার পালাগুলি অলংকৃত করার জন্য ছাদের কোণে, ছাদের উপরিভাগে চূড়ার আবির্ভাব ঘটে। রত্নমন্দির চারচালার উন্নত সংস্করণ। ক্ষেত্র বিশেষে পঞ্চরত্ন, নবরত্ন ইত্যাদি তৈরী করা হয়েছে। কুমিল্লাতে অবস্থিত সতের রত্নমন্দির উল্লেখযোগ্য। এই সতের রতন তৈরী করান কৃষ্ণমাণিক্য ১৭০০ শকাব্দে। এক্ষেত্রে বঙ্গীয় রীতি ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে চারচালা ধরনের উপর স্তূপ তৈরী

একটি বিশিষ্ট ঘারানার সৃষ্টি করেছে। ত্রিপুরার একটি মন্দির বিশেষ করে, ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির বিশ্লেষণ করলে আমরা উপরিউক্ত ধারণার পরিষ্কার রূপ পাই।

ত্রিপুরার মন্দিরগুলি অধিকাংশই ইট, চুণ, বালির আস্তরে তৈরী। পাথরের ব্যবহার একমাত্র তথাকথিত জগন্নাথের দোল ভিন্ন অন্য কোন মন্দিরে বিশেষভাবে দেখা যায় না। সম্ভবতঃ পাথর এখানে পাওয়া যেত না এবং অন্য দূরবর্তী স্থান হতে পাথর আনা ও রাস্তার দুর্গমতার জন্য ব্যয়বহুল ছিল। রাজনৈতিক অধিকারের কথা বিবেচনা না করলেও অন্য রাষ্ট্র থেকে পাথর আনার ব্যয়বহুলতা বিবেচনা যোগ্য। মন্দির নির্মাণে ব্যবহৃত ইটগুলি খুবই পাতলা। উচ্চতায় ইটগুলি ১ ১/২"-২" ইঞ্চির বেশী নয়। আলোচ্য সকল মন্দিরেই ঐরকম উচ্চতার ইটের ব্যবহার করা হয়েছে।

মন্দিরের ভিত্তিভূমি ঃ প্রায় সব মন্দিরই একটি আয়তাকার বা ক্ষেত্র বিশেষে বর্গাকার ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভিত্তিভূমি মাটির সমতল থেকে ক্ষেত্র বিশেষে ৩' থেকে ৪' ফুট উঁচু। এই ভিত্তিভূমি প্রকৃতপক্ষে ঘরের "ভিটি"। মন্দিরের পাশে এই ভিটির মধ্যে ৩'-৪' ফুট পরিসর রয়েছে মন্দির প্রদক্ষিণ করার জন্য। মন্দিরে উঠবার জন্য ভিত্তিভূমি (ভিটি) সিঁড়ি দিয়ে ভূমির সমতলের সঙ্গে যুক্ত। কোন কোন মন্দিরের ভিত্তিভূমি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।

মন্দিরের দেয়াল ঃ মন্দিরের দেয়ালের দিকে তাকালেই সাধারণ বসতঘরের "বেড়া" চোখের সামনে ভেসে উঠে। মন্দিরের চারকোণে রয়েছে চারটি "পালা"। সাধারণ ঘরে পালাগুলি দেয়ালের বা বেড়ার ভেতরে থাকে বলে বাইরে থেকে দেখা যায় না, কিন্তু মন্দিরে 'পালা'গুলির উপরই বসান হয়েছে ছাদ। দুই 'পালা' স্তম্ভের মধ্যবর্তী দেয়াল 'বেড়ার' মত করে ইট দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। 'পালা'গুলির মাথায় বসান আছে ইটের তৈরী কলসী। দেয়ালে 'বেড়ার' মত সমান দূরত্বে 'খাপ' বসান আছে। ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের প্রতি দেয়ালে রয়েছে ৬টি করে 'খাপ'। সাধারণ বাসগৃহে 'খাপগুলি' কেবলমাত্র 'বেড়ার' অলংকরণই নয়, 'বেড়া'কে মজবুতকরার কাজও করে, কিন্তু মন্দিরের ক্ষেত্রে এগুলি শুধুমাত্র অলংকরণ বলে মনে হয়। উপরে শেষখাপ ও নাটমন্দিরের ছাদ একই সমান্তরালে অবস্থিত। শেষখাপের উপরিভাগে দুই পালা স্তম্ভের ভেতরের দেয়াল চাঁদাকৃতি মসৃণ। চাঁদের উপরে তিনটি ধনুকাকৃতি বলয়। উপরের বলয়ের উপর এসে মিশেছে ক্রমশঃ ঢালু চালাকৃতি ছাদ। ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরে এসব কাজ বা বৈশিষ্ট্যগুলি এখনও ভালভাবে বিদ্যমান। অন্যান্য মন্দিরে অযত্ন বা পরিত্যক্ততার জন্য এসব কারুকাজ নষ্ট হয়ে গেছে।

চালা ঃ চারটি চালা উপর থেকে ক্রমশঃ ঢালু হয়ে চারটি 'পালা' স্তম্ভের উপর কৌণিক

ভাবে জুড়ে দেয়া হয়েছে। চারচালার সংযোগস্থল মন্দিরের কেন্দস্থলে গড়া হয়েছে স্তূপাকৃতি গম্বুজ। চালাগুলি বেশ পুরু আস্তরের আবরণে তৈরী। বর্ষার জল যাতে দ্রুত গড়িয়ে পড়তে পারে এবং চালাতে যাতে খুব দ্রুত আগাছা গজিয়ে উঠতে না পারে সেজন্য চালাগুলি ক্রমশঃ ঢালু করে তৈরী করা হয়েছে।

শীর্ষস্তূপ ঃ চারচালার সংযোগস্থলে দুইটি বলয়ের উপর স্তূপাকৃতি গম্বুজ (আমলক) অবস্থিত। বলয়ের উপরিভাগে প্রস্ফুটিত পদ্ম পাপড়ি আকৃতির ইট দ্বারা অলংকৃত। আমলকটি উল্টানো লাটিমের মত ক্রমশঃ সরু হয়েছে উপরের দিকে এবং মিশেছে একটি বৃত্তের সঙ্গে। এই বৃত্তের উপর রয়েছে শীর্ষস্তূপের ভিত্তি গোলক। ভিত্তি গোলক থেকে শীর্ষস্তূপ সরু থেকে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে মোটা হয়েছে। ঠিক মাঝখানে সবচেয়ে বেশী মোটা অর্থাৎ শীর্ষস্তূপের মধ্যভাগের পরিধি সবচেয়ে বেশী। মধ্যভাগ আবার পরিধি কমতে কমতে ক্রমশ সরু হয়ে স্তূপটি ভিত্তি গোলকের সম আকারের একটি বৃত্তে এসে মিশেছে। এই বৃত্তটি একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম। স্তুপটি কমলালেবুর কোয়ার মত ডিজাইন করা।

ধ্বজদণ্ড ঃ এই প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর রয়েছে পর পর সাতটি কলসী। ধ্বজদণ্ড এই কলসীগুলি দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। ধ্বজদণ্ডের উপরে শোভমান পিতলের তৈরী ধ্বজা। দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ৭৫ ফুট। বহু দূর সমতলভূমি থেকে মন্দিরের চূড়া দেখা যায়।

গর্ভগৃহ ঃ সাধারনতঃ মন্দিরগুলির দেয়াল খুব পুরু। সেজন্য ভেতরে গর্ভগৃহের পরিসর অপেক্ষাকৃত কম। ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের বাইরের পরিমাপ ২৪'×২৪', দেয়ালগুলি ৮' ফুট পুরু, ফলে গর্ভগৃহের পরিসর মাত্র ১৬'×১৬' বর্গফুট। মন্দিরের বাইরের আকার আয়তাকার বা বর্গাকার হলেও কোন কোন মন্দিরের গর্ভগৃহের আকার গোলাকার। গর্ভগৃহে রয়েছে একটি বেদী। অধিকাংশ মন্দিরের বেদীতে কোন বিগ্রহ নেই। উল্লিখিত সব মন্দিরের দরজা একটি, কিন্তু ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে দুইটি দরজা রয়েছে।

নাটমন্দির (জগমোহন) ঃ কোন কোন মন্দিরের সামনে নাটমন্দির রয়েছে। কোথায়ও বা নাটমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ত্রিপুরাসুন্দরী ও ত্রিপুরেশ শিবের মন্দিরের নাটমন্দির এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে। গোপীনাথ মন্দিরের সামনে বৃহৎ নাটমন্দির রয়েছে, কিন্তু নাটমন্দিরের ছাদ নষ্ট হয়ে গেছে। এই নাটমন্দির সম্ভবতঃ উড়িষ্যার জগমোহনের অনুরূপ। ত্রিপুরার রাজাগণ জগন্নাথ দর্শন উপলক্ষে এবং জগন্নাথ আনয়ন উপলক্ষে পুরীধামে গিয়েছিলেন।

তোরণ ঃ কোন কোন মন্দিরের সামনে তোরণ দেখা যায়। তোরণ দো-চালা পদ্ধতিতে

তৈরী। হরিমন্দির, গুণবতীমন্দিরগুচ্ছের একটি মন্দির ও রামমাণিক্যের বিষ্ণুমন্দিরে তোরণ দেখা যায়। হরিমন্দিরের তোরণ নাটমন্দিরেরবাইরে। দুই তিনটি সিঁড়ি বেয়ে প্রথমই তোরণ, তারপরে নাটমন্দির ও মন্দির। গুণবতী মন্দিরগুচ্ছের মন্দিরে ও রামমাণিক্যের বিষ্ণুমন্দিরে তোরণ মন্দিরের দরজার সঙ্গেই যুক্ত।

এই স্তূপশীর্ষ চারচালা মন্দির ত্রিপুরার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, ভারতে আর কোথায়ও এরূপ মন্দির দেখা যায় না। এই জন্য এই মন্দির নির্মাণ শৈলীকে ত্রিপুর-শৈলী বলে অভিহিত করা যেতে পারে। চালার উপরে স্তূপ ব্রহ্মদেশীয় বুদ্ধমন্দিরের কথা মনে করিয়ে দেয়। অদ্রীশ ব্যানার্জীর মতে স্তূপশীর্ষ চারচালা শৈলী হচ্ছে মন্দির স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রেমময় মিলন-ভূমি।[২৩] কিন্তু ত্রিপুরার-শৈলী কেবলমাত্র হিন্দু ও বৌদ্ধদেরই একসূত্রে গাঁথেনি বরঞ্চ মন্দিরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য মুসলমান স্থাপত্যরীতিও আত্মস্থ করেছে। ত্রিপুরার মন্দিরসমূহের দেয়াল সংযুক্তকারী কোণের 'পালা' স্তম্ভগুলি মুসলিম রীতির সংমিশ্রণে এক বিশিষ্ট শৈলীর উদ্ভব হয়েছে। এই বিশিষ্ট শৈলীই ত্রিপুর-শৈলী। স্থাপত্যরীতির ক্ষেত্রে এরূপ ধর্মীয় সহাবস্থান ত্রিপুরার রাজাদের বিশেষ অবদান। ত্রিপুর-রাজাগণ নিজেরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুসরণকারী হয়েও এরূপ ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মধ্যযুগীয় শাসকদের পক্ষে এটি বিরল ঘটনা। অবশ্য অন্যান্য দলিল-দস্তাবেজ, যেমন তাম্রশাসন, দানপত্র ইত্যাদি পরীক্ষা করলেও তাঁদের এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই। এই জন্যই ত্রিপুরার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে মন্দিরগুলি সাক্ষ্য হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

লেখক পরিচিতি ঃ দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাতত্ব বিষয়ে নিষ্ঠাবান গবেষক। তিনি ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তী কালে প্রাচীন ত্রিপুরার ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা করে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। তাছাড়া ত্রিপুরার বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তক প্রণয়ন করে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক প্রয়াত নিশীথ রঞ্জন রায়ের সান্নিধ্যে এসেছেন। শ্রীগোস্বামী বিগত ৩০ বছর যাবৎ ত্রিপুরার ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেও বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে যাচ্ছেন। শ্রীগোস্বামী আগরতলা বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে বহু বছর চাকরী করে সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেছেন।

রবীন্দ্র পরিমণ্ডলে ত্রিপুরার সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্মেষণ

কবিগুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁর বিশ্বগ্রাসী সৃজনী প্রতিভা এবং বিশ্বমোহন ব্যক্তিত্ব ও রূপগরিমায় সমগ্র জগৎবাসীকে মোহগ্রস্ত, নন্দিত, আলোকিত, আমোদিত এবং ধন্য করেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মনীষার প্রকাশ বিশ্বময়। তাঁর এই প্রকাশলীলাকে আচার্য সুনীতি কুমার অনবদ্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন — "সূর্যের মতই তিনি যেখানেই প্রকাশিত হইয়াছিলেন সেখানেই তাঁহার জ্যোতির্ময় স্বরূপের কিছু না কিছু রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার পূর্ণ সংগ্রহ ও সংগ্রথন দুঃসাধ্য, হয়তো বা অসাধ্য। রবীন্দ্রনাথ অন্য নানা দেশ ও স্থানের মত ত্রিপুরাতেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ত্রিপুরার সঙ্গে বিশেষ করিয়া ত্রিপুরার রাজবংশের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধের কথা আমরা কতটুকুই বা জানি ?"[১]

আচার্য সুনীতি কুমার যথার্থই বলেছেন ত্রিপুরার গুণজ্ঞ রাজা ও রাজবংশীয়দের সঙ্গে কবিগুরুর যে সুগভীর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং সেই সম্পর্কের সুবাদে যে উঁচুমানের পত্র সাহিত্য জগতের উন্মেষ ঘটেছিল তা রবীন্দ্র পরিমণ্ডলের সুধী পাঠক পাঠিকাবৃন্দের গুণগোচরে আজো উন্মোচিত নয় বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কৈশোর কাল থেকে ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে পরিচিত হন — সে পরিচিতির সূচনা ঘটে একটা ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের পত্নী মহিষী ভানুমতি মহাদেবী[২] প্রয়াত হয়েছেন — স্বভাবতই ভাবপ্রবণ বৈষ্ণব কবি মহারাজার মানসিক জগৎ তখন প্রিয়তম পত্নী বিরহ সাগরে নিমগ্ন — এমনি বিরহ-অনল-দগ্ধ মুহূর্তে বালককবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যগ্রন্থ বীরচন্দ্র মাণিক্যের হাতে এসে পৌঁছয়। ভগ্ন হৃদয়ের বিষাদমাখা সুর রাজার বেদনভরা হৃদয়ের সুরের সঙ্গে যুগলবন্দীরূপে আত্মপ্রকাশ করল। বিরহ অনলে দগ্ধ হৃদয়ে সান্ত্বনার বারি সিঞ্চিত হল। বৈষ্ণব কবি রাজার হৃদয় শান্ত হলো — 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যকার রবি কবির প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতার ভাষা খুঁজে পেলেননা। তাই বালক কবিকে অভিনন্দিত করার মানসে তাঁর একান্ত সচিব বৈষ্ণব সাহিত্য রসবেত্তা রাধারমন ঘোষকে দূতরূপে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে কবির সকাশে প্রেরণ করেন। তিনি কবিকে শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে স্বীকৃতি দিতে চান। এতে বালক কবি অভিভূত — এহেন ব্রাহ্ম মুহূর্ত কবির কাছে এসে ধরা দেবে — এ যেন দৈব ব্যাপার বলে ঠেকল কবির কাছে।

১। **রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী স্মরণগ্রন্থ 'রবীন্দ্র ও ত্রিপুরা' (ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক প্রকাশিত) গ্রন্থে লিখিত ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত।**

২। **ত্রিপুরা রাজাদের প্রধান মহিষীদের দেবীর পরিবর্তে মহাদেবী সম্বোধন বা লেখার প্রচলন রাজকুলাচারে অন্তর্ভুক্ত।**

সেই ব্রাহ্ম মুহূর্তের স্মৃতিচারণায় পরিণত বয়সে কবি বলেছিলেন ঃ "এই ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে আমার যে প্রথম পরিচয়, তা খুব অল্প বয়সে। সদ্য England থেকে ফিরে এসেছি; তখন একখানি মাত্র কাব্য প্রকাশিত হয়েছে। বাল্যের রচনা, অসম্পূর্ণতা ইত্যাদি অনেক ত্রুটি থাকায়, পুনঃ প্রকাশিত হয় নাই। সেই সময়ে আমাকে এবং আমার লেখা সম্বন্ধে খুব অল্প লোকেই জানতেন। আমার পরিচয় তখন কেবল আমার আত্মীয়স্বজন নিকটতম বন্ধুজনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। একদিন, এই সময়ে ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের দূত আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। বালক আমি, সসঙ্কোচে আমি তাঁকে অভ্যর্থনা করলাম। আপনারা হয়ত অনেকেই দূত মহাশয়ের নাম জানেন — তিনি রাধারমণ ঘোষ। মহারাজ তাঁকে সুদূর ত্রিপুরা হতে বিশেষভাবে পাঠিয়েছিলেন কেবল জানাতে যে, আমাকে তিনি কবিরূপে অভিনন্দিত করতে ইচ্ছা করেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বালক কবির বিস্ময়ের সীমা রহিল না।"[৩]

কবিদূত কর্তৃক সম্বর্ধিত হবার পর থেকেই বালক কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যৌবন উত্তীর্ণ মহারাজ বীরচন্দ্রের (তখন মহারাজের বয়স ৪৩) সঙ্গে তথা ত্রিপুর রাজপরিবারের সঙ্গে কবিগুরুর হৃদ্যতা গড়ে উঠতে শুরু হয় — যা কবির আজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল। মহারাজ বীরচন্দ্র স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন তা কবিগুরুর উক্তি থেকে প্রমাণিত। মহারাজ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ

'তিনি আমার অপরিণত আরম্ভের মধ্যে ভবিষ্যতের ছবি তাঁর বিচক্ষণ দৃষ্টি দ্বারা দেখতে পেয়েই তখনই আমাকে কবি সম্বোধনে সম্মানিত করেছিলেন। যিনি উপরের শিখরে থাকেন, তিনি যেমন যা সহজে চোখে পড়েনা তাকেও দেখতে পান, বীরচন্দ্রও তেমনি সেদিন আমার মধ্যে অস্পষ্টকে স্পষ্ট দেখেছিলেন।"

মহারাজের প্রতি কবিগুরুর এহেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে মামুলি ভাষায় প্রকাশ না করে এটাকে ধ্রুপদী কৃতজ্ঞা জ্ঞাপন না বললে ঠিকঠিক বলা হয় না — একথা রবীন্দ্র পরিমণ্ডলের মানুষজন অকপটে স্বীকার করে নেবেন। মহারাজের অন্তর্দৃষ্টির এহেন বিরল মূল্যায়ন রবীন্দ্র পরিমণ্ডলের মানুষজনের কাছে সর্বকালের আনন্দের রসবস্তু।

সুধী পাঠকবৃন্দ লক্ষ্য করে থাকবেন বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের কাছ থেকে বালক কবি রবীন্দ্রনাথ (তখন কবির বয়স ২০/২২ বছর) কবি স্বীকৃতি লাভ করার পর থেকে

৩। ১৩৩২ বঙ্গাব্দে (১৯২৫ খৃঃ) আগরতলার 'কিশোর সাহিত্য সমাজ' কর্তৃক সম্বর্ধিত অনুষ্ঠানে কবির ভাষণের কিয়দংশ। উৎসঃ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা — ২০২ পৃঃ।

কিশোর রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুর রাজবংশের প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েন।

একথা সর্বজন বিদিত যে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইতিহাস-মনস্কতাকে আজীবন অনির্বাণ দীপ শিখার মত প্রজ্জ্বলিত রেখেছিলেন।

তাই ত্রিপুরা রাজ্যের রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার জন্ম লগ্ন থেকেই ত্রিপুরার প্রাচীন রাজা গোবিন্দমাণিক্যের[৪] রাজত্বকালের কাহিনী অবলম্বনে 'রাজর্ষি' নামক একটি উপন্যাস রচনা করতে শুরু করেন।

'রাজর্ষি' উপন্যাস লিখতে গিয়ে ইতিহাস-সচেতন রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস-নির্ভর উপন্যাসের প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক উপাদানসমূহের জন্য বীরচন্দ্র মাণিক্যের শরণাপন্ন হন — গোবিন্দ মাণিক্যের ইতিহাস বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদির সংযোজনের কামনা করে কবিগুরু বীরচন্দ্রের কাছে যে পত্রলিপিটি প্রেরণ করেছিলেন — ঐ পত্রলিপিটি ঐতিহাসিক দলিল বিশেষ — ত্রিপুরার রাজা এবং রাজবংশীয়দের সঙ্গে কবিগুরুর পত্রালাপ-ধারাবাহিকতার মূল উৎস হিসাবে এই পত্রলিপিটির মূল্য অপরিসীম। এবং রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যের ক্ষেত্রে ত্রিপুরার রাজাদের কাছে লিখিত পত্রাবলীর গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যময়। বলা যেতে পারে যে ত্রিপুরায় লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী রবীন্দ্র পত্রসাহিত্য জগতের মূল্যবান সংযোজন। সাধারণ পাঠক থেকে শুরু করে পত্র সাহিত্য রসিক বৃন্দের কাছে পত্রাবলী নিঃসন্দেহে চিরন্তন রসদ হিসাবে পরিগণিত হবে।

৪। **গোবিন্দমাণিক্য খ্রীষ্টীয় ১৬৬৬-৭৩ সনে রাজত্ব করেন। তাঁর ইতিবৃত্তকে উপজীব্য করে কবিগুরু 'বিসর্জন' নাটক প্রণয়ন করেন। রাজমালায় বর্ণিত আছে, শাহজানপুত্র শুজার সঙ্গে আরাকান রাজ্যে গোবিন্দমাণিক্যের পরিচয় ঘটে এবং সখ্য গড়ে উঠে।**

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের পত্রবিনিময়

বিশ্বকবি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত স্বাধীন ত্রিপুরার গুণজ্ঞ রাজপুরুষদের সুদীর্ঘকালীন সুগভীর আত্মিক সম্পর্কের আদানপ্রদান রবি অনুরাগীদের রসদরবারে সবিশেষ তাৎপর্যময় এবং উপাদেয়। সে সম্পর্কের সূত্রপাত উনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকের শেষ পর্বে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য[১] বাহাদুরের রাজত্বের একেবারে অন্তিমদিকে। বীরচন্দ্র মানিক্য থেকে বীরচন্দ্রের প্রপৌত্র শেষ স্বাধীন রাজা বীর বিক্রম মাণিক্য পর্যন্ত কবিগুরুর যোগযোগ ছিল।

এযুগের বিক্রমাদিত্য মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য ১৮৬২ ইংরেজী সন থেকে ১৮৯৬ ইংরেজী সন পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৩৪ বছর কাল রাজত্ব করে গেছেন। মৌর্যবংশের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নবরত্নের সমারোহে রাজসভা পরিচালনা করতেন। তাই তিনি বিক্রমাদিত্য উপাধিতে অলংকৃত হয়েছিলেন। ত্রিপুরার রাজা বিবিধগুণের আধার বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরকেও এযুগের বিক্রমাদিত্য বলা হত। বীরচন্দ্র মাণিক্য নিজেও সঙ্গীত ও বৈষ্ণব কাব্য বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন- আলোকচিত্রেও তিনি দক্ষহস্ত ছিলেন। তাঁর রাজসভা বৈষ্ণবসাহিত্য রসবেত্তা এবং সঙ্গীত কলাবিদ্যার বিদগ্ধ গুণীজনের সমাবেশে সমৃদ্ধ এবং অলংকৃত ছিলো। এখানে উল্লেখ্য যে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য যখন সিংহাসনে আরোহন করেন (১৮৬২) তখন রবীন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম এক বছর। দুজনের বয়সের ব্যবধান- আসমান-জমিন। তবু রবীন্দ্রনাথের যৌবন প্রারম্ভেই মহারাজের সঙ্গে তার সখ্যতা জমে যায়। বন্ধুত্ব গাঢ় হয়ে ওঠে। বীরচন্দ্রের বিশাল হৃদয় ও ঔদার্যের জন্য তা সম্ভব হয়েছিল।

সুধী পাঠকবর্গের উপভোগের জন্য কবির জবানী বিধৃত হল ঃ

"তিনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। কিন্তু আমার সঙ্গে সাহিত্য- আলোচনা করতেন প্রিয় বয়স্যের মতো। তাঁর সঙ্গীতের জ্ঞান অসাধারণ ছিল কিন্তু আমার সেই কাঁচাবয়সের রচিত ছেলেমানুষি গান তিনি আদর করে শুনতেন, বোধ হয় তার মধ্যে ভাবী পরিণতির সম্ভাবনা প্রত্যাশা করে।

এ যেন কোন্ অদৃশ্য রশ্মির লিপি অংকিত হয়েছিল তাঁর কল্পনার পটে।[২]"

ত্রিপুর নরপতিগণের সঙ্গে কবিগুরুর যোগসূত্রকে ত্রিপুরা ও বঙ্গদেশীয় সাহিত্য ও

১। ত্রিপুর রাজবংশের ইতিহাস, পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক এই দুভাগে বিভক্ত। ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ঐতিহাসিক যুগের সূচনা- মহামাণিক্য ঐতিহাসিক যুগের প্রথম রাজা — তিনিই প্রথম মাণিক্য উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহন করেন। তাঁর রাজত্বকাল ১৪০০-১৪৩০ খ্রী।

২। শান্তিনিকেতন আমকুঞ্জে মহারাজ বীরবিক্রমকে কবির সম্বর্দ্ধনা থেকে উদ্ধৃত (২২শে পৌষ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ)

সংস্কৃতির কালজয়ী ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার বলা যেতে পারে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম যখন অনুর্ধ্ব ত্রিশ যে সময় প্রাচীন ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস অবলম্বন করে 'রাজর্ষি' নামক একটি উপন্যাস প্রণয়ন করতে মনোনিবেশ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর ষাট এবং সত্তরের দশকের ত্রিপুর নরেশ ইতিহাস প্রসিদ্ধ গোবিন্দ মাণিক্যের রাজত্ব কালের নানান ঘটনা অবলম্বনে তিনি রাজর্ষি উপন্যাস রচনায় প্রয়াসী হন। কিন্তু ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে অবগত না হওয়ায় কাহিনীর বিন্যাসে ইতিহাস রক্ষা করতে অসমর্থ হয়ে ত্রিপুরেশ বীরচন্দ্র মাণিক্যের শরণাপন্ন হন।

কবিগুরু মহারাজকে লিখছেন ঃ

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন —

আপনাদের রাজপরিবারের সহিত আমাদের পরিবারের পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় আছে এইরূপ শুনিতে পাই-সেই জন্য সাহসী হইয়া মহারাজকে পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের পূর্ব্বেকার সম্বন্ধ মহারাজের স্মরণে আসে এই আমার অভিপ্রায়।

মহারাজ বোধ করি শুনিয়া থাকিবেন যে, আমি ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া রাজর্ষি নামক একটি উপন্যাস লিখিতেছি। কিন্তু তাহাতে ইতিহাস রক্ষা করিতে পারি নাই। তাহার কারণ ইতিহাস পাই নাই। এজন্য আপনাদের কাছে মার্জনা প্রার্থনা বিহিত বিবেচনা করিতেছি। এখন যদিও অনেক বিলম্ব হইয়াছে তথাপি মহারাজ যদি গোবিন্দ মাণিক্য ও তাঁহার ভ্রাতার রাজত্ব সময়ের সবিশেষ ইতিহাস আমাকে প্রেরণ করিতে অনুমতি করেন, তবে আমি যথাসাধ্য পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করিব। মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য তাঁহার নির্বাসন দশায় চট্টগ্রামের কোন্ স্থানে কিরূপ অবস্থায় ছিলেন যদি জানতে পাই, তবে আমার যথেষ্ট সাহায্য হয়। প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরের এবং ঐতিহাসিক ত্রিপুরার অন্যান্য সনের ফটোগ্রাফ যদি পাওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলেও আমার উপকার হয়।

এই পত্রের পাইলে এবং মহারাজের সহিত আলাপ হইলে আমি সৌভাগ্য জ্ঞান করিব।

২৩শে বৈশাখ ১২৯৩ সন বুধবার।

প্রণত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মনঃ

৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন

জোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

কবিগুরুর পত্রবয়ানে অবগত হওয়া যায় যে ত্রিপুর রাজপরিবার বর্গের সঙ্গে তাঁর পূর্ব বংশধরদের যোগাযোগ ছিল। শোনা যায় কবিগুরুর পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথের

সঙ্গে ত্রিপুরার রাজাদের যোগাযোগ ছিল। সুতরাং অনুমান করা যায় সেই যোগসূত্রের আভাষেই কবিগুরু বীরচন্দ্র মাণিক্যকে পত্র প্রেরণ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কবিগুরুর পত্র পেয়েই বীরচন্দ্র মাণিক্য অতীব সুললিত ভাষায় জবাবীপত্র লিখেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য বীরচন্দ্র মাণিক্যের পত্রলিপিটির ভাব ও ভাষার উৎকর্ষ কবিগুরুকে মুগ্ধ করেছিল— পাঠকের উপভোগের জন্য বীরচন্দ্রের সেই অনিন্দ্য সুন্দর ঐতিহাসিক পত্রলিপিটি প্রদত্ত হল ঃ

বীরচন্দ্র মাণিক্য লিখছেন ঃ

সদ্‌গুণান্বিতেষু—

আপনার পত্র পাইয়া যারপরনাই সুখী হইলাম। লিখিয়াছেন, আমাদের পরিবারের সহিত আপনাদের পরিবারের যে সম্বন্ধ ছিল তাহা স্মরণ করিয়া দেওয়াই আপনার উদ্দেশ্য। সে সুখের সম্বন্ধ আমি ভুলি নাই আপনি পুনরায় তাহার গৌরব করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তজ্জন্য বিশেষ আপ্যায়িত ও বাধিত হইলাম। ভরসা করি মধ্যে মধ্যে আপনার অবসরমতে এইরূপ অমায়িক ভাবপূর্ণ পত্র পাইব।

'মুকুট' ও 'রাজর্ষি' নামক দুইটি প্রবন্ধই আমি পাঠ করিয়াছি। ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে যে যে স্খলন হইয়াছে, তাহা সংশোধন করা আপনার বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে না।

'রাজরত্নাকর' নামে ত্রিপুর রাজবংশের একখানা ধারাবাহিক সংস্কৃত ইতিহাস আছে। এই গ্রন্থ ধর্মমাণিক্যের রাজত্ব সময়ে সংকলিত হইতে আরম্ভ হয়। ধর্মমাণিক্য *** ত্রিপুরা ৮৬৮ সনে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এখন ত্রৈপুর ১২৯৬ সন। উক্ত রাজরত্নাকর আর একখানা প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত রাজমালার উল্লেখ আছে; সেই প্রাচীন রাজমালা এখন কোথাও পাওয়া যায় না। রাজমালা বলিয়া যাহা প্রচলিত তাহা রাজরত্নাকর হইতে সংক্ষিপ্ত ও সংগৃহীত এবং বাংলা পদ্যে লিখিত। সাধারণ পাঠ করিয়া যেন অনায়াসে বুঝিতে পারে এই অভিপ্রায়েই দ্বিতীয় রাজমালা রচিত হইয়াছে। ইহাতে মহারাজ দৈত্যের জীবনবৃত্ত হইতে বর্ণিত আছে। তৎপূর্ব্ববর্তী অনেক রাজার ইতিহাস নাই। দ্বিতীয় বাংলা রাজমালার লেখককে আমি বালক বয়সে দেখিয়াছি। এতদ্ভিন্ন, ঐরূপ বাংলা কবিতায় কেবল কৃষ্ণমাণিক্য মহারাজার চরিত্র অবলম্বন করিয়া একখানা ইতহাস আছে, উহার নাম 'কৃষ্ণমালা'। পার্ব্বতীয় প্রজাগণের মধ্যে এরূপ প্রথা আছে যে তাহারা নিজ নিজ ভাষায় রচনা করিয়া মহারাজগণের জীবন চরিতের কোন বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে গান করিয়া থাকে। সেই গানগুলি হইতে অনেক বিবরণ সংগৃহীত হইতে পারে। মন্দিরের ফলক ও সনদপত্রাদি হইতেও যে ইতিহাসের অনেক ঘটনা সংগৃহীত হইবার সুবিধা আছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

আপনি যে ত্রিপুর ইতিহাস অবলম্বন করিয়া নবন্যাস লিখিতে যত্ন করিতেছেন,

ইহাতে আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

যে যে স্থানে ইতিহাসের সহায়তা প্রয়োজন হয় - আমি আদরের সহিত পূর্ব্বোক্ত নানা মূল হইতে তাহা সংকলন করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। আপনার অপরাপর বিষয়ে প্রশংসিত প্রবন্ধগুলিতে ইতিহাসের যথাযথ ব্যাখ্যা থাকে, ইহা আমারও একান্ত বাসনা। ঐতিহাসিক কোন বিশেষ ভাগের সম্বন্ধে সংকীর্ণ সময় মধ্যে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে কেবল রাজরত্নাকর হইতে যে সহায়তা পাওয়া যায় তাহাই দিতে পারিব। একটুকু সময় থাকিতে জিজ্ঞাসা হইলে স্থানীয় অবস্থা সংগ্রহ করিয়াও জানাইতে চেষ্টা করিব। বোধ হয় শেষোক্ত প্রণালী আপনার সন্তোষজনক হইবে।

আমার পূর্বপুরুষগণের উদয়পুর ব্যতীত, ধর্মনগর, কল্যাণপুর, অমরপুর প্রভৃতি স্থানেও রাজধানী ছিল। সেই সেই স্থলেও অনেক কীর্ত্তিকলাপের চিহ্ন পাওয়া যায়। আপনার প্রয়োজন হইলে সে সকল স্থানের ইতিহাস জানাইতে পারিব।

উদয়পুরের যে কয়েকখানা ফটোগ্রাফ আছে তাহার বিবরণ শিখিয়া ইহার পর তাহা আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব।

রাজরত্নাকর গোবিন্দ মাণিক্যের ও তাঁহার ভ্রাতা ছত্র মাণিক্যের চরিতযেরূপ বর্ণিত আছে তাহা নকল করান হইয়াছে সত্বর ছাপান যাইতে পারে কিনা উদ্যোগ করিতেছি ; মুদ্রাঙ্কন শেষ হইলে আপনার নিকট পাঠান যাইবে। 'রাজর্ষি'র কোন্ কোন্ স্থলে ইতিহাস রক্ষিত হয় নাই, তাহা রাজরত্নাকরে উক্ত উদ্ধৃত ভাগ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

"বাজরত্নাকর" ছাপাইবার উদ্যোগে আছি, সমুদয় আয়োজন হইয়া উঠে নাই। যদি ঈশ্বর ইচ্ছায় ছাপা হইতে পারে তবে আপনাকে একখণ্ড পাঠাইয়া দিব।

"রাজরত্নাকরে" পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক দুইটি ভাগ আছে। পৌরাণিক ভাগে মহারাজা দৈত প্রভৃতির জীবন চরিত এবং ঐতিহাসিক ভাগে যখন বাঙ্গাল যবনাধিকারে ছিল — সেই সময়ের অনেকানেক ভাগ নিতান্ত সুন্দর । সেই অবলম্বন করিয়া আপনি নবন্যাস লিখিলে অপেক্ষাকৃত অনেক প্রশংসনীয় হইবে এরূপ আমার বিশ্বাস।

এথাকার কুশল, আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীন নিরাময় সংবাদদানে সুখী করিবেন ।

১২৯৬ ত্রিপুরা — তাং ১৮ই জ্যৈষ্ঠ

ইতি —

প্রণত

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা

সহৃদয় - রসিক পাঠকমণ্ডলী লক্ষ্য করে থাকবেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যকে লিখিত পত্রের শেষে প্রণত রবীন্দ্রনাথ দেবশর্মণঃ লিখে একটি ব্যতিক্রমী পদবী ব্যবহার করেছেন। এহেন পদবী ব্যবহার কবিগুরু কোথাও ব্যবহার করেছেন কিনা

বর্তমান লেখকের সম্পূর্ণ অজানা। জীবনে তিনি অজস্র চিঠি লিখেছেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের নরনারীর কাছে — রাজা মহারাজা এবং জগতের বহু মনীষীর কাছে। কিন্তু দেবশর্মণঃ পদবী কোথাও ব্যবহার করতে দেখা যায়নি। ত্রিপুরার পরবর্তী রাজা ও রাজপুরুষদের কাছে লিখিত কোন পত্রের শেষে তিনি ঐ ব্যতিক্রমী পদবী ব্যবহার করেননি। এমনকি বীরচন্দ্রপুত্র এবং কবির একান্ত সুহৃদ-সখা রাধাকিশোর মাণিক্যকে লেখা কোন চিঠিতে তিনি ঐ পদবী ব্যবহার করেননি। রাধাকিশোরকে লিখিত পত্রে — 'একান্ত অনুরক্ত' অথবা 'চিরানুরক্ত' শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন।

কবির এহেন পদবী ব্যবহার বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোকপাতের অবকাশ আছে। কবি ও রাজার বয়সের ব্যবধান বলতে গেলে পিতা-পুত্রের। বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর যখন সিংহাসনে আসীন হন তখন কবির বয়ঃক্রম একবছর। এই বয়সের ব্যবধান হেতু ব্রাহ্মণকুলজাত কবি বয়োজ্যেষ্ঠ ক্ষত্রিয়কুলজাত রাজাকে সম্মান জানানোর জন্যই পত্রের শেষে 'প্রণত' লিখে যথাবিহিত বিনম্রতা প্রদর্শন করেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেবশর্মণঃ পদবী ব্যবহারের মধ্যে যথোচিত রসবোধের পরিচয় মেলে। তিনি এমন একজন ব্যক্তিত্বের কাছে চিঠি দিচ্ছেন যিনি একাধারে রাজা ও বয়োজ্যেষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয়কুলজাত। তাই সম্বোধনে ভাবপ্রকাশে নিজ পদবী প্রয়োগে এবং পত্রাংশে 'প্রণত' ব্যবহারে রাজার প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করার এক ব্যতিক্রমী পত্রলিখনশৈলী বা 'আর্ট' পত্র সাহিত্যে যে প্রবর্তন করেছেন পত্রসাহিত্য জগতে তার তুলনা নেই। কবি দেবশর্মণঃ পদবী ব্যবহার ক্ষত্রিয়কুলজাত দেববর্মণঃ পদবীধারী রাজার প্রতি রাজকীয় সম্মান জানানোর প্রতীক। পত্র-প্রাপক হচ্ছেন দেববর্মণ পদবীধারী রাজা অন্যদিকে যিনি পত্র প্রেরক তিনি হচ্ছেন ব্রাহ্মণ কুলজাত কবি ঠাকুর পদবীধারী কিন্তু তিনি রাজার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করার উদ্দেশে ঠাকুর পদবী ব্যবহার না করে ক্ষত্রিয়কুলের দেববর্মণ পদবীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষাকল্পে কুলীন ব্রাহ্মণ বংশের পদবী যা বিশেষ অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ কুলজাত ব্যবহার করে থাকেন সেই দেবশর্মণঃ পদবী ব্যবহার করে কবিগুরু এক অতুলনীয় রাজকীয় রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন — এবং রসিক পাঠকবর্গকে রসসম্ভোগজনিত আনন্দ উপভোগ করতে সাহায্য করেছেন। শাস্ত্র অনুযায়ী ব্রাহ্মণরা প্রজাপতি ব্রহ্মার অংশ বলে পরিকল্পিত তেমনি রাজারাও নরের দেবতা (নরেশ) বলে পরিগণিত তাই রাজাদের বলা হয় নরপতি বা নরেশ।

কবিগুরুর সঙ্গে ত্রিপুরার চারজন রাজার সাক্ষাৎ পরিচয় এবং সুগভীর সম্পর্কের স্মৃতিকথা বর্তমান যৎকিঞ্চিৎ প্রবন্ধে রূপ দেয়া সম্ভব নয়। বলতে গেলে ত্রিপুর নরপতিবর্গের সঙ্গে গুরুদেবের সম্পর্কের মহাসিন্ধুর অজস্র তরঙ্গের কতিপয় বিন্দুরই প্রতিবিম্ব বর্তমান প্রবন্ধ। রসজ্ঞ পাঠকবর্গের প্রতি প্রবন্ধকারের বিনম্র নিবেদন নিবেশিত হল।